Prescribed as a Text-Book by the Board of Intermediate and Secondary Education, Dacca, for the High School and High Madrasa Examinations, 1948 & 1949.

ত্রিধারা

শ্রীপার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এ
অধ্যাপক জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা

তৃতীয় সংস্করণ

১৯৪৭

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত] [মূল্য দুই টাকা বার আনা

প্রকাশক—
শ্রীগিরিজাকান্ত ভট্টাচার্য্য বি-এ
৩৯নং, হৃষীকেশ দাস রোড, ঢাকা

Stockists—
Adeylebros. & Co.
49B, Mirzapur Street, Calcutta.

প্রিণ্টার—শ্রীগোপালচন্দ্র দে
সিটি প্রিণ্টার্স
৩৫, ছাতাওয়ালা গলি, কলিকাতা।

উৎস-মুখ

কোন বিশেষ কবির কাব্য-পরিচয় তাঁহার একান্ত আপনার কবিকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে না। সত্য বটে, গীতি-কবি আপন মনের মাধুরী-স্পর্শেই জগৎ ও জীবন নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই মনের মধ্যে নীড় বাঁধিয়া আছে হয় ত' কতকালের কত পূর্ব্বতন কবি ও ভাবুকের দর্শন-সংস্কার। তাই অনেক সময় সজ্ঞান চিন্তায় যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে হয়, হয় তো তাহারই পশ্চাতে মনের নির্জ্ঞান অংশ কোন পরস্ব বসিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং কোন কবি-কর্ম্মকে বিচ্ছিন্ন করিয়া না দেখিয়া, তাহাকে পারম্পর্য্যের বৃহৎ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, একটা অখণ্ড প্রবাহের সমগ্রতায় দেখিলে, কবিতার রস-রূপের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা যায়। এই উদ্দেশ্যের অনুপ্রেরণায় ত্রিধারার কবিতা-সজ্জা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

নবীন বিদ্যার্থীদিগের জন্য কবিতা-সংগ্রহ পুস্তক ইতিপূর্ব্বে বহু প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনটি গ্রন্থন-প্রণালী আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। (১) যদৃচ্ছাক্রমে কবিতাগুলি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় সংযোজিত করা হয়। ইহাতে ভাবানুসারে বা কালানুসারে কবিতাগুলিকে সাজাইবার কোন আয়োজনই করা হয় না। (২) বিষয় ও ভাবপ্রকাশের প্রতি অবহিত থাকিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়-পর্য্যায়ে কবিতাগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ স্তবকে (Group) সংগ্রথিত করা হয়। ইহাতে একই বিষয়-বস্তু ভিন্ন ভিন্ন কবির মনে কেমন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাব উদ্রিক্ত করে তাহা উপলব্ধি করা সহজসাধ্য হয় এবং তাহাতে এক প্রকার সাহিত্যিক কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয়। (৩) কবি ও কবিতাগুলিকে, এক প্রকার পৌর্ব্বাপর্য্যের ধারা অনুসরণ করিয়া সাজাইবার রীতি আছে। তাহাতে সাহিত্যের, তথা চিন্তারাজ্যের

ক্রম-বিকাশ অনুধাবন করা চলিতে পারে। এই পুস্তকে যতদূর সম্ভব, এই তৃতীয় ক্রমটী অনুসরণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছি। এই প্রণালীতে গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত লক্ষ্য করা যাইবে বঙ্গসাহিত্য-সমাজের একটা বিরাট্ কবি-বংশ-পীঠিকা। এই বংশ-পীঠিকা একেবারে প্রমাদ-শূন্য তাহা বলা চলে না; কারণ কবিদিগের কুলজি-গ্রন্থের নিতান্ত অভাব। আবার কখনও কখনও ভাবানুরোধে বংশপীঠিকার ধারাবাহিকতার অমর্য্যাদা করিতে বাধ্য হইয়াছি। যে কারণে তাহা ঘটিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত এই আলোচনার প্রারম্ভেই করিয়াছি। এ বিষয়ে একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি। কালানুসারে প্রমথনাথ চৌধুরী কবি মোহিতলাল মজুমদারের পরবর্ত্তী স্থান অধিকার করিতে পারেন না; অথচ এই গ্রন্থে তাহাই হইয়াছে। এখানে সেই বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রমথবাবুর "বেলা যায়" কবিতা কবিশেখরের "লালাবাবুর দীক্ষা" কবিতাটীর পূর্ব্বে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আবার সেই বিশেষ কারণেই গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কৃত্তিবাসের পূর্ব্বেই স্থান লাভ করিয়াছেন। এই প্রকার ইচ্ছাকৃত কালাতিক্রমদোষ এবং আরও বহুপ্রকার অনিচ্ছাকৃত ক্রটী-বিচ্যুতির জন্য কুলশাস্ত্র-নিষ্ণাত পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

এই ত্রিধারায় বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বনফুল পর্য্যন্ত যে পরিক্রমণ করা হইয়াছে তাহা সুদীর্ঘ পরিক্রমণ; কাল-পরিমাণে তাহা পাঁচশত বৎসরেরও বেশি। এই সুদীর্ঘ যাত্রা-পথে ত্রিধারার তিনটী ধারায় শুধু কয়েকটী মাত্র তরঙ্গ-ভঙ্গের সৌন্দর্য্য চোখে পড়িয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের সুর-সুরধুনীর অবিশ্রান্ত লহরীলীলার তাহা সামান্য অংশমাত্র। কালস্রোতের উজান বাহিয়া পাঁচশত বৎসরের দীর্ঘপথে যাহা কিছু দর্শন করিয়াছি তাহা বিহঙ্গাবলোকনে দর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই কথা স্মরণ রাখিলেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মর্ম্ম বুঝা যাইবে।

গীতি-কবির রস-নির্ম্মাণে আলম্বনবিভাব বহু থাকিলেও তাহাকে তিনটী শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করা চলে;—তাহা হইতেছে, ঈশ্বর, মানব ও প্রকৃতি। এখন এই মূলশ্রেণী হইতে অবান্তর বিভাগ চলিতে পারে। সাম্যমৈত্রী, স্নেহ-প্রীতি, ভগবদ্ভক্তি, পল্লীমমতা, সৃষ্টি-মাধুর্য্য, রাজা ও রাজত্ব প্রভৃতি বিষয়-বিভাগ ঐ মূল বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত। কালানুক্রম ভাবনায় সচেতন থাকিলেও এই প্রকার বহুমুখীন বিচিত্র রচনা-সংগ্রহে ঔদাসীন্য দেখাই নাই। রচনার সেই রূপ-বৈচিত্র্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। ত্রিধারার পরিশেষে অবতরণিকায় তাহার যথাসম্ভব সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। ঠিক একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে ভিন্ন ভিন্ন কবির যে সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপের ভাবোদ্রেক হইয়া থাকে তাহার পরিচয় দেওয়ার জন্য একই বিষয়ের বহু কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। সমুদ্র, চন্দ্রালোক, বর্ষা, বসন্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে একাধিক কবির কবিতা-চয়নের ইহাই মূল উদ্দেশ্য। অবেক্ষণ শুধু যুগ-বিভাগে বিভিন্ন হয় তাহা নহে, ব্যক্তিভেদেও তাহা বিভিন্ন আকার পরিগ্রহ করিয়া থাকে। সাহিত্য বস্তু-নিরপেক্ষ সৃষ্টি নয়; কিন্তু বীক্ষাশক্তির সংস্পর্শে বস্তু তাহার স্থূল বাস্তব মূর্ত্তি পরিহার করিয়া দ্রষ্টার ভাব-কল্পনার আকারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। সেখানে বস্তু উপলক্ষ্য মাত্র। এই সত্যটুকু মনে রাখিলেই একই বিষয়ের বহু বিচিত্র কবিতার অর্থ উপলব্ধি করা যাইবে।

ত্রিধারার তিনটী প্রবাহ রহিয়াছে। এই তিনটী প্রবাহ বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের তিনটী যুগবিভাগের পরিচয় নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রথম প্রবাহ বিদ্যাপতি হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত বহিয়া গিয়াছে। যে কারণে মৈথিল কবি বিদ্যাপতিকে বাঙলা কাব্যসাহিত্যের আদি ধারার পুরোভাগে স্থান দিয়াছি তাহা অবতরণিকায় আলোচিত হইয়াছে। এই প্রথম প্রবাহের আরম্ভ হইয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্যের কোমলকান্ত পদাবলীদ্বারা এবং শেষ হইয়াছে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতার মধ্যে। মধ্যে যে শ্রেণীর

রচনা আছে তাহা অনুবাদ ও লৌকিক ধর্ম্ম-কাহিনীতে প্রতিষ্ঠিত কবিতাবলী এবং কবি রামপ্রসাদের ভক্তি-সঙ্গীত। রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র দ্বারাই এই যুগাবসান ঘটিয়াছে। ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের স্মরণীয় ঘটনায় বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর সাহিত্যিক জীবনে সব কিছুই ওলট পালট হইয়া গেল। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর (১৭৬০ খৃষ্টাব্দে) এই যে একটী বিশেষ যুগের সূত্রপাত হইল তাহাকে 'যুগসন্ধিকাল' বলা যাইতে পারে। পুরাতনের ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অথচ নূতনের প্রতিষ্ঠা হয় নাই—এমন একটী অব্যবস্থিত যুগে স্থায়ী সাহিত্য রচনার সুযোগ ও অবকাশ থাকিতে পারে না। সেইজন্য এই যুগে উৎসবপ্রিয় জনসাধারণের প্ররোচনায় কবিগান, যাত্রাগান প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। সুতরাং ইহা একটী গীতিযুগ। বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে পুরাতন ও নবীন যুগের মধ্যবর্ত্তী এই সন্ধিক্ষণটুকু সামান্য হইলেও নগণ্য নয়। কাব্যরসপিপাসু নবীন বিদ্যার্থি-গণের নিকট হইতে এই যুগ-বঞ্চনার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই নাই সেইজন্য দ্বিতীয় প্রবাহ-রূপে ইহার অভিব্যক্তি-প্রয়োজন অনুভব করিয়াছি। কবিওয়ালাদের অধিকাংশ সঙ্গীত যে-রসাশ্রিত তাহা স্মরণ করিয়া গ্রহণ-বর্জ্জন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। পুরাতন যুগে যাহা শুনা যায় নাই তেমন কোন নূতন কথা এই যুগে শোনা গিয়াছে। সুতরাং ইহা উপেক্ষণীয় নহে। ঈশ্বরচন্দ্র এই কালের সর্ব্বশেষ কবি, কাজেই তাঁহার সঙ্গেই এই প্রবাহ সমাপ্ত হইয়াছে।

তৃতীয় প্রবাহে আধুনিক কবিদিগের কবিতাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। এই প্রবাহই দীর্ঘতম। তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। এই নবীন গীতি-কবিতার যুগে বিষয়-বস্তু সীমাহীন বৈচিত্র্যপূর্ণ, ভাষা পুরাতন যুগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ছন্দোরূপ সুচারু ও মুক্তবন্ধন। আধুনিক কবিতা-চয়নে একটী বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়াছি; কোন কবির সেই কবিতাবিশেষই

নির্ব্বাচিত হইয়াছে যাহা তাঁহার বৈশিষ্ট্যাবগাহী (Characteristic)। আধুনিক কবি সংখ্যায় বহু। তাঁহাদের প্রত্যেকের রচনা হইতে চয়ন করা সম্ভব হয় নাই; তাহার কারণ গ্রন্থের স্বল্পায়তন, তাঁহাদের প্রতি সঙ্কলয়িতার অনাদর বা অশ্রদ্ধা নহে।

যাঁহাদের কবিতাবলী এই গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছি তাঁহাদের সকলকে এবং তাঁহাদের প্রকাশকদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সময় সঙ্কীর্ণ বলিয়া যাঁহাদের নিকট চিঠিপত্রে তাঁহাদের কবিতা নির্ব্বাচনের জন্য অনুমতি গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নাই, তাঁহাদের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। এই গ্রন্থের পূর্ব্বে প্রকাশিত বহু সঙ্কলন-পুস্তক হইতে যে সাহায্য পাইয়াছি তাহার জন্য আমার পূর্ব্ব-সূরিদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

গ্রন্থ-শেষে ত্রিধারায় অবতরণের জন্য একটী অবতরণিকা নির্ম্মাণ করিয়াছি। যাহাদের জন্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন, তাহাদের সঙ্গে সেই সোপানে একাসনে বসিয়া লহরীলীলার বিচিত্র শোভা তাহাদিগকে দেখাইব—ইহাই উদ্দেশ্য। যদি তাহাদের মুখে আনন্দ-হাসির একটু রেখাও ফুটিয়া উঠে তবে কৃতার্থ হইব। আমিও সানন্দে বলিব—

"শোভতেঽস্য মুখং য এবং বেদ"

ঢাকা—
১২ই শ্রাবণ, ১৩৫১ } শ্রীপার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

ঢাকা বোর্ডের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যরূপে 'ত্রিধারা' নির্ব্বাচিত হইয়াছে; এইজন্য নির্ব্বাচন-সমিতির সদস্যবৃন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই সংস্করণে মুদ্রাকর-প্রমাদ যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া গ্রন্থখানাকে নির্দ্দোষ ও শোভন করিতে যত্নপর হইয়াছি। এক্ষণে, ইহা পরম-শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমণ্ডলীকর্তৃক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

১লা ফাল্গুন, ১৩৫২
মালীটোলা, ঢাকা } শ্রীপার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য

নির্দেশিকা

প্রথম প্রবাহ

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। আত্মনিবেদন—বিদ্যাপতি	...	১
২। ঋতুরাজ—বিদ্যাপতি	...	৩
৩। ভুবন-মোহন শ্যাম—চণ্ডীদাস	...	৪
৪। বিরহিণী রাধা—চণ্ডীদাস	...	৫
৫। আক্ষেপানুরাগ—জ্ঞানদাস	...	৬
৬। মাতৃ-স্নেহ—বলরাম দাস	...	৭
৭। ঝরঝর জলধর-ধার—গোবিন্দ দাস	...	৮
৮। আত্মবিলোপ—সৈয়দ মর্ত্তুজা	...	৮
৯। ভ্রাতৃভক্তি—কৃত্তিবাস	...	৯
১০। ভরত-মিলন—কৃত্তিবাস	...	১০
১১। শ্রীরামের বিলাপ—কৃত্তিবাস	...	১৩
১২। মৃত্যু বাণ—কৃত্তিবাস	...	১৫
১৩। কালকেতুর শৈশব—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী		১৭
১৪। ফুল্লরার দুঃখ—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী	...	১৮
১৫। কমলে কামিনী—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী	...	২১
১৬। প্রণাম—সৈয়দ আলাওল	...	২২
১৭। একলব্যের গুরুদক্ষিণা—কাশীরাম দাস	...	২৪
১৮। পরার্থ—কাশীরাম দাস	...	২৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
১৯। ভীষ্ম—কাশীরাম দাস	...	৩১
২০। দুঃখের বড়াই—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	...	৩২
২১। উমার বাল্যলীলা—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	....	৩২
২২। মানসপূজা—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	...	৩৩
২৩। শিবের ভিক্ষাযাত্রা—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়		৩৫
*২৪। বিশেষণে সবিশেষ—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়		৩৭
২৫। কৈলাস ভূধর—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়	...	৩৮
২৬। শিবের রুদ্ররূপ—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়	...	৪০

দ্বিতীয় প্রবাহ

*২৭। স্বদেশী ভাষা—রামনিধি গুপ্ত	....	৪১
২৮। মনের অনল—রামনিধি গুপ্ত	...	৪১
২৯। প্রতীক্ষা—হরু ঠাকুর	...	৪২
৩০। ভিখারীর পরিবর্ত্তন—রাম বসু	...	৪২
৩১। শুক-সারী-সংবাদ—গোবিন্দ অধিকারী	...	৪৩
৩২। হৃদয়-বৃন্দাবন—দাশরথি রায়	...	৪৫
৩৩। ভূষণে ভূষণ—দাশরথি রায়	...	৪৬
৩৪। দাশরথির প্রার্থনা—দাশরথি রায়	...	৪৭
৩৫। শ্যামসুন্দর—কৃষ্ণকমল গোস্বামী	...	৪৭
৩৬। আকর্ষণ—অজ্ঞাত বাউলের গান	...	৪৮
৩৭। সাধন-বিঘ্ন—সেখ মদন বাউল	...	৪৯
৩৮। মাতৃভূমি—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	...	৪৯
৩৯। সুপ্তোত্থিত—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	...	৫১
*৪০। পৌষপার্ব্বণ—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	...	৫২

তৃতীয় প্রবাহ

বিষয়		পৃষ্ঠা
৪১।	সমুদ্রের প্রতি রাবণ—মাইকেল মধুসূদন দত্ত …	৫৭
৪২।	বঙ্গভূমির প্রতি—মাইকেল মধুসূদন দত্ত …	৫৮
৪৩।	বনবাসে সীতা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত …	৫৯
৪৪।	নূতন বৎসর—মাইকেল মধুসূদন দত্ত …	৬০
৪৫।	নীলধ্বজের প্রতি জনা—মাইকেল মধুসূদন দত্ত …	৬১
৪৬।	মহাকাল—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় …	৬৪
৪৭।	স্বদেশ-গীতি—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় …	৬৬
৪৮।	যমুনালহরী—গোবিন্দচন্দ্র রায় …	৬৮
৪৯।	ব্যথিত-বেদনা—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার …	৭০
৫০।	ঊষা—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার …	৭০
৫১।	হিমাচল—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী …	৭১
৫২।	নিদ্রামগ্ন জগৎ—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী …	৭৩
৫৩।	কামনা—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী …	৭৭
৫৪।	মাতৃস্তুতি—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার …	৮০
৫৫।	শিশুর হাসি—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় …	৮২
৫৬।	জীবন-সঙ্গীত—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় …	৮৩
৫৭।	যমুনাতটে—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় …	৮৫
৫৮।	লজ্জাবতী লতা—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় …	৮৮
৫৯।	জন্মভূমি—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় …	৮৯
৬০।	যমুনা—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় …	৯১
৬১।	যক্ষের আলয়—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর …	৯৫
৬২।	নিশীথ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর …	৯৭
৬৩।	বুদ্ধদেবের তনুত্যাগ—নবীনচন্দ্র সেন …	৯৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
৬৪।	সমুদ্র—নবীনচন্দ্র সেন ...	১০১
৬৫।	অর্জ্জুনের শোক—নবীনচন্দ্র সেন ...	১০২
৬৬।	বাসন্তী পূর্ণিমা—শিবনাথ শাস্ত্রী ...	১০৬
৬৭।	লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে রাম—গিরীশচন্দ্র ঘোষ ...	১০৭
৬৮।	বরষার বিল—গোবিন্দচন্দ্র দাস ...	১১৩
৬৯।	মা-মরা মেয়ে—গোবিন্দচন্দ্র দাস ...	১১৭
৭০।	শেষ বিশ্রাম—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ...	১১৮
৭১।	সন্তান ও জননী—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ...	১১৯
৭২।	ধূলা—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ...	১২০
৭৩।	ভুল-ভাঙ্গা—কায়কোবাদ ...	১২২
৭৪।	সুখ—কামিনী রায় ...	১২৪
৭৫।	মধুর স্বপন—কামিনী রায় ...	১২৬
৭৬।	পথ-ভোলা—কামিনী রায় ...	১২৭
৭৭।	সুনীল সাগরে সোনার কমল—দেবেন্দ্রনাথ সেন	১২৮
৭৮।	বর্ষাসুন্দরী—দেবেন্দ্রনাথ সেন ...	১৩০
৭৯।	রাজা রামমোহন রায়—দেবেন্দ্রনাথ সেন ...	১৩১
৮০।	বঙ্গজননী—অক্ষয়কুমার বড়াল ...	১৩২
৮১।	মানব-বন্দনা—অক্ষয়কুমার বড়াল ✓ FIRST TERM ...	১৩৫
৮২।	প্রকৃতিজননী—অক্ষয়কুমার বড়াল ...	১৩৫
৮৩।	দুরন্ত আশা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৩৮
৮৪।	বধূ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৪০
৮৫।	পদ্মা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৪৪
৮৬।	বঙ্গমাতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৪৫
৮৭।	পূজারিণী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৪৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
৮৮।	ভারত-তীর্থ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৫১
৮৯।	বিদায়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৫৫
৯০।	শারদ প্রভাতে—বিজয়চন্দ্র মজুমদার ...	১৫৭
৯১।	ভারতবর্ষ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ...	১৫৯
৯২।	সমুদ্র—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ...	১৬
৯৩।	হ'তে পাত্তেম—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ...	১৬৩
৯৪।	সেথা আমি কি গাহিব গান—রজনীকান্ত সেন	১৬৫
৯৫।	জাগরণ—রজনীকান্ত সেন ...	১৬৬
৯৬।	বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ—রজনীকান্ত সেন	১৬৭
৯৭।	আমি যাহা চাই—মানকুমারী বসু ...	১৬৭
৯৮।	চাতক—মানকুমারী বসু ...	১৭০
৯৯।	ঊষার জাগরণ—চিত্তরঞ্জন দাশ ...	১৭২
১০০।	প্রত্যাবর্ত্তন—চিত্তরঞ্জন দাশ ...	১৭৪
১০১।	নীরস শীতের গৃহে আজি কে গাইল গান—নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ...	১৭৫
১০২।	ভাবপতঙ্গ—প্রিয়ম্বদা দেবী ...	১৭৭
১০৩	বিশ্ব-ব্যাপ্তি—শশাঙ্কমোহন সেন ...	১৭৮
১০৪	জীবন-ভিক্ষা—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৭৮
১০৫।	আজকে রে মন ঘোমটা খোল—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮২
১০৬।	চির নবীনতা—যতীন্দ্রমোহন বাগচী ...	১৮৩
১০৭।	আমার স্বর্গপুরী—যতীন্দ্রমোহন বাগচী ...	১৮৪
১০৮।	মাটি—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	১৮৬
১০৯।	গ্রীষ্ম—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	১৮৭
১১০।	ফুল শিশি—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	১৮৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
১১১। ছিন্নমুকুল—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	১৯১
১১২। দেয়ালি—কুমুদরঞ্জন মল্লিক	...	১৯২
১১৩। পল্লীরাণী—কুমুদরঞ্জন মল্লিক	...	১৯৭
১১৪। স্নেহের দাগ—কুমুদরঞ্জন মল্লিক	...	১৯৯
১১৫। আশা—অতুলপ্রসাদ সেন	...	২০১
১১৬। ভারত-ভানু—অতুলপ্রসাদ সেন	...	২০২
১১৭। চাষীর দুঃখ—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	...	২০৪
১১৮। হাট—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	...	২০৬
১১৯। বঙ্গলক্ষ্মী—মোহিতলাল মজুমদার	...	২০৮
১২০। রবীন্দ্র বরণ—মোহিতলাল মজুমদার	...	২১০
১২১। বেলা যায়—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	...	২১১
১২২। লালাবাবুর দীক্ষা—কালিদাস রায় (কবিশেখর)		২১৪
১২৩। প্রকৃত লক্ষণ—কালিদাস রায় (কবিশেখর)	...	২১৮
১২৪। বৈশ্বানর—কালিদাস রায় (কবিশেখর)	...	২১৮
১২৫। কেয়ামত রাত্রি—কাজী নজরুল ইস্‌লাম	...	২১৯
১২৬। বাদল দিনে—কাজী নজরুল ইস্‌লাম	...	২২১
১২৭। সত্যেন্দ্র-স্মরণে—কাজী নজরুল ইস্‌লাম	...	২২৩
১২৮। হাজী মহম্মদ মহসীন—গোলাম মোস্তাফা	...	২২৫
১২৯। কবর—জসীমউদ্দীন	...	২২৬
১৩০। পুত্র-স্নেহ—জসীমউদ্দীন	...	২৩০
১৩১। কোকিলের প্রতি—ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী	...	২৩৩
১৩২। নব বসন্ত—সালেমা খাতুন	...	২৩৬
১৩৩। পান্থশালা—শেখ্ ফজলল করিম	...	২৩৬
১৩৪। স্বর্গ ও নরক—সেখ্ ফজলল্ করিম	...	২৩৯

বিষয়			পৃষ্ঠা
১৩৫।	খোদেজা বিবির প্রতি—সৈয়দ এম্‌দাদ্ আলী	··	২৩৯
১৩৬।	ঈদ—সৈয়দ এম্‌দাদ্ আলী	·	২৪১
১৩৭।	চণ্ডীদাস—প্যারীমোহন সেনগুপ্ত	···	২৪৩
১৩৮।	গৃহবধূ—উমাদেবী	··	২৪৫
১৩৯।	মেনি—উমাদেবী	··	২৪৬
১৪০।	আকবর—হুমায়ুন কবীর	···	২৪৭
১৪১।	সাথী—হুমায়ুন কবীর	···	২৫০
১৪২।	তাজেব স্বপ্ন—রামেন্দু দত্ত	··	২৫২
১৪৩।	শীতেব শেষে—বামেন্দু দত্ত	·	২৫৬
১৪৪।	কবিব বীণা—বন্দেআলী মিঞা	·	২৫৭
১৪৫।	শাবদলক্ষ্মী—বন্দেআলী মিঞা	····	২৫৮
১৪৬।	অন্ধের ব্যথা—শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ		২৫৯
১৪৭।	প্রতিশোধ—কাদের নওয়াজ	···	২৬১
১৪৮।	বিধাতার ভিক্ষা—আবুল হাশেম	··	২৬২
১৪৯।	পিতা স্বর্গ—কিরণধন চট্টোপাধ্যায়	·	২৬৪
১৫০।	চাষী—পরিমলকুমাব ঘোষ	···	২৬৬
১৫১।	কবিব কামনা—সুশীলকুমার দে	···	২৬৯
১৫২।	আদাব ব্যাপাবী—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়	···	২৭০
	সূচনা	···	১
	অবতরণিকা		৩

ত্রিধারা

প্রথম প্রবাহ

১

আত্মনিবেদন

যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলোঁ
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি' কোই ন পুছই
করম সঙ্গে চলি' যায়॥ ৪
এ হরি! বন্দো তুয়া পদ-নায়।
তুয়া পদ পরিহরি' পাপ-পয়োনিধি
পার হোয়ব কোন উপায়? ৭
তাতল সৈকতে বারি বিন্দুসম
সুতমিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে? ১১
মাধব! হাম পরিণাম-নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়—
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥ ১৪

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
    ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি' পুনঃ তোহে সমাওত
    সাগরলহরী সমানা ॥ ১৮
    মাধব ! বহুত মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
    দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥ ২১
গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি
    যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
    জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥ ২৫
কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
    অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ
    মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥ ২৯
ভণয়ে বিদ্যাপতি' অতিশয় কাতর
    তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
    তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ ৩৩

—বিদ্যাপতি

২

ঋতুরাজ

আওল ঋতুপতি, রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী-পন্থ ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পয়গণ্ড।
কেশর-কুসুম ধরল হেমদণ্ড ॥
নৃপ-আসন নব পীঠল-পাত।
কাঞ্চন-কুসুম ছত্র ধরু মাথ ॥
মৌলি রসালমুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায় ॥
শিখিকুল নাচত, অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল পঢ়ু আশীষ-মন্ত্র ॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ।
মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥
কুন্দবল্লী তরু ধরল নিশান।
পাটল তূণ, অশোকদল বাণ ॥
কিংশুক লবঙ্গলতা একসঙ্গ।
হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিককুল।
শিশিরক সবহু কয়ল নিরমূল ॥
উধারল সরসিজ, পাওল প্রাণ।
নিজ নবদলে করু আসন দান ॥
নববৃন্দাবন-রাজ্যে বিহার।
বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার ॥

—বিদ্যাপতি

৩

ভুবন-মোহন শ্যাম

জলদ-বরণ কানু   দলিত অঞ্জন জনু
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর   পি'তে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি হয়॥

কিবা সে চাহনি,   ভুবন ভুলনী,
দোলনি গলে বনমাল।
মধুর লোভে   ভ্রমরা বুলে,
বেড়িয়া তহিঁ রসাল॥

ভাঙ ধনুভঙ্গিঠাম,   নয়ানকোণে পূরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি।
বরণ দেখিনু শ্যাম   জিনিয়া ত কোটি কাম
বদন জিতল কোটি শশী॥

অতি সুশোভিত   বক্ষ বিস্তারিত,
দেখিনু দর্পণাকার।
তাহার উপরে   মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার?

চরণ-নখরে   বিধু বিরাজিত
মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাস হিয়া   সেরূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায়॥

—চণ্ডীদাস

৪

বিরহিণী রাধা

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা !
বসিয়া বিরলে   থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা। ৩

সদাই ধেয়ানে   চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ন-তারা ;
বিরতি আহারে   রাঙ্গাবাস পরে,
যেমত যোগিনী পারা। ৭

ঘরের বাহিরে   দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন   নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়। ১১

সদাই চঞ্চল   বসন-অঞ্চল
সংবরণ নাহি করে ;
বসি থাকি থাকি   উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসিয়া পড়ে। ১৫

—চণ্ডীদাস

৩

আক্ষেপানুরাগ

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল ;
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল। ৪

সখি, কি মোর কপালে লেখি !
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি। ৭

উচল বলিয়া অচলে চড়িনু,—
পড়িনু অগাধ জলে ;
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে। ১১

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল ;
জ্ঞানদাস কহে শ্যামের পীরিতি
মরমে রহল শেল ১৫

—জ্ঞানদাস

৬

মাতৃ-স্নেহ

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর ! নব তৃণ কুশাঙ্কুর
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে ॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে রাঙ্গা পায় যদি লাগে
প্রবোধ না মানে মায়ের মন ॥
নিকটে গোধন রেখো 'মা' ব'লে শিঙ্গাতে ডেকো
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলা গোপ-জাতি গোধন-পালন-বৃত্তি
তেঞি বনে পাঠাইয়া দিব ॥
বলরামদাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী !
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয় ॥

—বলরাম দাস

৭

ঝর ঝর জলধর-ধার

ঝর ঝর জলধর-ধার ;
ঝঞ্ঝা পবন বিথার ;
ঝলকত দামিনীমালা,
ঝামরি তৈ গলে বালা।
ঝুঠ কি কহব কানাই,
ঝুরত তুয়া বিনু বাই।
ঝন ঝন বজর-নিশানে
ঝাঁপি রহত দুই কানে।
ঝিঞ্ঝি-ঝঙ্কর রাতি,
ঝঙ্ক সহনে নাহি যাতি।

—গোবিন্দ দাস

৮

আত্মবিলোপ

ওঁ হে পরাণ-বঁধু তুমি।
কি আর বলিব আমি॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিতে কি যাবে আমার॥
কে জানে মনের কথা কাহারে কহিব।
তোমারে তোমার দিয়া তোমার হইয়া রব॥

—সৈয়দ মর্ত্তুজা

৯

ভ্রাতৃভক্তি

কৈকেয়ী সকল কহে ভরতের স্থানে।
রামের অশেষ গুণ প্রথমে বাখানে॥
"ভকত-বৎসল রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
জনক-জননী-প্রাণ, গুণের সাগর॥
শ্রীরাম হইলে রাজা সবার কৌতুক।
রামের প্রসাদে লোক পায় নানা সুখ॥
কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস।
হেন কালে রামেরে দিলাম বনবাস॥
তোমারে রাজত্ব দিয়া রাম গেল বন।
হা রাম! বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন॥
মাতৃ-ধার পুত্রে কভু শুধিতে না পারে।
রাম লয়েছিল রাজ্য দিলাম তোমারে॥
রাজা হ'য়ে রাজ্য কর, বৈস রাজপাটে।
রাজলক্ষ্মী আছে, পুত্র, তোমার ললাটে॥"
আঘাত লাগিলে ঘায়ে জ্বলে তা যেমন।
তেমতি ভরত বলে হ'য়ে জ্বালাতন॥—
"রাজকুলে জন্মিয়া, শুনিলে কোন্ খানে।
কনিষ্ঠ হইবে রাজা জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে?

শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজেন জীবন।
তুমি কেন শ্রীরামের ঘটাইলে বন? ২০
রাজার প্রসাদে তব এতেক সম্পদ্।
তিন কুল মজাইলে স্বামী করি' বধ॥"
ভরত জ্বলন্ত-অগ্নি তুল্য ক্রোধে জ্বলে।
দেখিয়া কেকয়ী তবে যায় অন্যস্থলে॥ ২৪
যাইতে যাইতে রাণী করিছে বিষাদ।
কার লাগি' করিলাম এতেক প্রমাদ॥

—কৃত্তিবাস

১০

ভরত-মিলন

ভরত কহেন ধরি রামের চরণ।
"কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন?
বামা জাতি স্বভাবতঃ অল্প বুদ্ধি ধরে।
তার বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে? ৪
অপরাধ ক্ষমা কর, চল প্রভু দেশ।
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ॥
অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার॥ ৮

চল প্রভু, অযোধ্যায় লহ রাজ্যভার।
দাসবৎ কর্ম্ম করি আজ্ঞা অনুসার॥"
শ্রীরাম বলেন, "তুমি ভরত পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল এ নহে উচিত॥
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতায়।
বনে আইলাম আমি পিতার আজ্ঞায়॥
চৌদ্দবর্ষ পালি আমি পিতার বচন।
ফিরিব অযোধ্যা-ধামে দেখিবে তখন॥"
শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়।
"ভরতের প্রতি বাম কি অনুজ্ঞা হয়?
তোমা বিনা ভরতের আর নাহি গতি।
বুঝিয়া ভরতে রাম কর অনুমতি॥"
শ্রীরাম বলেন, "মুনি, হইলাম সুখী।
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি॥
ভরতে আমাতে নাহি করি অন্যভাব।
ভরতের রাজত্বে আমার রাজ্যলাভ॥
যাও ভাই ভরত ত্বরিত অযোধ্যায়।
মন্ত্রিগণ ল'য়ে রাজ্য করহ তথায়॥
সিংহাসন শূন্য আছে ভয় করি মনে।
কোন শত্রু আপদ ঘটাবে কোন ক্ষণে!
তোমারে জানাব কত আছ যে বিদিত।
বিবেচনা করিবে সর্ব্বদা হিতাহিত॥

চতুর্দ্দশ বছর জানত গত প্রায়।
চারি ভাই একত্র হইব অযোধ্যায় ॥"
যোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়।
"কেমনে রাখিব রাজ্য মম সাধ্য নয় ॥
তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা।
তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা ॥
তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম ঘরে।
ত্রিভুবনে আমার কি করে কার ডরে ?"
শ্রীরাম বলেন, "হে ভরত প্রাণাধিক !
পাদুকা লইয়া যাও কি কব অধিক ॥
নন্দীগ্রামে পাট করি কর রাজকার্য্য।
সাবধান হইয়া পালিও পিতৃরাজ্য ॥"
শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে ॥
পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায়।
চলেন ভরত তবে রামের আজ্ঞায় ॥

—কৃত্তিবাস

১১

শ্রীরামের বিলাপ

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে,
"ভুলিতে পারি না সীতা সদা মনে জাগে।
কি করিব, কোথা যাব, অনুজ লক্ষ্মণ,
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী
লুকাইয়া আছেন, লক্ষ্মণ দেখ দেখি!
বুঝি কোন মুনীপত্নী-সহিত কোথায়
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়?
গোদাবরী-তীরে আছে কমল-কানন
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ?
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া?
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা?
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে,
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে;
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে—
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এতদিনে!

সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে,
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে।
কনকলতার প্রায় জনকতুহিতা
বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা ?
দিবাকর, নিশাকর, দীপ্ত তারাগণ,
দিবানিশি করিতেছে তম নিবারণ ;
তা'রা না হরিতে পারে তিমির আমার—
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার।
দশদিক্ শূন্য দেখি সীতা অদর্শনে,
সীতা বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে।
সীতা ধ্যান, সীতা জ্ঞান, সীতা চিন্তামণি,
সীতা বিনে আমি যেন মণি-হারা ফণী।
দেখ রে লক্ষ্মণ ভাই, কর অন্বেষণ ;
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন।
আমি জানি, পঞ্চবটি, তুমি পুণ্যস্থান ;
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান।
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে
শূন্য দেখি তপোবন, সীতা নাই ঘরে !"

—কৃত্তিবাস

১২

মৃত্যু-বাণ

শ্রীরাম বলেন, "রক্ষঃ কি ভাবিছ বসে ?
মরণ নিকট তব যুদ্ধ দেহ এসে ॥"
এত বলি দিলা রাম ধনুকে টঙ্কার।
শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ বাজে আরবার ॥
হইল বিষম যুদ্ধ না যায় গণন।
মহাকোপে বাণবৃষ্টি করিছে রাবণ ॥
মাতলি সারথি বানে হইল অস্থির।
বাণে বাণে নিবারণ কৈলা রঘুবীর ॥
শূন্যপথে থাকিয়া দেখিছে দেবগণ।
মৃত্যুবাণ যুড়ে রক্ষঃ-নিধন-কারণ ॥
হংসাকৃতি বাণের যে মুখের আকার।
বাণ দেখে দেবতার লাগে চমৎকার ॥
কনক-রচিত বাণ ভুবন প্রকাশে।
বাণের মুখেতে অগ্নি রহে গুপ্তবেশে ॥
পশুপতি বৈসেন বাণের মধ্যখানে।
চালনা করেন ঊনপঞ্চাশ পবনে ॥
ধরাধর ধরাতে বিরাজে নিরন্তর।
অলক্ষিতে যম রহে বাণের উপর ॥

বাণের গর্জ্জনে ত্রিভুবন লাগে ডর।
পর্ব্বত উপাড়ি পড়ে উথলে সাগর॥
কৃষ্ণবর্ণ বাণের সকল অঙ্গজ্যোতি।
তিলেকেতে বিনাশিতে পারে বসুমতী॥
নানা পুষ্পমাল্য দিয়া বানগোটা সাজি,
মন্ত্র পড়ি রঘুনাথ বাণব্রহ্ম পূজি॥
মৃত্যু-অস্ত্র রঘুনাথ যুড়ে মন্ত্রবলে।
ধূম উঠে বাণমুখে ব্রহ্ম-অগ্নি জ্বলে॥
মহাশব্দ করিয়া সঘনে গর্জ্জে বাণ।
দেখিয়া যে রাবণের উড়িল পরাণ
চিনিল রাবণরাজা দেখি মৃত্যুবাণ।
জানিল যে এই বানে বাহিরিবে প্রাণ॥
বিশ্বামিত্র স্মরি বাণ ছাড়ে রঘুবীর।
রাবণের বুকে বিন্ধি কৈল দুই চির॥
ছট্‌ফট্ করে রাজা পড়ি ভূমিতলে।
ব্রহ্মাদি দেবতা দেখে গগনমণ্ডলে॥

—কৃত্তিবাস

১৩

কালকেতুর শৈশব

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
জিনিয়া মাতঙ্গ গতি যেন নব রতিপতি
সভার লোচন-সুখ-হেতু।
নাক মুখ চক্ষু কান .কুন্দে যেন নিরমাণ
দুই বাহু লোহার সাবল ;
'ণ শীল রূপ বাঢা, যেন সে শালের কোঁড়া,
জিনি শ্যাম-চামর কুন্তল।
বিচিত্র কপালতটী গলায় জালের কাঁঠি
করযুগে লোহার শিকলী ;
বুক শোভে বাঘনখে অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে
তনুমাঝে শোভিছে ত্রিবলী।
কপাট-বিশাল বুক, জিনি ইন্দীবর মুখ
আকর্ণ-দীঘল বিলোচন ;
গতি জিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ
মোতিপাঁতি জিনিয়া দশন।
দুই চক্ষু জিনি নাটা ঘুরে যেন কড়ি-ভাটা
কানে শোভে স্ফটিক-কুণ্ডল,
পরিধান বীরধড়ি মাথায় জালের'দড়ী
শিশুমাঝে যেমন মণ্ডল।
লইয়া ফাউড়া ডেলা যার সঙ্গে করে খেলা
তার হয় জীবন সংশয় ;

যে জনে আঁকড়ি ধরে পড়য়ে ধরণী'পরে
ভয়ে কেহ নিয়ড়ে না রয়।
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে তাড়িয়া শশারু ধরে,
দূরে গেলে ছুবায় কুকুরে,
বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে লতায় জড়িয়া বান্ধে—
কান্ধে ভার বীর আইসে ঘরে।

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

১৪

ফুল্লরার দুঃখ

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী—
ভাঙ্গা কুঁড়েঘর, তালপাতার ছাউনী।
ভেরেণ্ডার থাম ওই আছে মধ্যঘরে,
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে।
বৈশাখে অনল-সমান বসন্তের খরা,
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা।
পায় পোড়ে খরতর রবির কিরণ;
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন।
বৈশাখ হ'ল বিষ গো, বৈশাখ হ'ল বিষ—
মাংস নাহি খায়—সর্ব্বলোক নিরামিষ।
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস, পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস,
বেঙচের ফল খেয়ে করি উপবাস।

ফুল্লরার দুঃখ

আষাঢ় পূরিল মহী, নব মেঘে জল,
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল।
মাংসের পসরা ল'য়ে ফিরি ঘরে ঘরে,
কিছু খুদ কুঁড়া পাই—উদর না পূরে।
শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী,
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।
আচ্ছাদন নাহি অঙ্গে, পড়ে মাংস-জল,—
কত মাছি খায় অঙ্গে মোর কর্ম্মের ফল।
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি—
কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী।
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল—
সকলে দরিদ্র, বীর অন্নেতে বিবল।
কিরাত-নগরে বসি, না মিলে উধার,
হেন বন্ধুজন নাহি যেবা সহে ভার।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,—
বৃষ্টি হইলে কুঁড়েয় ভেসে যায় বান।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে,
ছাগ মেষ মহিষ করয়ে বলিদানে।
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা,
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।
মাংস কেহ না আদরে, মাংস কেহ না আদরে,
দেবীর প্রসাদ-মাংস সবাকার ঘরে।

কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম,
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়,
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।
পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজন,
তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ!
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা,
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা।
মাঘ মাসে অনিবার সদাই কুজ্‌ঝটী,
আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আখেটী।
সহজে শীতল ঋতু ফাল্গুন মাসে,
তোষয়ে সকল লোক বসন্ত বাতাসে।
অনল সমান পোড়ে চৈতের খরা,
চালু সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা;
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম্ চক্রবর্ত্তী

১৫

কমলে কামিনী

রাজার আদেশ পেয়ে   সঙ্গে সাত তরী লয়ে
নদ নদী সিন্ধু মগারয়।
অবধান কর ভূপ,   যে দেখিল অপরূপ
কহিতে হৃদয়ে লাগে ভয়॥ ৪
সঙ্গে সাত তরী লয়ে   আইলাম অজয় বেয়ে
উপনীত ইন্দ্রানীর ঘাটে।
ধৌত-হরি-পদদ্বন্দ্বা   বাহিল অলকনন্দা
আনন্দে আইল গীত-নাটে॥ ৮
ডানি বামে যত গ্রাম   তার কত লব নাম?
উপনীত ত্রিবেণীর তীরে।
প্রভাতে করিয়া স্নান   যথাবিধি দিয়া দান
ঘটে পূরে নিল গঙ্গা-নীরে॥ ১২
মগরায় ঝড় বৃষ্টি   শিব দিলা কৃপাদৃষ্টি
ভাগ্যে এড়াইল মধুকর।
মগরা করিল বল   ছয় ডিঙ্গা হ'ল তল
প্রাণ রক্ষা করিল শঙ্কর॥ ১৬
জাহ্নবী-সাগর-সঙ্গ   পর্ব্বতসম তরঙ্গ
বাহিলাম প্রাণ করি হাতে।
ডানিভাগে নীলগিরি   সিন্ধুকূলে অবতরি
দেখিলাম প্রভু জগন্নাথে॥ ২০
কেবল দুঃখের পথ   বাহিলাম নানা মত
উপনীত হইল সিংহলে।
সুধন্য সিংহল দেশ   কালীদহে পরবেশ
শশীমুখী দেখিল কমলে॥ ২৪

সেই কালীদহ-জলে কুমারী কমল দলে
গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।
অতি কৃশোদরী বালা মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা
শশীমুখী খঞ্জন-লোচনা॥

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

১৩

প্রণাম

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার,
যেই প্রভু জীব দানে স্থাপিল সংসার।
আপনা প্রচার হেতু সৃজিল জীবন;
নিজ ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ।
সুগন্ধ সৃজিল প্রভু স্বর্গ আকলিতে;
সৃজিলেক দুর্গন্ধ নরক জানাইতে।
মিষ্টরস সৃজিলেক কৃপা-অনুরোধ;
তিক্ত-কটু-কষা সৃজি' জানাইল ক্রোধ।
পুষ্পে জন্মাইল মধু সুগুপ্ত আকার;
সৃজিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার।
এতেক সৃজিতে তিল না হৈল বিলম্ব;
অন্তরীক্ষ গঠিয়া রাখিছে বিনি স্তম্ভ।

সেই এক ধনপতি যাহার সংসার
সকলেরে দেয় দান, না টুটে ভাণ্ডার।
ক্ষুদ্র পিপীলিকা হতে ঐরাবত আর
কাকে নাহি বিস্মরণ, দিয়াছে আহার।
হেন দাতা আছে কোথা, শুন গজানন,
সবাকে খাওয়ায় পুনঃ না খায় আপন ;
যেই ইচ্ছা সেই করে, কেহ নাহি জানে,
মন বুদ্ধি অন্ধ ধন্ধ তাহার কারণে।
সেই সে সকল গড়ে, সকল ভাঙ্গয় ;
ভাঙ্গিয়া গঠয় পুনঃ যদি মনে লয় ;
অনেক অপার অতি প্রভুর করণ,
কহিতে অকথ্য কথা না যায় বর্ণন।
সপ্ত মহী, সপ্ত স্বর্গ, বৃক্ষপত্র যত,
সপ্ত শূন্য ভরি যদি সৃজয় জগত ;
যতবিধ নবগৃহ আর বৃক্ষশাখা,
যত লোমাবলী আর যত পক্ষী-পাখা,
পৃথিবীর যত রেণু, স্বর্গে যত তারা,
জীবজন্তু-শ্বাস আর বরিষাব ধারা,—
যুগে যুগে বসি যদি স্তুতিএ লেখয়
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয়।

—সৈয়দ আলাওল

১৭

একলব্যের গুরুদক্ষিণা

একদিন অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যস্থানে।
আইল নিষাদ এক শিকার কারণে ॥
হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম ॥

যোড়হাত করি বলে নিষাদনন্দন।
তথাপি তাহারে শিক্ষা না দিলেন দ্রোণ ॥
দ্রোণ বলিলেন, "তুই হোস্ নীচ জাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি ॥"

দ্রোণাচার্য্য মুখে যবে নিষ্ঠুর শুনিল।
দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল ॥
নিষাদের বেশ ত্যজি হৈল ব্রহ্মচারী।
জটাবল্ক পরিধান, ফলমূলাহারী ॥

মৃত্তিকার দ্রোণ এক করিয়া রচন।
নানা পুষ্প দিয়া তাঁর করয়ে পূজন ॥
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর।
সর্ব্বমন্ত্র জ্ঞাত হৈল সর্ব্ব-শস্ত্র আর ॥

তবে কতদিন পরে কৌরবনন্দন।
সেই বনে গেল সবে মৃগয়া কারণ ॥

মৃগয় করিছে যত রাজার কোঙর।
হেন কালে এক পাণ্ডবের অনুচর॥

করিয়া-কুক্কুর সঙ্গে যায় পাছে পাছে।
উত্তরিলা যথা নিষাদপুত্র আছে॥
শব্দ করে কুক্কুর দেখিলা ব্রহ্মচারী।
চারিদিকে ভ্রমে তারে প্রদক্ষিণ করি॥

কুক্কুরের শব্দে তার ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
ক্রোধে কুক্কুরের মুখে মারে সপ্তবাণ॥
না মরিল কুক্কুর না হৈল মুখে ঘা।
অলক্ষিতে কুক্কুরের রুধিলেক রা॥

কুক্কুর নিঃশব্দে ধায় মুখে করি শর।
কতক্ষণে গেল তবে কুমার গোচর॥
কুক্কুরের মুখে শর আশ্চর্য্য দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল অনুচরে বিস্মিত হইয়া॥

"এহেন অদ্ভুত কর্ম্ম কভু নাহি শুনি।
বহু বিদ্যা জানি, হেন বিদ্যা নাহি জানি।॥"
সবে মিলি গেল যেথা আছে ব্রহ্মচারী।
দেখিল বসিয়া আছে ধনুঃশর ধরি॥

জিজ্ঞাসিল সবে "তুমি হও কোন্ জন ?
কার স্থানে এ বিদ্যা করিলা অধ্যয়ন ?"

ব্রহ্মচারী বলে, "মম একলব্য নাম।
গুরু দ্রোণ স্থানে অস্ত্র শিক্ষা করিলাম॥

শুনিয়া বিস্ময় মানে যতেক কুমার।
অর্জ্জুন শুনিয়া চিন্তা করেন অপার॥
মৃগয়া সম্বরি তবে যত ভ্রাতৃগণ।
দ্রোণ স্থানে করিলেন সব নিবেদন॥

বিনয়ে কহেন পার্থ বিরস বদন—
"আমারে নিগ্রহ কেন কৈলা ভগবন॥
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর নরে।
সেই বিদ্যা শিখাইল নিষাদকুমারে॥

অর্জ্জুনের বাক্যে দ্রোণ মানিয়া বিস্ময়।
ক্ষণেক নিঃশব্দে চিন্তা করেন হৃদয়॥
অর্জ্জুনের সাথী করি আচার্য্য তখন।
উপনীত হ'ল যথা নিষাদনন্দন॥

একলব্য দ্রোণে দেখি প্রণাম কবিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রেতে দাঁড়াইল॥
দ্রোণ বলিলেন. "যদি তুমি শিষ্য হও।
তবে গুরুদক্ষিণা আমারে আজি দাও॥"

একলব্য বলে, "প্রভু, মম ভাগ্যবশে।
কৃপা করি তুমি, প্রভু, এলে মম পাশে॥

সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু-অধিকার।
যা কিছু আছে আমার সকলি তোমার॥

আজ্ঞা কর, প্রভু, করিলাম অঙ্গীকার।
প্রাণ যদি চাহ দিব শ্রীপদে তোমার॥"
দ্রোণ বলিলেন, "যদি আমারে তুষিবা।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটি দিবা॥"

ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিল।
গুরু-আজ্ঞায় অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিল॥
তুষ্ট হইলেন গুরু আর ধনঞ্জয়।
মনে জানিলেন গুরু আমারে সদয়॥

একলব্য গুরুভক্তি দেখিয়া নয়নে।
স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে॥

—কাশীরাম দাস

১৮

পরার্থ

একচক্রা নগরেতে ব্রাহ্মণের ঘরে
ব্রাহ্মণের বেশে পাণ্ডবেরা বাস করে॥
একদিন গৃহেতে রহিল বৃকোদর।
ভিক্ষার কারণে গেলা চারি সহোদর॥

আচম্বিতে বিপ্রগৃহে মহাশব্দ শুনি',
বিলাপ করিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী,
করুণ-হৃদয়া কুন্তী সহিতে নারিল,
ব্রাহ্মণের ঘরে কুন্তী গমন করিল।
মৃতের উপরে যেন সুধা-বরিষণে
জিজ্ঞাসিল কুন্তীদেবী মধুর বচনে—
"কি কারণে ক্রন্দন করহ তিনজন ?
জানিলে, হইলে সাধ্য, করিব মোচন॥"
দ্বিজ বলে,—"যেই হেতু করিয়ে ক্রন্দন,
মনুষ্যের শক্তি নাহি করিতে মোচন।
এই তো নগরে আছে বক নিশাচর,
অত্যন্ত দুরন্ত, হয় রাজ্যের ঈশ্বর।
আজি তার ভোজনের পালা মম ঘরে,
কি করিব, কি হইবে, বাক্য নাহি সরে।
এই ভার্য্যা, কন্যা, পুত্র, আছি চারিজনা,
কারে দিব বলিদান করিয়ে ভাবনা।
কারো মায়া তেয়াগিতে নারে কোনজনে।
সবে মিলে যাব, হবে যে থাকে লিখনে।"
ব্রাহ্মণের এতেক কাতর বাক্য শুনি',
সদয় হৃদয়ে বলে ভোজের নন্দনী,—
"ভয় ত্যজ, দ্বিজবর, না কর' ক্রন্দন,
সকুটুম্ব যাবে কেন রাক্ষস-সদন ?

পঞ্চ পুত্র আছে মোর, শুনহ ব্রাহ্মণ,
এক পুত্র দিব আমি তোমার কারণ।”
ব্রাহ্মণ বলিল,—“ভাল করিলা বিচার,
অতিথি ব্রাহ্মণ আছে আশ্রয়ে আমার,
আপনার প্রাণ-হেতু করিব এ কর্ম্ম,
লোকে অপযশ হবে, মজিবেক ধর্ম্ম।”
কুন্তী কৈল,—“যতেক কহিলা, দ্বিজমণি,
মম অগোচর নহে, আমি সব জানি।
লোকের বেদনা মোর না সহে পরাণে,
বিশেষ তোমার দুঃখ সহিব কেমনে ?”
দ্বিজ বলে,—“হেন বাক্য না বলিহ মোরে,
এ পাপ অর্জ্জিব আমি কত কাল তরে !”
নিঃশব্দে বলেন কুন্তী,—“শুন দ্বিজবর,
মোর পুত্রগণ হয় মহাবলধর।
রাক্ষস খাইবে তারে না করিহ মনে,
রাক্ষস সংহার কৈল মম বিদ্যমানে !”
কুন্তীর অদ্ভুত হেন শুনিয়া বচন,
মৃতদেহে দ্বিজ যেন পাইল জীবন !
দ্বিজে সঙ্গে করি’ কুন্তী করিলা গমন;
বৃকোদরে জানাইল সব বিবরণ।
মায়ের বচনে ভীম কৈল অঙ্গীকার।
হরিষে ব্রাহ্মণ গৃহে গেল আপনার ॥

কতক্ষণে আইলেন ভাই চারিজন,
যুধিষ্ঠির শুনিলা সকল বিবরণ ;
একান্তে ধর্ম্মের পুত্র ডাকিয়া মায়েরে,
জিজ্ঞাসিল,—"কোথায় গেলেন বৃকোদরে ?"
কুন্তী বলে,—"আমার বচনে বৃকোদর,
বিপ্রের কারণে আর রাখিতে নগর।"
এত শুনি' যুধিষ্ঠির হয়েন বিরস ;—
"কি বুদ্ধিতে মাতা, হেন কৈলে দুঃসাহস।
এমন দুষ্কর, মাতা, নাহি শুনি লোকে,
মা হইয়া পুত্রে দেয় রাক্ষসের মুখে !
পুত্রের ভিতর পুত্র বিশেষ আছয়,
সবে প্রাণ রাখয়ে যাহার ভুজাশ্রয়,
হেন পুত্র দিলা তুমি রাক্ষস ভক্ষণে,
হেন কর্ম্ম কৈলে মাতা কিসের কারণে ?
গর্ভধারী হ'য়ে হেন কেহ নাহি করে,
বেদে নাহি শুনি, দেখি সংসার ভিতরে।"
কুন্তী বলে,—যুধিষ্ঠির, না ভাবিহ তাপ,
মোর অগোচর নহে ভীমের প্রতাপ।
ভীম-পরাক্রম পুত্র জানি আমি ভালে,
রাক্ষস সংহার হবে ভীম-ভুজ-বলে।
ভয়ার্ত্তকে ভয়ে ত্রাণ করে যেই জন,
তার সম পুণ্য কর্ম্ম না করি গণন।

রাজ্যরক্ষা, দ্বিজরক্ষা, অতুল পৌরুষ।
হেন কর্ম্মে কেন তুমি হইলা বিরস ?”
মায়ের এতেক নীতি শুনিয়া বচন,
“ধন্য ধন্য !” বলি’ কৈল ধর্ম্মের নন্দন
“পরদুঃখে দুঃখী মাতা, দয়ালু হৃদয়,
তোমা বিনে হেন বুদ্ধি অন্যের কি হয় !
পর-পুত্র-প্রাণ-হেতু নিজ পুত্র দিলা,
ব্রাহ্মণেরে পরম সঙ্কটে ত্রাণ কৈলা।
তোমার পুণ্যেতে মাতা, তরিব বিপদে,
রাক্ষসে মারিবে ভীম তব আশীর্ব্বাদে !”

—কাশীরাম দাস

১৯

ভীষ্ম

“পিতার বিবাহ-হেতু কৈনু অঙ্গীকার—
আজি হৈতে রাজ্যে মোর নাহি অধিকার।
তোমার অগ্রেতে আমি কৈনু অঙ্গীকার—
বিভা না করিব, সত্য বচন আমার ॥”
এতেক বচন যদি দেবব্রত কৈল।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নরে চমৎকার হৈল ॥
দেবতা অসুর নরে কর্ম্ম অনুপাম।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈলা, ভীষ্ম তাই নাম ॥

—কাশীরাম দাস

২০

দুঃখের বড়াই

আমি কি দুঃখেরে ডরাই ?
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই !
আগে পাছে দুঃখ চলে মা,
যদি কোন খানেতে যাই।
তখন, দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে
দুঃখ দিয়ে মা বাজার মিলাই।
প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ী,
বোঝা নামাও, ক্ষণেক জিরাই।
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে,
আমি করি দুঃখের বড়াই।

— কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

২১

উমার বাল্যলীলা

গিরিবর, আর আমি পারিনে হে
প্রবোধ দিতে উমাবে।
উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন্যপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশী
বলে উমা, "ধরে দে উহারে।

কাঁদিয়ে ফুলাল আঁখি মলিন ও মুখ দেখি'
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ?
"আয়, আয়, মা, মা" বলি ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথা রে !
আমি কহিলাম তায় "চাঁদ কি রে ধরা যায় ?"
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।
উঠে ব'সে গিরিবর, করি' বহু সমাদর
গৌরীরে লইয়া কোলে ক'রে—
সানন্দে কহিছে হাসি' "ধর মা, এই লও শশী"
মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে !

—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

২২

মানস পূজা

মন, তোর এত ভাবনা কেনে ?
একবার কালী ব'লে ব'স রে ধ্যানে।
জাঁকজমকে কর্‌লে পূজা
অহঙ্কার হয় মনে মনে ;
তুমি, লুকিয়ে তারে করবে পূজা
জান্‌বে না রে জগজ্জনে।

ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি
কাজ কি রে তোর সে গঠনে ?
তুমি, মনোময় প্রতিমা করি,
বসাও হৃদি-পদ্মাসনে !
আলোচাল আর পাকা কলা
কাজ কি রে তোর আয়োজনে ?
তুমি, ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে
তৃপ্তি কব আপন মনে।
ঝাড়লণ্ঠন বাতির আলো
কাজ কি রে তোর সে রোসনাইয়ে ?
তুমি, মনোময় মাণিক্য জ্বেলে,
দেও না—জ্বলুক নিশিদিনে।
মেষ ছাগল মহিষাদি
কাজ কি রে তোব বলিদানে ?
তুমি "জয় কালী। জয় কালী।" ব'লে
বলি দাও ষড়্ রিপুগণে।
প্রসাদ বলে ঢাকে ঢোলে—
কাজ কি রে তোর সে বাজনে ?
তুমি "জয় কালী" বলি', দেও করতালি
মন রাখ সেই শ্রীচরণে।

—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

২৩

শিবের ভিক্ষা-যাত্রা

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেণ অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥
যেখানে যেখানে হর অন্ন-হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন বিনা শুনিতে না পান॥
ববম্ ববম্ ঘন ঘন বাজে গাল।
ভভম্ ভভম্ ভম্ শিঙ্গা বাজে ভাল॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে।
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে॥
দূর হইতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল ব'লে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল করে শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুলফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল॥

আর আর দিন তাহে হাসেন গোঁসাই।
ও দিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই॥
চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচিত্তচিত্ত সেই সদা দুঃখী॥
এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব।
সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব ?
কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল॥
কান্দিছে আপনা শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া ?
আজি মেনে ফিবে মাগ শঙ্কর ভিখারী।
কালি আস দিব অন্ন আজি ত না পারি॥
এইরূপে শঙ্কর ফিবিয়া ঘর ঘর।
অন্ন না পাইয়া হৈলা বড়ই কাতর॥
ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ।
বৈকুণ্ঠে গেলেন, যথা লক্ষ্মী-নারায়ণ॥
আস লক্ষ্মি, অন্ন দেহ, ডাকেন শঙ্কর।
ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা ফাঁফর॥

—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

২৪

বিশেষণে সবিশেষ

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গনীর তীরে।
"পার কর" বলিয়া ডাকিয়া পাটনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
"একা দেখি কুলবধূ, কে বট আপনি?
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার॥"
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
"বুঝহ ঈশ্বরী, আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ-জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি, তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ!
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥

গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে, পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥"
পাটনী বলিছে, "মাগো, বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড়, দিবা কিবা, বল?"
দেবী কন, "দিব, আগে পারে লয়ে চল॥"

—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

২৫

কৈলাস ভূধর

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি-শশী-পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরোগণের বাস॥
রজনী বাসর মাস সংবৎসর
দুই পক্ষ সাত বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ কিছু নাহি ভেদ
সুখ দুঃখ একাকার॥
তরু নানা জাতি লতা নানা ভাতি
ফলে-ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত॥

অতি উচ্চতরে   শিখরে শিখরে
সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে   ভ্রমর ঝঙ্কারে
মুনির মানস হরে॥
মৃগ পালে পাল   শার্দ্দূল ভয়াল
কেশরী হস্তী রাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে   ক্রীড়া করে রঙ্গে
ইন্দুরে পোষে বিড়াল॥
সবে পিয়ে সুধা   নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা
কেহ নাহি হিংসে করে।
যে যার ভক্ষক   সে তার রক্ষক
সার অসার-সংসারে॥
সম ধর্ম্মাধর্ম্ম   সব কর্ম্মাকর্ম্ম
শত্রু মিত্র সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই   অপরূপ ঠাঁই
কেবল সুখের মূল॥
চৌদিকে দুস্তর   সুখের সাগর
কল্পতরু সারি সারি।
মণিবেদীপরে   চিন্তামণি ঘরে
বসি গৌরী ত্রিপুরারি॥
নন্দী দ্বারপাল   ভৈরব বেতাল
কার্ত্তিকেয় গণপতি।
ভূত প্রেত যক্ষ   ব্রহ্মদৈত্য রক্ষ
গণিতে কার শকতি?

—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

২৬

শিবের রুদ্ররূপ

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে ।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে ॥
লটাপট্ট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা ।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা ॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে ।
দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
ধক্ধ্বক্ ধক্ধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে ।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে ॥
চলে ভৈরব ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী ।
মহাকাল বেতাল তাল ত্রিশৃঙ্গী ॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোর বেশে ।
চলে শাঁখিনী প্রেতিনী মুক্তকেশে ॥
গিয়া দক্ষ-যজ্ঞে সবে যজ্ঞ নাশে ।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে ॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে ।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে ।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥

—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়

দ্বিতীয় প্রবাহ

২৭

স্বদেশী ভাষা

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা ;
বিনা স্বদেশীয় ভাষা
পূরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর ? ৪
ধারাজল বিনে কভু
ঘুচে কি তৃষা ?

—রামনিধি গুপ্ত

২৮

মনের অনল

নয়নের নীরে কি নিবে মনের অনল ?
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল।
তৃষায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারাজল বিনে তার সকলি বিফল ! ৪

—রামনিধি গুপ্ত

২৯

প্রতীক্ষা

তোমার আশাতে এ চারিজন—
মোর মন-প্রাণ-শ্রবণ-নয়ন।
আছে অভিভূত হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ—
দরশ পরশ শুনিতে সুভাষ
করিতেছে আরাধন॥ ৫
অন্যরূপ আঁখি না হেরে আর,
শ্রবণ প্রাণ তুমি জুড়াবার।
শয়নে স্বপনে মন ভাবে মনে—
কবে হইবে মিলন॥ ৯

—হরু ঠাকুর

৩০

ভিখারী পরিবর্ত্তন

কও দেখি, উমা, কেমন ছিলে মা,
ভিখারী হরের ঘরে?
জানি নিজে সে পাগল, কি আছে সম্বল,
ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা ক'রে। ৪

শবের সেদিন আর এখন নাই !
যাবে "পাগল, পাগল" ব'লে বিবাহের কালে
সকলে দিল ধিক্কার—
এখন সেই পাগলের সব অতুল বিভব, ৮
কুবের ভাণ্ডারী তার !
এখন শ্মশানে মশানে বেড়ায় না মেনে,
আনন্দ-কাননে জুড়াবার ঠাঁই !

—রাম বসু

৩১

শুক-সারী-সংবাদ

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
সাবী বলে, আমাব রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন।
শুক বলে, আমাব কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
সাবী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নৈলে পারবে কেন ?
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা।
সাবী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে' লেখা,
ঐ যে যায় গো দেখা।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
সারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে ব'লে,
চূড়া তাইতে হেলে।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ যশোদাজীবন।
সারী বলে, আমার রাধা জীবনের জীবন,
নৈলে শূন্য জীবন।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগৎ-চিন্তামণি।
সারী বলে, আমার রাধা প্রেমপ্রদায়িনী,
সে তোমার কৃষ্ণ জানে।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণেব বাঁশী কবে গান।
সারী বলে, সত্য বটে, বলে রাধাব নাম,
নৈলে মিছে সে গান।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
সাবী বলে, আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু,
নৈলে কে কার গুরু?
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ জগতের আলো।
সাবী বলে, আমার বাধাব রূপে জগৎ আলো,
নৈলে আঁধার কালো।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণেব শ্রীরাধিকা দাসী।
সাবী বলে, সত্য বটে! সাক্ষী আছে বাঁশী,
নৈলে হতো কাশীবাসী।
শুক বলে, আমাব কৃষ্ণ জগতের প্রাণ।
সারী বলে, আমার রাধা জীবন করে দান,
থাকে কি আপনি প্রাণ?

—গোবিন্দ অধিকারী

৩২

হৃদয়-বৃন্দাবন

হৃদয়-বৃন্দাবনে বাস
যদি কব কমলাপতি,
ওহে ভক্তপ্রিয়, আমার
ভক্তি হবে রাধা সতী।

মুক্তি-কামনা আমারি
হবে বৃন্দে গোপনারী,
দেহ হবে নন্দের পুরী,
স্নেহ হবে মা যশোমতী।

আমার ধর ধর জনার্দ্দন—
পাপভার-গোবর্দ্ধন,
কামাদি ছয় কংসচরে
ধ্বংস কর সম্প্রতি।

বাজায়ে কৃপাবাঁশরী
মন-ধেনুকে বশ করি'
তিষ্ঠ সদা হৃদি-গোষ্ঠে
পূরাও ইষ্ট এই মিনতি।

আমার প্রেমরূপ যমুনা-কূলে
আশা বংশীবট-মূলে
সদয়ভাবে স্ব-দাস ভেবে
সতত কর বসতি। ২
যদি বল রাখাল-প্রেমে
বন্দী আছি ব্রজধামে,
জ্ঞানহীন রাখাল তোমার
দাস হবে হে দাশরথি। ২৪

—দাশরথি রায়

৩৩

ভূষণে ভূষণ

যেমন পৃথিবীর ভূষণ রাজা, রাজার ভূষণ সভা।
সভার ভূষণ পণ্ডিত,—সভা করে শোভা॥
পণ্ডিতের ভূষণ ধর্ম্মজ্ঞানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিনী ৩
কোকিলের ভূষণ মধুর ধ্বনি, সতীর ভূষণ পতি।
যোগীর ভূষণ ভস্ম, মৃত্তিকার ভূষণ শস্য, রত্নের ভূষণ জ্যোতি। ৫
বৃক্ষের ভূষণ ফল, নদীর ভূষণ জল, জলের ভূষণ পদ্ম।
পদ্মের ভূষণ মধুকর, মধুকরের ভূষণ গুন্ গুন্ স্বর, উভয় প্রেমে বদ্ধ
শরীরের ভূষণ চক্ষু যাতে হয় জগৎ দৃষ্ট।
দাতার ভূষণ দান্ ক'রে বলে বাক্য মিষ্ট॥ ৯

—দাশরথি রায়

৩৪

দাশরথির প্রার্থনা

দুর্গে, ক'রো মা এ দীনের উপায়,
যেন পায়ে স্থান পায়।
আমার এ দেহ পঞ্চত্ব কালে
তব প্রিয় পঞ্চস্থলে
আমাব পঞ্চভূতে যেন মিশায়। ৫
শ্রীমন্দিবে অন্তর আকাশ যেন যায়;
এ মৃত্তিকা যায় যেন ত্বৎ প্রতিমায়;
মোর পবন যেন চামর ব্যজনে যায়,
হোমাগ্নিতে মমাগ্নি যেন মিশায়। ৯
আমার জল যেন যায় পাদ্য জলে
যেন ভবে যায় বিমলে—
দাশরথির জীবন মরণ দায়। ১২

—দাশরথি রায়

৩৫

শ্যামসুন্দর

কিবা দলিত-কজ্জল-কলিত-উজ্জ্বল,
সজল-জলদ-শ্যামল-সুন্দর,
যেন বকালী-সহিত ইন্দ্রধনু-যুত,
তড়িত-জড়িত নব জলধর! ৪
স্থূল মুক্তাহার দুলিতেছে গলে
মনে হয় যেন বকপাঁতি চলে;
চূড়ায় শিখণ্ড, ইন্দ্রের কোদণ্ড,
সৌদামিনী-কান্তি ধরে পীতাম্বর। ৮

—কৃষ্ণকমল গোস্বামী

৩৬

আকর্ষণ

ওগো দরদি ! আমার মন কেন
উদাসী হতে চায় !
এগো ডাক নাহি হাঁক নাহি গো—
আপনে আপনে চ'লে যায় !
এগো ধৈরজ না ধরে অন্তরে—
কেঁদে উঠে মন শিহরি' নয়ন ঝরে—
যেন নীরবে স্বরবে সদা
বলিতেছে 'আয় গো আয় !'
(আমার মন কেন উদাসী হতে চায় ?)
এগো ভাটী সোঁতে ভাটারি গড়ান ;
এগো সাগর যেমন সদা টানে নদীর পরাণ—
সে টান এতই সবল—মনের গরল
অমৃত হইয়ে যায় !
সে যে কেমন ক'রে দেয় গো মন্ত্রণা
এগো উড়ায়ে দেয় মনের পাখী ; মানা মানে না !
সে যে উড়ে যায় বিমানের পথে
শীতল বাতাস লাগে গায় !

—অজ্ঞাত বাউলের গান

৩৭

সাধন-বিঘ্ন

তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মস্‌জেদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চল্‌তে না পাই,—
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুর্‌শেদে॥ ৩
ডুবে যাতে অঙ্গ জুড়াই
ওরে তাতেই যদি জগৎ পুড়াই,
তবে অভেদ-সাধন মর্‌লো ভেদে॥ ৬
ওরে প্রেম-দুয়ারে নানান্‌ তালা—
পুরাণ কোরান তসবী মালা,
হায় গুরু, এই বিষম জ্বালা,
কেঁদে মদন মরে খেদে॥ ১০

—সেখ মদন বাউল

৩৮

মাতৃভূমি

জান না কি নর তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে?
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে? ৪
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ। ৮

প্রসূতি তোমার যেই, তাঁহার প্রসূতি এই,
বসুমতী মাতা সবাকার ॥
ক্ষিতির অদ্ভুত বলে, জীব সব চলে বলে,
দেবীর শকতি বুঝা ভার ॥
ধরিয়া ধরার পদ, পেয়ে পদ নদী, নদ,
জীবনে জীবন রক্ষা করে।
মোহিনী মহীর মোহে, বহ্নি বারি বন্ধু দোঁহে,
প্রেমভাবে চরে চরাচরে ॥
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রমাণ কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষতঃ, নিজ দেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার স্নেহমদে ॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥
স্বদেশের প্রেম যত, সে-ই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব-তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্তপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার ॥
থাকি স্বদেশের হিতে, চল সত্য ধর্ম্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পুরাও তাঁহার আশা,
দেশে কর বিদ্যা বিতরণ ॥

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

৩৭

সুপ্তোত্থিত

ভারতভূমির মাঝে লোক আছে যত,
অলস অবশ হ'য়ে র'বে আর কত ?
এখনো ভাঙ্গেনি ঘুম, করিছ শয়ন ?
এখনো রয়েছ সবে মুদিয়া নয়ন ?

ভবের কি ভাব তাহা কর অনুভব।
একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখ সব ॥
কি হইবে মিছা আর নিদ্রায় রহিলে ?
এখনি রতন পাবে যতন করিলে ॥

কি করিলে ভাল হয় কর বিবেচনা।
স্বদেশের হিতাহিত কর আলোচনা ॥
মনে মনে স্থির ভাবে কর প্রণিধান।
যাহাতে দেশের হয় কুশল বিধান ॥

কুরীতি কণ্টকবন করিয়া ছেদন।
সুরীতির সুখতরু করহ রোপণ ॥
অনুরত হ'য়ে দেও অনুরাগ-জল।
শাখীর শাখায় হবে সুশোভিত দল ॥

পরস্পরে এক্ হ'য়ে এক কথা বল।
একমতে একরথে একপথে চল ॥
সকলেই একভাবে এক হই যদি।
এখনি শুকায়ে দিব ভ্রমময়ী নদী ॥

আর না চালাতে হবে অধর্ম্মের পোত।
একেবাবে হবে রোধ অজ্ঞানেব স্রোত ॥

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

৪০

পৌষ পার্ব্বণ

সুখের শিশির কাল সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা ॥
ধনুর তনুব শেষ মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহা সুখভোগ ॥

মকর-সংক্রান্তি স্নানে জন্মে মহাফল।
মকর মিতিন্ সই চল্ চল্ চল্ ॥
সারানিশি জাগিয়াছি দেখ সব বাসি।
গঙ্গাজলে গঙ্গাজল অঙ্গ ধুয়ে আসি ॥

অতি ভোরে ফুল নিয়ে গিয়েছেন মাসী।
একা আমি আসিয়াছি সঙ্গে লয়ে দাসী॥
এসেছি বাপের কাছে ছেলে মেয়ে ফেলে।
বাঁধাবাড়া হবে সব আমি নেয়ে এলে॥

ঘোর জাঁক বাজে শাঁক যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে করি ধামা ধামা॥
বাউনি আউনি ঝড়া পোড়া আখ্যা আব।
মেয়েদের নব শাস্ত্র অশেষ-প্রকার॥

খোলায় পিটুলি দেন হয়ে অতি শুচি।
ছ্যাক্ ছ্যাক্ শব্দ হয় ঢাকা দেন মুচি॥
উনুনে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্ত্তার পানে কাঁদুনি কাঁদিয়া॥

"চেয়ে দেখ সংসারেতে কতগুলি ছেলে।
বল দেখি কি হইবে নয় বেক চেলে?
ক্ষুদকুঁড়া গুঁড়া করি কুটিলাম ঢেঁকি।
কেমনে চালাই সব তুমি হলে ঢেঁকি॥

আড় কড়ি পাড় দিতে সিকি গেল গড়ে।
লেখা করি নাহি হয় আধ পোয়া গড়ে॥
ছাঁই ক'রে রাখিলাম অর্দ্ধভাগ কেটে।
হাতে হাতে গেল তিল তিল তিল বেটে॥

ঝোলাগুড় তোলা ছিল শিকের উপরে।
তোলা তোলা খেতে দিয়ে ফুরাইল ঘরে ॥
পোয়া কাঁচ্চা কি করিবে নহে এক মণ।
বাড়ীর লোকের তাহে নহে এক মন ॥

একমনে খায় যদি আধ মণে সারি।
একমনে না খাইলে দশ মণে হারি ॥
ভাঙ্গামনে পূরোমণ মন যদি খুলে।
পূরোমণে কি হইবে ভাঙ্গা-মন হ'লে ॥

তুমি ভাব ঘরে আছে কত মণ তোলা।
জান না কি ঘরে আছে কত মন তোলা ?
কারে বা কহিব আর বোঝা হ'ল দায়।
খুলে দিলে মন কি হে তুলে রাখা যায় ?

বিষম দুরন্ত ওটা মেজোবৌর ব্যাটা।
কোনমতে শুনেনাক ছোড়া বড় ঠ্যাটা ॥
না দিলে ধমক দেয় দুই চক্ষু রেঙ্গে।
ঘটি বাটি হাঁড়ি কুড়ি সব ফ্যালে ভেঙ্গে ॥

পুলি সব উঠে গেল কিছু নাই ছাঁই।
নারিকেল তেল গুড় ফের সব চাই ॥
অদৃষ্টের দোষ সব মিছে দেই গালি।
চর্ব্বণে উঠিয়া গেল পার্ব্বণের চালি ॥

আমি লই মোটা চাল সরু চেলে চেলে।
বুঝিতে না পারি তুমি চল কোন্ চেলে॥
ও বাড়ীর মেয়েদের বলিয়াছি খেতে।
নূতন জামাই আজ আসিবেন রেতে॥

তোমার কি ঘর পানে কিছু নাই টান।
হাবাতের হাতে যায় অভাগীর প্রাণ॥
কি বলিব বাপ মায় কেন দিলে বিয়ে।
একদিন সুখ নাই ঘরকন্না নিয়ে॥

কোন দিন না করিলে সংসারের ক্রিয়ে।
দিবানিশি ফেরো শুধু গোঁপে তেল দিয়ে॥
সবে মাত্র দুইগাছা খাড়ু ছিল হাতে।
তাহাও দিয়াছি বাঁধা মেয়েটির ভাতে॥

সুদে সুদে বেড়ে গেল কে করে খালাস?
বাঁচিবার সাধ নাই মলেই খালাস॥
রাত্রিদিন খেটে মরি এক সন্ধ্যা খেয়ে।
এত জ্বালা সহ্য করি আমি যাই মেয়ে॥"

মেয়েদের নাহি আর তিন রাত্রি ঘুম।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রন্ধনের ধূম॥
সাবকাশ নাই মাত্র এলোচুল বাঁধে।
ডাল ঝোল মাছ ভাত রাশি রাশি রাঁধে॥

কত থাকে তার কাঁচা কত যায় পুড়ে।
সাধে বাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে॥
আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটেপুলি অশেষ প্রকার॥ ৭২

বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার ধন্য তোর খেলা॥
ধন্যধন্য পল্লীগ্রাম ধন্য সব লোক।
কাহনের হিসাবেতে আহারের ঝোঁক॥ ৭৬

প্রবাসী পুরুষ যত পোষড়ার রবে।
ছুটী নিয়া ছুটাছুটি বাড়ী আসে সবে॥
সহরের কেনা দ্রব্যে বেড়ে যায় জাঁক।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ মেয়েদের ডাক॥ ৮০

কর্ত্তাদের গালগল্প গুড়ুক টানিয়া।
কাঁটালের গুঁড়ি প্রায় ভুঁড়ি এলাইয়া॥
দুই পার্শ্বে পরিজন মধ্যে বুড়া ব'সে।
চিটে গুড় ছিটে দিয়ে পিটে খান ক'সে॥ ৮৪

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

তৃতীয় প্রবাহ

———:———

৪১

সমুদ্রের প্রতি রাবণ

"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমাব ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশবথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড তবে
পব তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশবীর রাজপদ কাব সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি! বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,

দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৪২

বঙ্গভূমির প্রতি

"রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,—
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে
জীবতারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,—
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবননদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি মা, ডরি শমনে—
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃতহ্রদে !

সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন। ১৬
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে! ১৯
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে! ২২
ফুটি যেন স্মৃতিজলে,
মানসে, মা যথা ফলে
মধুময় তামরস—কি বসন্ত, কি শরদে।” ২৫

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৪৩

বনবাসে সীতা

ফিরাইলা বনপথে অতি ক্ষুণ্ণ মনে
সুরথী লক্ষ্মণ রথ, তিতি চক্ষুঃ-জলে;—
উজলিল বন-রাজি কনক কিরণে
স্যন্দন, দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে! ৪

নদী-পারে একাকিনী সে বিজন বনে
দাঁড়ায়ে, কহিলা সতী শোকেব বিহ্বলে ;—
"ত্যজিলা কি রঘু-রাজ, আজি এই ছলে
চির-জন্মে জানকীরে ? হে নাথ ! কেমনে,
কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে ?
কে, কহ, বারিদ-রূপে, স্নেহ-বারি-দানে,
(দাবানল-রূপে যবে দুখানল দহে)
জুড়াবে, হে রঘুচূড়া, এ পোড়া পরাণে ?"
নীববিলা ধীবে সাধ্বী ; ধীরে যথা বহে
বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য মূর্ত্তি, নির্ম্মিত পাষাণে।

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৪২

নূতন বৎসর

ভূত-রূপ সিন্ধুজলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসব, কালেব ঢেউ, ঢেউব গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে,
কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
হায় বে, কব তা কাবে, কব তা কেমনে !
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল !

বাড়িতে লাগিল বেলা ; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে ;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা রূপ মণি ;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা,—তপনের দূতী, অরুণ- রমণী !

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৪৫

নীলধ্বজের প্রতি জনা

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি ;
হেষে অশ্ব ; গর্জ্জের গজ ; উড়িছে আকাশে
রাজকেতু ; মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য ;—কিন্তু কোন্ হেতু ?
সাজিছ কি নররাজ, যুঝিতে সদলে
প্রবীরপুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনীর লোহে ?
এই তো সাজে তোমারে,ক্ষত্রমণি তুমি
মহাবাহু। যাও বেগে, গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে,

টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি বণস্থলে,
খণ্ড মুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড শিরে।
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে ;
নাশ মহেষ্বাস, তারে ;—ভুলিব এ জ্বালা,—
এ বিষম জ্বালা দেব, ভুলিব সত্বরে।

জন্মে মৃত্যু,—বিধাতার এ বিধি জগতে।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখ সমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপে প্রভু ?   পাল মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম—ক্ষত্র ধর্ম্ম সাধ ভুজবলে।

হায় পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণা ধ্বনি!   তব সিংহাসনে
ব'সেছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে।
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে!—

কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায় কব কারে ?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী ?
যে দারুণ বিধি রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি

জ্ঞান তব ? তা না হ'লে, কহ মোরে, কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি ? কেমনে তুমি হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত ? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি নৃমণি ?

কোথা ধনুঃ, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম, অসি ?
না ভেদি রিপুর বক্ষঃ তীক্ষ্নতম শরে
রণক্ষেত্রে মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে ? কি কহিবে কহ,—
যবে দেশ দেশান্তরে জনরব লবে

এ কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত ?
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্‌ আজি
বারিধারা ? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে ?
কেন বা জ্বলিস্‌ মনঃ ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে ? পাণ্ডবের শরে

খণ্ড শিরোমণি তোর ; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে মর্‌, অরে মণিহারা ফণি !—
যাও চলি মহাবল, যাও কুরুপুরে
নবমিত্র পার্থ সহ ! মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশ্যে !

ক্ষত্রকুলবালা আমি, ক্ষত্র-কুল-বধূ,
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি ?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে ;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্তনগরে
লভি অন্তে। যাচি চির বিদায় ও পদে।

ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা ?" বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা ?" বলি।

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৪৬

মহাকাল

করাল কালের কাণ্ড,
যেন-সদা ক্রীড়াভাণ্ড,
এ ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত তাহার।
কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র,
কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
তার কাছে সব একাকার।
সিংহাসন অধিষ্ঠাতা,
শিরোপরে হেমছাতা,
ধাতা প্রায় প্রতাপ যাঁহার ;

তাঁহার যেরূপ গতি,
অন্নদাস ছন্নমতি,
মরণেতে তারো সে প্রকার।

কালের নাহিক বোধ,
নাহি মানে উপবোধ,
বড় সুখে, বড় দর্পে বাদী।

সুখপুষ্প যথা ফুটে,
অতি বেগে তথা ছুটে,
কট মট বিকট নিনাদি।

হাঁরেরে নিষাদ কাল।
একি তোর কর্ম্মজাল,
শোভা না রাখিবি ভববনে।

যথা কিছু দেখ ভাল,
না ঠাহর ক্ষণকাল,
জালে বদ্ধ কর সেইক্ষণে।

ওরে ও কৃষককাল,
কি কর্ষিছে তব হাল?
জঞ্জাল জঙ্গল বৃদ্ধি পায়।

উত্তম বাছের বাছ,
ফলপ্রদ যেই গাছ,
অনায়াসে উপাড়িয়ে যায়।

সুকৃষক যেই হয়,
পরিপক্ক শস্যচয়,
সে করে ছেদন সুসময়। ৩৩
তুই কাল নিদারুণ,
নাস্তি জ্ঞান গুণাগুণ,
কাটিছ তরুণ শস্যচয়। ৩৬
ধিক্ কাল কালামুখ,
ভারতের কোন সুখ,
না রাখিলি ভুবন ভিতর। ৩৯
কোথা সব ধনুর্দ্ধর,
কোথা সব বীরবর,
সব খেয়ে ভরিলি উদর। ৪২

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৭

স্বদেশ-গীতি

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?—
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়? ৪

কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায় ;
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়।
একথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়,
নির্বাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয় ?
অই শুন, অই শুন, ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ,—
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ।
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতানার হে,
রাজপুতানার
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ঝরে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার।
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার,
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার।

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৮

যমুনালহরী

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা,
তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও।
কত কত সুন্দর, নগরী তীরে,
রাজিছে তটযুগ ভূষি' ও।
পড়ি' জল নীলে, ধবল সৌধ-ছবি,
অনুকারিছে নভ-অঙ্গন ও।
যুগ যুগ বাহি, প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল-বুদ্বুদ সহ কত রাজা
পরকাশিল, লয় পাইল ও।
কল কল ভাষে, বহিয়ে, কাহিনী
কহিছ সবে কি পুরাতন ও?
স্মরণে আসি', মরম পরশে কথা,
ভূত সে ভারত-গাথা ও।
তব জলকল্লোল সহ কত সেনা,
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি শব-নীরব, রে যমুনে সব,
গত যত বৈভব, কালে ও।
শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু
পাণ্ডব-কুরু-কুলশোণিতে ও।

কাঁপিল দেশ, তুরগ-গজভারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।
তব জল-তীরে, পৌরব যাদব,*
পাতিল রাজ-সিংহাসন ও। ২৭
শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি',
ভারত স্বাধীন যে দিন ও।
দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ-পতাকা,
উড়িতে দেশ বিদেশে ও। ২৮
তিব্বত, চীনে, ব্রহ্ম, তাতারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও?
এ জল-ধারে ধারে বহিল কভু,
প্রেম-বিরহ-আঁখিনীর ও— ৩২
নাচিল গাহিল কত সুখ সম্পদে
এ তব সৈকত-পুলিনে ও।
এ তনু-মুকুরে আসি' পূর্ণশশী
নিরখিত মুখ যবে শরদে ও, ৩৬
ভাসিত দশদিশি উৎসব-রঙ্গে
প্লাবিত চিত সুখ-উৎসে ও।
সে তুমি, সে শশী, ধীর অনিল সেই,
তবু সব মগন বিষাদে ও, ৪০
নাহিক সে সব প্রমোদ-উৎসব—
গ্রাসিল সকলে কালে ও।

—গোবিন্দচন্দ্র রায়

৪৯

ব্যথিত-বেদনা

চিরসুখীজন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?
যতদিন ভবে না হবে, না হবে, তোমার অবস্থা আমার সম,
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না শুনিবে, বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম ।

—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

৫০

উষা

অয়ি সুখময়ি উষে ! কে তোমারে নিরমিল,
বালার্ক-সিন্দুর-ফোঁটা, কে তোমার ভালে দিল ?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখাল এত হাসি, কেবা সে, যে হাসাইল ?
জগৎ মোহিত করি', গাইছ বিপিনে কারে
কে বল সে, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যাঁরে ?
কমল-নয়ন খুলে, কার পানে চেয়ে আছ,
কার তরে ঝরিতেছে, প্রেম-অশ্রু নিরমল ?
এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন,
তব পরশমাত্র পাইল নবজীবন ,
বারেক তুমি আমারে দেখাও দেখি তাঁরে,
হেন সঞ্জীবনী শক্তি, যে তোমারে প্রদানিল ॥

—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

৩১

হিমাচল

অসীম নীরদ নয় ;   ও-ই গিরি হিমালয় !
উথুলে উঠিছে যেন অনন্ত জলধি ;
ব্যেপে দিগ্ দিগন্তর,   তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি !
বিশ্ব যেন ফেলে' পাছে   কি এক দাঁড়ায়ে আছে,
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার !
কি এক মহান্ মূর্ত্তি,   কি এক মহান্ স্ফূর্ত্তি,
মহান্ উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার !
পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,   তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম,
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে।
সমুখে সাগরাম্বরা   ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে !
ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে,   বুকে খেলা করে ধেয়ে,
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে।
জ্বলন্ত-অনল ছবি   ধবক্-ধবক জ্বলে রবি,
কিরণ-জ্বলন-জ্বালা মালা শোভে গলে !
ওই কিবা ধবধব   তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সব
ঊর্দ্ধমুখে ধেয়ে গেছে ফুঁড়িয়া অম্বর !
দাঁড়াইয়া পাদ-দেশে   ললিত হরিত বেশে
নধর নিকুঞ্জরাজি সাজে থরে থর।

ওই গণ্ডশৈল-শিরে গুল্মরাজি চিরে চিরে
বিকশে গৈরিক-ঘটা ছটা রক্তময় !
তৃণ-তরু-লতা-জাল অপরূপ লালে লাল ;
মেঘের আড়ালে যেন অরুণ উদয় !

কিবে ওই মনোহারী দেবদারু সারি সারি,
দেদার চলিয়া গেছে—কাতারে কাতার !
দূর দূর আলবালে কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতার মন্দির গাঁথা মাথায় সবার !

তলে তৃণ লতা পাতা সবুজ বিছানা পাতা,
ছোট ছোট কুঞ্জবন হেথায় হোথায়।
কেমন পেখম ধরি' কেকারব করি' করি'
ময়ূর ময়ূরী সব নাচিয়া বেড়ায় !

ফেনিল সলিল-রাশি বেগভরে পড়ে আসি',
চন্দ্রালোকে ভেঙ্গে যেন পড়ে পৃথিবীতে !
সুধাংশু-প্রবাহ-পারা— শত শত ধায় ধারা,
ঠিকরে' অসংখ্য তারা ছোটে চারিভিতে !

শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঠেকে ঠেকে, লম্ফে লম্ফে ঝেঁকে ঝেঁকে,
জেলের জালের মতো হ'য়ে ছত্রাকার,
ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ; ফেনার আরশি ওড়ে—
উড়িছে মরাল যেন হাজার হাজার !

নেমে নেমে ধরাগুলি,   করি' করি' কোলাকুলি,
এক-বেণী হ'য়ে হ'য়ে নদী ব'য়ে যায়,
ঝরঝর কলকল   ঘোর রবে ভাঙ্গে জল,
পশুপক্ষী কোলাহল করিয়া বেড়ায় !
কিবা ভৃগু-পাদ-মূলে   উথুলে উথুলে দুলে'
ঢ'লে ঢ'লে চলেছেন দেবী সুরধুনী ;
যোগীর ধ্যান,   ভোলা-মহেশের প্রাণ,
ভারত-সুরভি-গাভী পতিত-পাবনী।
পুণ্যতোয়া গিরিবালা !   জুড়াও প্রাণের জ্বালা,
জুড়ায় ত্রিতাপজ্বালা মা তোমার জলে !

—বিহারীলাল চক্রবর্তী

৩২

নিদ্রামগ্ন জগৎ

দ্বিতীয় প্রহর নিশি,   কি প্রশান্ত দশ দিশি !
জ্যোৎস্নায় ঘুমায় তরুলতা ;
বাতাস হয়েছে স্তব্ধ,   নাই কোন সাড়া শব্দ,
পাপিয়ার মুখে নাই কথা।
সাদা সাদা ডোরা ডোরা দীর্ঘ মেঘগুলি
নীরবে ঘুমায়ে আছে খেলা-দেলা ভুলি
একাকী জাগিয়া চাঁদ তাহাদের মাঝে—
বিশ্বের আনন্দ যেন একত্র বিরাজে !

দূরে দূরে নীল জলে   দু'একটী তারা জ্বলে,
আমার মুখের পানে দীপ্ দীপ্ চায়,
ওদের মনের কথা বুঝা নাহি যায় !
একা বসি' নির্জ্জন গগনে
বল শশী, কি ভাবিছ মনে ?
একটু বাতাস নাই   তবু যেন প্রাণ পাই
তোমার এ অমৃত কিরণে !
ফুল বনে ফুল ফুটে আছে,
কেহ না সঞ্চরে কাছে কাছে,
তেমন আমোদ-ভরে   কে আর আদর করে—
আজি সমীরণ কোথা গেছে !
নীরব প্রকৃতি সমুদয়,
নীরবে প্রাণের কথা কয়,
সমীর সুধীর স্বরে   সেই কথা গান ক'রে,
আহা, আজি কেন নাহি বয় !
মানবেরা ঘুমায়ে এখন,
মোহ-মন্ত্রে হয়ে অচেতন,
নিসর্গের ছেলেমেয়ে   কেন গো রয়েছ চেয়ে—
তোমরা কি সাধের স্বপন ?
সবচেয়ে, সুধাকর,   তব মুখ মনোহর,
বিহ্বল হইয়া যাই হেরিলে তোমায় !

ভূত ভাবী বর্ত্তমানে কত কথা জাগে প্রাণে—
জানকী অশোকবনে দেখেছে তোমায় !
কেকয়ী-বিষাক্ত-শর-
জরজর-মরমর-
থরথর-কলেবর
পাগলের প্রায়—
কি চক্ষে হে, দশরথ দেখিল তোমায় ?

তুমি-ই বলিতে পার, তুমি ই বলিতে পার,
ভাবিয়া বিহ্বল মন, বুঝা নাহি যায় !
ওই রে জীবনদীপ নিবু-নিবু-প্রায়—
ওই রে অন্তিম আশা আঁধারে মিশায়—
মনের সকল সাধ ফুরায় ফুরায়—
কোথা রাম রাজা হবে, বনে কেন যায় !
জন্মিতে দেখেছ তুমি ব্যাস-বাল্মীকিরে,
কিরণ দিয়েছ সেই পর্ণের কুটীরে।

তপোবনে ছেলে দুটী কচিমুখে হাসি ফুটি',
জননীর কোলে বসি, দেখিত তোমায়,
কি যে সে কহিত বাণী জানে তাহা ফুলরাণী
জাগে মহা প্রতিধ্বনি অমর গাথায় ;
করি' সে অমৃত পান পৃথিবী পেয়েছে প্রাণ,
ভারত-পাতাল আজো অমরার প্রায়।

কবিতার জন্ম হয় তোমার কিরণে,
ফুটে ওঠে বসন্তের ফুল-বনে,
যৌবন-তরঙ্গ-রঙ্গে   গড়ায় সাগর-সঙ্গে,
অন্তিমে আনন্দে মগ্ন নন্দন-কাননে !
কবির প্রাণেতে পশি'   আচম্বিতে কে রূপসী
বীণা-করে খেলা করে হসিত বয়ানে,
অলস অপাঙ্গে চায়,   কবি নিজে মোহ যায়,
জগৎ জাগিয়া উঠে একমাত্র গানে !
তুমি শশী সকলের   মহামন্ত্র হৃদয়ের,
নয়নের পারিজাত-কুসুম অমর !
রূপ-রসে ঢলঢল   চারিদিকে অবিরল
উছলে উছলে চলে সুধাংশু-সাগর !
করি' ও-অমৃত পান   প্রাণে হয় বলাধান,
শুষ্ক তরু মুঞ্জরে, সঞ্চরে সমীরণ,
ফুল ফোটে থরে থরে,   লতা সব নৃত্য করে,
উল্লাসে উন্মত্ত-প্রায় মানুষের মন
চক্রবাক-চক্রবাকী   আনন্দে বিহ্বল-আঁখি,
হরিণী হরষ-ভরে দেখিছে তোমায় ;
তোমারি অমৃত-ভুখে   ছুটিয়াছে ঊর্দ্ধমুখে
না জানি কি পাখী ওই শূন্যে গান গায় !
জাগিল সকল তারা   প্রেমানন্দে মাতোয়ারা
মেঘগুলি ঢলি ঢুলি কোথায় চলিল !

লুকায়ে চপলা মেয়ে থেকে থেকে দেখে চেয়ে
কি যেন মনের কথা মনেই রহিল।
যোগীর প্রশান্ত মন, শান্তিময় ত্রিভুবন,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক বিচিত্র স্বপন;
তোমার সুধাংশু, শশী, তাঁহার প্রাণেতে পশি'
করেছে কি অপরূপ রূপের সৃজন!
আনন্দ—আনন্দ তাঁর হৃদয়ে ধরেনা আর,
অমূর্ত্ত আনন্দময় মূর্ত্তি মনোহর,
আলিঙ্গন প্রাণে প্রাণে, কি আজ উদয় প্রাণে!
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এক আনন্দ-সাগর!

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

৫৩

কামনা

কভু ভাবি তোজে এই দেশ,
যাই কোন এহেন প্রদেশ,
যথায় নগর গ্রাম
নহে মানুষের ধাম,
প'ড়ে আছে ভগ্ন-অবশেষ।

গর্ব্ব-ভরা অট্টালিকা যায়,
এবে সব গড়াগড়ি যায়;
বৃক্ষলতা অগণন
ঘের কোরে আছে বন,
উপরে বিষাদ বায়ু বায়।

প্রবেশিতে যাহার ভিতরে,
ক্ষীণ প্রাণী নরে ত্রাসে মরে ;
যথায় শ্বাপদ দল
করে ঘোর কোলাহল,
ঝিল্লী সব ঝিঁ ঝিঁ রব করে।

তথা তার মাঝে বাস করি,
ঘুমাইব দিবা বিভাবরী ;
আর কারে করি ভয়,
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়,
মানুষ-জন্তুকে যত ডরি।

কভু ভাবি কোন ঝরণার,
উপলে বন্ধুর যার ধার ;
প্রচণ্ড প্রপাত-ধ্বনি
বায়ু বেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দ্দিকে হতেছে বিস্তার ;—

গিয়ে তার তীরতরু তলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,
ডুবাইয়ে এ শরীর,
শব সম রব স্থির
কান দিয়ে জল-কলকলে।

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নাম ধাম সকলি লুকাই ;
চাষীদের মাঝে রয়ে,
চাষীদের মত হয়ে,
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।

বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী,
শাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি,
সরল চাষার সনে,
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে শর্ব্বরী।

বরষার যে ঘোর নিশায়,
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায় ;
ভীষণ বজ্রের নাদ,
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায়,—

সে নিশায় আমি ক্ষেত্র-তীরে,
নড়্‌বোড়ে পাতার কুটীরে,
স্বচ্ছন্দে রাজার মত
ভূমে আছে নিদ্রাগত
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

৩৪

মাতৃস্তুতি

সুকোমল অঙ্কে নিয়া
অঙ্গে কর বুলাইয়া,
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি-পিযূষ-ধারায়,
মমতায় বিমোহিয়া,
স্নেহ বাক্যে ভুলাইয়া,
হে জননি, কর পুনঃ বালক আমায়! ৬

তব অঙ্ক পরিহরি,
সংসারে প্রবেশ করি,
সদা মত্ত থেকে মা গো বিষয়ের রণে!
তুমি গড়েছিলে যাহা,
আর আমি নাই তাহা
তব প্রেম-স্বর্গ-কথা কিছু নাই মনে!—
কেমনে বর্ণিব তায় স্মৃতির বিহনে! ১৩

ধন, মান, খ্যাতি, লোভ!
দিয়াছ বিস্তর ক্ষোভ!
আর কেন? পাও গিয়া চিনে না যে জন!
ছাড় আশা মিথ্যাচার!
দূর হ' রে ব্যভিচার!—
(দেবরূপে ছদ্মবেশী দানব ভীষণ!) ১৯

রে স্বার্থ-পরতা খল !
যাও নিয়ে নিজ দল,—
কাপট্য, কাঠিন্য, চাটু, কটু, কুবচন !
দূর হ' সংসার জ্ঞান !
করি কুমন্ত্রণা দান,
হরিয়াছ সব মম শৈশব-ভূষণ !—
সারল্য, সন্তোষ, প্রীতি, প্রত্যয়ের মন ! ২৬
নিজ অঙ্গ অংশ দিয়া,
এই তনু নিরমিয়া,
চিত হ'তে দিয়া চিত দীপে দীপপ্রায়,
আমায় সৃজেন যিনি,
ধাতার স্বরূপ তিনি ;—
জীব-দেহ ব্রহ্মাণ্ড সমান তুলনায় !— ৩২
পরদেশ এ ধরায়,
অসম্বল অসহায়,
আসি আত্মা, পেয়ে যাঁর আতিথ্য কৃপার,
পথ-ক্লান্তি পাসরিয়া,
নব-সঙ্গি-সঙ্গ নিয়া
রঙ্গরসে পাসরে আলয় আপনার ;
মহতী মহিমা, বাক্যে কে বর্ণিবে তাঁর ! ৩৯

—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

৩৫

শিশুর হাসি

কি মধু-মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে !
স্বর্গেতে কি আছে ফুল
মর্ত্তে যার নাহি তুল,
তারি মধু দিয়ে কি হে, করিলে সৃজন ?
সৃজিলে কি নিজ সুখে ?
কিংবা, বিধি, নরদুঃখে
মনে ক'রে, ও হাসিটি করেছ অমন ?
জানি না, তুমিই কি না আপনি ভুলিলে
সৃজনের কালে, বিধি ?
গড়েছ ত এত নিধি—
উহার মতন বল কি আর গড়িলে ?
কারে গড়েছিলে আগে,
কারে বেশি অনুরাগে
সৃজন করিলে বিধি, সৃজিলে যখন ?
ফুলের লাবণ্য বাস,
অথবা শিশুর হাস,
কারে বিধি আগে ধ্যানে করিলে ধারণ ?
দেখিয়েছিলে কি উটি সৃজিলে যখন
অমৃত-পিপাসু দেবে ?

কি বলিল তারা সবে,
দেখিল যখন ওই হাসিটি মোহন ?
কিংবা চেয়েছিল তারা, তুমিই না দিলে ;
দিয়াছ এতই, হায়,
চিরসুখী দেবতায়,
দুঃখী মানবের তরে ওটুকু রাখিলে ?
কি মধু-মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন !

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৬

জীবন-সঙ্গীত

ব'লো না কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার
ব'লে জীব ক'রো না ক্রন্দন।
মানব-জনম সার এমন পাবে না আর,
বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন।
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
ওহে জীব, কর আকিঞ্চন।

ক'রো না সুখের আশ,   প'রো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয় ;
সংসারে সংসারী সাজ,   কর নিত্য নিজ কাজ
ভবের উন্নতি যাতে হয়। ১২
দিন যায়, ক্ষণ যায়,   সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির ;
সহায় সম্পদ্ বল,   সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ুঃ যেন শৈবালের নীর। ১৬
সংসার-সমরাঙ্গনে   যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব ;
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান্,   যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্ল্লভ। ২০
মনোহর মূর্ত্তি হেরে   ওহে জীব অন্ধকারে
ভবিষ্যতে ক'রো না নির্ভর ;
অতীত সুখের দিনে   পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা ক'রে হয়ো না কাতর। ২৪
সাধিতে আপন ব্রত   স্বীয় কার্য্যে হও রত,
এক মনে ডাক ভগবান্ ;
সঙ্কল্প সাধন হবে,   ধরাতলে কীর্ত্তি রবে,
সময়ের সার বর্ত্তমান। ২৮
মহাজ্ঞানী মহাজন   যে পথে ক'রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয় ;

সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা ধ'রে
আমরাও হব বরণীয়।
সময়-সাগর-তীরে "পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
আমরাও হব হে অমর ;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে অন্য কোন জন পরে
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
ক'রো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন
সংসার-সমরাঙ্গন-মাঝে ;
সঙ্কল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৭

যমুনাতটে

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল,
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুল-মধু বয়,
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণী জল।
কুসুম, পল্লব, লতা নিশার তুষারে

শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকির পাঁতি শোভে তরুশাখা'পরে
নিরিবিলি ঝিঁ ঝিঁ ডাকে জগত ঘুমায় ;—
হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি,
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভাসি যায়।

কে আছে এ ভূমণ্ডলে, যখন পরাণ
জীবন পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে,
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথ জ্যোতিঃ বিমল আকাশে,
প্রশস্ত নদীর তট, পর্ব্বত উপরি,
কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে ?
কি সুখ যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি বনে গেলে,
সেই জানে, প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে।

ভাসায়ে অকূল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হু হু করি দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে,
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।

না জানি মানব-মন হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তায় মজে বিজন ভূমিতে।

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি!
নতুবা যামিনী দিবা-প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে
শমন করিয়া চুরি লয়েছে যাহায়?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্বলে',
প্রাণের দোসর ভাই বন্ধুর ব্যথায়?
কেন বা উৎসবে মাতি, থাকি কভু দিবারাতি,
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায়?

বসিয়া যমুনা-তটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না।
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি' হৃদয় পূরিল,
কত ভাঙ্গি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি', কত কাঁদি', প্রাণ জুড়াইল।
রজনীতে কি আহ্লাদ কি মধুর রসাস্বাদ
বৃন্তভাঙ্গা মন যার সেই সে বুঝিল।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৮

লজ্জাবতী লতা

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না উটি লজ্জাবতী লতা।
একান্ত সঙ্কোচ ক'রে   এক ধারে আছে স'রে
ছুঁয়ো না উহার দেহ, রাখ মোর কথা,
তরুলতা যত আর,   চেয়ে দেখ চারি ধার,
ঘেরে আছে অহঙ্কারে—উটি আছে কোথা ?
আহা, ওইখানে থাক, দিও নাক ব্যথা !
ছুঁইলে নখের কোণে,   বিষম বাজিবে প্রাণে,
যেও না উহার কাছে শুন মোর কথা !
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না উটি লজ্জাবতী লতা।

লজ্জাবতী লতা উটি অতি মনোহর।
যদিও সুন্দর শোভা,   নহে তত মনোলোভা,
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর !
যায় না কাহারও পাশে,   মান-মর্য্যাদার আশে,
থাকে কাঙ্গালীর বেশে একা নিরন্তর—
লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর !
নিশ্বাস লাগিয়ে গায়,   অমনি শুকায়ে যায়,
না জানি কতই ওর কোমল অন্তর !
এ হেন লতার হায়, কে জানে আদর ?

হায় এই ভূমণ্ডলে কত শত জন,
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে, অবনীমণ্ডল লুটে
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্ত্তন।
কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিত প্রাণ,
রমণী পুরুষগণে কে করে যতন?
স্বভাব মৃদুল ধীর, প্রকৃতিটি সুগম্ভীর,
বিরলে মধুরভাষী মানসরঞ্জন,
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ?
সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে,
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন।
ছুঁয়ো না উহার দেহ, করি নিবারণ,
লজ্জাবতী লতা উটি মানস-রঞ্জন।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৯

জন্মভূমি

কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষা হারে
দ্যুতিমান্ মধ্যমণি যেমন সুন্দর,
সেইরূপ সমুদয় মেদিনী-মাঝারে
আছে দিব্যস্থান এক অতি মনোহর। ৪

প্রকৃতির অতি প্রিয় সেই রম্য স্থল,
নয়নের অভিরাম সেখানে যেমন
নদ, নদী, বনভূমি, প্রান্তর শ্যামল,
ভুবন-ভিতরে আর নাহিক তেমন !

বিতরে উজ্জ্বলতর কর তথা বিধু,
সূর্য্যের সুবর্ণ-করে দীপ্ত দিনমান,
মেদুর সমীর সদা বহে মৃদু মৃদু,
ভূতলে অতুল সেই রমণীয় স্থান !

বিশাল-বারিধি-বক্ষে বহিত্র বাহিয়া
কর্ণধার নির্ভীক অনেক দেশে যায়,
সুস্থচিত্তে নহে কিন্তু রহে কোথা গিয়া,
নিরখিতে সেই ভূমি চিত সদা চায় !

অন্য ভূপ, লোলুপ সে দেশ-অধিকারে,
বিপুল বিক্রমে যদি করে আক্রমণ,
হেন কাপুরুষ নাহি, অবাধে তাহারে
প্রস্তুত সে প্রিয় ভূমি করিতে অর্পণ !

বদ্ধপরিকর সবে যুদ্ধ-ভূমে ধায়,
গৃহ-সুখ অভিলাষ দিয়া বিসর্জ্জন,
জনম সফল ভাবি' লয় সে বিদায়,
প্রিয়-দেশ-রক্ষা-দায় যাহার নিধন !

অঙ্গনা ভূষণপ্রিয়া সে দেশ-রক্ষণে
অকুণ্ঠিতা উন্মোচনে গাত্র-অলঙ্কার ;
সুকেশিনী শিরঃ-শোভা কেশের ছেদনে
ক্ষুব্ধা নহে, যদি তাহে হয় উপকার।
ধন্য সে ধরণীতলে অগ্রগণ্য ধাম!
যাহার মাহাত্ম্য আমি অক্ষম বর্ণনে ;
"স্বর্গাদপি গরীয়সী" যে ভূমির নাম
উজ্জ্বল করিতে সাধ করে সর্ব্বজনে।
এত অনুরাগ কোন ভূভাগ উপর ?
যদি অল্পজ্ঞান কেহ সন্ধান না পায়,
যারে ইচ্ছা জিজ্ঞাসিলে পাইবে উত্তর,—
'জন্মভূমি—সুখে তুমি বাস কর যা'য়।'

—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়

৬০

যমুনা

গৌরবে, যমুনে! তুমি কলকল স্বনে,
নবীন নীরদ-কান্তি নিন্দি নীল নীরে,
তরঙ্গ-বিভঙ্গে নাচি সমীরণ সনে,
ফেনপুঞ্জ-পুষ্পদাম-মণ্ডিত শরীরে,
গৌরবে, যমুনে! তুমি আছ প্রবাহিণী,
কোটি-কোটি-জীবকুল কল্যাণ-দায়িনী।

পুণ্যতোয়া নদী তুমি ; দক্ষ-কন্যা সতী
পতি-নিন্দা শুনি যবে ত্যজিলেন প্রাণ,
পত্নী-শোকানলে দগ্ধ দেব পশুপতি
হিমাচ্ছন্ন হিমাদ্রির ভ্রমি সর্ব্বস্থান,
কোথা না তাপিত তনু জুড়াইতে পারি,
নিলেন শরণ শেষে তব হিম-বারি।

পবিত্র তোমার তীরে করি যোগাসন,
সহিতে না পারি বিমাতার বাক্যবাণ,
তপঃসিদ্ধ ধ্রুব, স্বর্গে করি আরোহণ,
সপ্তর্ষিমণ্ডল-শীর্ষে লভেছেন স্থান ;
যেমতি নিশ্চলা ভক্তি ছিল ব্রহ্মপদে,
তেমতি নিশ্চলভাবে আছেন স্বপদে।

রমণীর তীরে তব হইয়া রাখাল,
গোলোক-বিহারী হরি ভূলোক-নিবাসী
চরাতেন চরাচর-পালক গোপাল,
গোপ-সীমন্তিনী-দত্ত নবনী-প্রয়াসী।
যাঁর পাদোদক গঙ্গা, তাঁর অঙ্গগ্লানি,
হরেছ, যমুনে ! তব বহু ভাগ্য মানি।

শ্যামল পুলিনে তব তমালের তলে
বনমালী বেণুমন্ত্র বাজাতেন যবে,

ঊর্দ্ধমুখে অর্দ্ধগ্রস্ত তাজিয়া কবলে
ধেনুবৃন্দ পুলকিত হইত সে রবে,
আনন্দে, কালিন্দি! তুমি বহিতে উজান,
পবন, পালটি ধেয়ে ঘুরিত সে স্থান;

নাচিত আভীরবালা গভীর উল্লাসে,
মিশায়ে মঞ্জীর-ধ্বনি বাঁশরী-নিস্বনে;
ললিত পঞ্চম রাগ শিখিবার আশে
কুহরিত পিক নিত্য নিকুঞ্জ-কাননে;
অলি মুরলীর ধ্বনি রন্ধ্রের আকার,
অসূয়ার পরবশে করিত ঝঙ্কার

অবগাহি তব নীরে, বীর বৃকোদর,
বিক্ষোভিত করি বারি গাত্র-মার্জ্জনায়,
বিনা বাতে বিরচিয়া ঊর্ম্মি বহুতর
তীরভূমি অভিহত করেছে লীলায়।
সহেছ দৌরাত্ম্য তুমি, জননী যেমন
স্তনন্ধয় শিশুকৃত সহেন পীড়ন।

অর্জ্জুন গাণ্ডীবধন্ব', খাণ্ডবদাহনে,
বজ্রধর ইন্দ্র যাঁরে নিবারিতে নারে,
সমর নৈপুণ্যে যাঁর কুরুক্ষেত্র-রণে
বৈরি-বনিতার অশ্রু পড়ে শতধারে,

সেই বীরশ্রেষ্ঠ সেবা করেছে তোমারে,
পড়ে কি, যমুনে ! মনে গঙ্গার কুমারে ?

গঙ্গার কুমার, চিরকুমার ধার্ম্মিক,
সত্যবতী হেতু সত্য পালনে অটল ;
শৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য যাঁর দেখি অলৌকিক,
বিস্ময়ে বলিল ভীষ্ম ভূপতিমণ্ডল ?
স্মরি যাঁর গুণগ্রাম হিন্দুর সন্তান,
এখনো তর্পণে করে তোয়াঞ্জলি দান ?

অতীত-বৃত্তান্ত-সাক্ষী তুমি ভারতের,
দেখিয়াছ কত রাজা, রাজ্যের বিপ্লব,
দেখিয়াছ ক্ষত্রতেজ, বীর্য্য মোস্‌লেমের ;
সুপ্রশস্ত ইন্দ্রপ্রস্থ, দিল্লী অভিনব,
অদ্যাপি তোমার কূলে আছে বিদ্যমান,
আজো তাজবিবি কোলে রয়েছে শয়ান !

রবির তনয়া তুমি, গৌরবশালিনী
জাহ্নবী সখীরে যথা দেছ আলিঙ্গন,
যুক্তবেণী মুক্তিদাত্রী কলুষনাশিনী
পরম পবিত্র তীর্থ করেছ স্থাপন।
অনুরাগে প্রয়াগে সকলে করে স্নান,
দেহ সহ চিত্তশুদ্ধি যোগ্য বটে স্থান।

কোথায় সে শ্যামবট—বিটপী সুন্দর,
বাঞ্ছাকল্পতরু যাহা বিশ্রুত ধারায় ?
কোথা গেল কাম্যকূপ শত শত নর
পরলোক-সুখলোভে মরিত যাহায় ?
কামনা আমার এই যমুনা-সঙ্গমে,—
নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা শিখি এ জনমে। ৭২

ধর্ম্মেরে বাসিব ভাল, বিনা অনুরোধে,
ফলশ্রুতি ধর্ম্মে মতি যেন না জন্মায়,
ঈশ্বরে সঁপিব মন আত্মপ্রীতি-বোধে—
দেহি দেহি রব নাহি রবে রসনায়।
শ্যামবট, কাম্যকূপ, না লব সন্ধান,
করিব কামনা বিনা পুণ্য অনুষ্ঠান ! ৭৮

—যতুগোপাল চট্টোপাধ্যায়

৬১

যক্ষের আলয়

কুবের-আলয় ছাড়ি' উত্তরে আমার বাড়ী,
গিয়া তুমি দেখিবে সেথায়—
সম্মুখে বাহির-দ্বার, যাহার কে দেখে ভার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়। ৪

পার্শ্বে এক সরোবরে   জল থই থই করে,
হাসে ফুল্ল নলিনীর হাট ;
উহার একটি ধারে,   অপরূপ দেখিবারে
রমণীয় মণিময় ঘাট !
সরসীর স্বচ্ছ জলে,   ইতস্ততঃ দলে দলে,
ভ্রমে হংস হংসী অবিরামে ;
যাইতে মানস-সরে   কারো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে !
উদ্যানে একটি চারু   শিশু পারিজাত-তরু
বায়ু-কোলে হেলে, পুষ্প হাসে ;
বহু যত্নে জল দিয়া   বাড়ায়েছে তারে প্রিয়া,
সুত সম তেঁই ভালবাসে।
উচ্চভূমি একধারে   গিরিসম দেখিবারে,
নীলকান্তি শিখরে বিরাজে।
সুবর্ণ-কদলী-তরু   চারিধারে শোভে চারু,
মেঘেতে তড়িৎ যেন সাজে।
মাধবী-মণ্ডপ-’পরে   কুরুবক শোভা করে,
ফুল-গন্ধে ছোটে অলিকুল ;
লতায় পাতায় ঘেরা,   আছয়ে সবার সেরা,
দু’টি গাছ অশোক বকুল।
তাহার মাঝেতে আর   ময়ূরের বসিবার
সোনার একটি আছে দাঁড় ;

শিখী যেথা কেকাভাষী সন্ধ্যাকালে বসে আসি',
আনন্দেতে উঁচা করি' ঘাড়।
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিবা,
রুনুঝুনু বাজে তায বালা ;
স্মরিতে সে-সব কথা মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি' উঠে হৃদয়ের জ্বালা।
এ-সকল নিদর্শনে চিনিবে মুহূর্ত্ত-ক্ষণে
দেখে মাত্র মোর বাড়ী-পানে ,
এবে উহা শূন্য প্রায়।— কমল না শোভা পায়
কখনো দিবস-অবসানে।

—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬২

নিশীথ

গভীর নিশীথ-মাঝে বাজে দ্বিপ্রহর।
শ্রমশান্তি সুধাপানে মজে চরাচর ॥
নিশির উদার স্নেহে ঢালি' দিয়া বুক।
ভুঞ্জিতেছে বসুমতী বিশ্রামের সুখ ॥
শূন্যে করে তারাগণ জ্যোতির সঞ্চার।
গাছ-পালা, ঝোপে-ঝাপে লুকায় আঁধার ॥
কে কোথায় পড়ি' আছে কোন চিহ্ন নাই।
নিদ্রায় মগন সবে নিজ নিজ ঠাঁই ॥

কীট-পতঙ্গের মাঝে খদ্যোৎ কেবল।
পঞ্চভূত-মাঝে বায়ু শিশির-শীতল॥
জীবের শরীরে আর নিশ্বাস পতন,
এই কয়ে যা আছে বে জীবের লক্ষণ॥

—দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর

৬৩

বুদ্ধদেবের তনুত্যাগ

নীরব পূর্ণিমা নিশি ; নিস্পন্দ নীরব
ঊর্দ্ধে পূর্ণচন্দ্র, নিম্নে সুপ্ত ধরাতল।
ফুরাইল শেষ কথা ; ধীরে বুদ্ধদেব
হইলা নীরব, ধীরে মুদিলা নয়ন।
ভিক্ষুগণ এক কণ্ঠে ভক্তি উচ্ছ্বসিত
গাইল, সে মহাবন করিয়া ধ্বনিত
"বুদ্ধং মে শরণম্।
ধর্ম্মং মে শরণম্।"
মহাকথা, মহাকণ্ঠ, শান্ত সুগভীর
নৈশ নীরবতাসহ মিশাইল ধীরে।
মিশাইল ধীরে পুণ্য-জ্যোৎস্নার সহ
নির্ম্মল উজ্জ্বলতর পূর্ণ জ্ঞানালোক ;—

সমাধিস্থ বুদ্ধদেব লভিলা নির্ব্বাণ।
মহাতরু-তলে মহা মূর্ত্তি নির্ব্বাণের
সমাধিস্থ, উদ্ভাসিত মহামহিমায়
পূর্ণিমার নিশীথের ফুল্ল চন্দ্র-করে,
হইল স্থাপিত যেন মহা যোগাসনে।
বসন্তের সমুজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র-কর
হইল উজ্জ্বলতর, শান্তির অমৃত
ভাসিল সে চন্দ্র-করে, চলিল বহিয়া
বসন্তের নৈশানিলে, উঠিল ভাসিয়া
চন্দ্রদীপ্ত গগনের নৈশ নীলিমায়,
বসন্তের চন্দ্রদীপ্ত শ্যামল ধরায়।
শিষ্যগণ এক কণ্ঠে ধ্বনিল— "নির্ব্বাণ"!
ধ্বনিল "নির্ব্বাণ" স্থির স্তব্ধ শাল বন।
"নির্ব্বাণ" ধ্বনিলা শশী, নৈশ নীরবতা।
ধ্বনিল অনন্ত বিশ্ব—"নির্ব্বাণ!" "নির্ব্বাণ!"
মহাশোকে পরিপূর্ণ হইল হৃদয়
শিষ্যদের—সেই শোক শান্ত, সুগভীর,—
অবাতবিক্ষুব্ধ সিন্ধু। একে, একে, একে
শিষ্যগণ ধীরে ধীরে আসিয়া নিকটে
করিল প্রণাম শেষ, করিল গ্রহণ
শেষ পদধূলি, আর সে দেব-মুরতি
নিরখিল শেষ এই জনমের মত।

ধূনিত কার্পাসে নব করিয়া আবৃত
সুসিক্ত সুরভি তৈলে, করিল স্থাপিত
দেব-দেহ সুচন্দন কাষ্ঠের চিতায়।
অস্ত গেল পূর্ণচন্দ্র মিতাভ নশ্বর ;
অস্ত গেল আলোকিয়া অশীতিবৎসর
পূর্ণচন্দ্র অমিতাভ ধর্ম্মজগতের।
শিষ্যগণ, ভারতের নৃপতিমণ্ডল,
পুষ্পাবৃত ভস্মরাশি কাবলা স্থাপিত
দেশ-দেশান্তরে ; দন্ত করিলা স্থাপিত
সিন্ধুর অপর পারে সিংহলের পতি,
মন্দির গগনস্পর্শী করিয়া নির্ম্মাণ।
অনন্ত মর্ম্মর-কাব্যে সেই দেব-লীলা
ভারতের অঙ্কে অঙ্কে হ'ল প্রতিষ্ঠিত,
মানবেব মহাতীর্থ, জগত-বিস্ময়।
যাও দেব। লীলা শেষ। এসেছিলে তুমি
একবাব যমুনার তীরে পুণ্যবতী,—
দেখিয়াছি সেই লীলা কোমল কঠোর।
আসিলে আবার তুমি কপিল নগরে
শৈলপতি হিমাদ্রির পুণ্যপাদমূলে,
দেখিলাম এই লীলা আত্ম-বিসর্জ্জন
রাজপুত্র মহাযোগী! আসিলে আবার
সরল মানব-শিশু জর্দ্দানের তীরে,

আরবের মরুভূমে, অমৃত নির্ঝর
আবার আসিলে তুমি,—নাহি ভাগ্য মম
দেখিব সে লীলা তব। আসিয়া আবার
পতিত পাবনী-তীরে পতিতপাবন
পাষাণ করিলে দ্রব প্রেম-অশ্রুজলে।
ভাসি প্রেম-অশ্রুজলে, বড় সাধ মনে,
দেখিবে কাঙ্গাল কবি সে লীলা করুণ,
প্রেমময়। এই আশা করিও পূরণ।

—নবীনচন্দ্র সেন

৩২

সমুদ্র

সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু ; সুনীল সলিলরাশি
রবির সুবর্ণ করে বিকাশি' সুনীল হাসি,
নাচিতেছে, গাহিতেছে দিয়া সুখে করতালি
তরঙ্গে তরঙ্গে, তীরে ফেনপুষ্পমালা ঢালি'।
অনন্ত সিন্ধুর এই অনন্ত অস্ফুট গীত
কি যেন অনন্ত স্মৃতি করিতেছে জাগরিত—
অতীত ও অনাগত সুখ-দুঃখ-বিজড়িত—
সিন্ধু-নীলিমায় যেন রবিকর বিমিশ্রিত।

সুনীল আকাশ দূরে সিন্ধু সহ নীলতর
মিশিয়াছে মহাচক্রে—সম্মিলন কি সুন্দর !
খেলিছে তরঙ্গমালা—শিরে ফেনপুষ্পরাশি—
সমুদ্র-মন্থনে যেন অমৃত উঠিছে ভাসি'।
নীলাকাশ বিশ্বরূপ—অনন্তের মহাভাস,
তরল হৃদয়-সিন্ধু, তরঙ্গ অনন্তোচ্ছ্বাস।

—নবীনচন্দ্র সেন

৬৫

অর্জ্জুনের শোক

উত্তীর্ণ সমর ক্ষেত্র। নক্ষত্রের বেগে
চলিতে লাগিল রথ। দেখিল অদূরে
দুইজনে নিরানন্দ পাণ্ডব-শিবির
আভাহীন, শোভাহীন, বিজয়া-প্রদোষে
যেন শূন্য পূজাগৃহ নিরানন্দময়।
আকুল হৃদয়ে পার্থ কহিলা,—"কেশব !
বাজে না মঙ্গলতূরী, দুন্দুভি, পটহ ;
নীরব মুরজ বীণা। নাশি' সংশপ্তকে
আসিতেছি,—কই, নাহি গায় বন্দিগণ
অগ্রসরি' স্তুতিপূর্ণ মঙ্গল-সঙ্গীত !

পুরনারীগণ নাহি গবাক্ষ-দুয়ারে
দাঁড়াইয়া শিবিরে দেয় হুলুধ্বনি,
করে পুষ্প বরিষণ ! কই, পুত্রগণ
কই, অভিমন্যু কই আসে না ছুটিয়া,
প্রীতি-পূর্ণ মুখে করি পিতৃ সম্ভাষণ !
নারায়ণ !"—অর্জ্জুনের ভিজিল নয়ন,—
"পাণ্ডব-শিবির দেখ শূন্য নিরজন !"
   চক্রব্যূহ মহাক্ষেত্র দেখিলা বিস্ময়ে
শোভিছে অদূরে মহাদুর্গের মতন,
শবের প্রাচীরে উচ্চ। জন-স্রোত বেগে
ছুটিয়াছে এক স্রোতে সেই দুর্গ পানে ;—
ছুটিল বিদ্যুৎবেগে রথ সেই দিকে।
কহিলা কেশব,—"পার্থ ! চক্রব্যূহ করি'
আজি যুঝিলেন দ্রোণ, সেই চক্রব্যূহ
হইয়াছে শব-ব্যূহ দেখ কি ভীষণ !
স্তরে স্তরে পড়ি শব—অশ্ব, গজ, নর—
রথের উপরে রথ, শব তদুপর,
দুর্ভেদ্য প্রাচীরমত শোভিছে কেমন।
কোন্ বীর বীরমণি আজি জগত-বিস্ময়
এ অক্ষয় কীর্ত্তিমালা পরিল গলায় !
দেখিয়াছি বহু যুদ্ধ, করিয়াছি রণ
আজীবন, এ বীরত্ব দেখিনি কখন।"—

আর চলিল না রথ ; পড়িলা ভূতলে
লম্ফ দিয়া দুই জন ; করিয়া লঙ্ঘন
ঊর্দ্ধশ্বাসে সে প্রাচীর, ছুটিলা সত্রাসে,—
হাহারবে সৈন্যগণ উঠিল কাঁদিয়া।
  দেখিলেন কুরুক্ষেত্র শোকের সাগর।
শব-চক্র মহাবেলা ; প্রশস্ত প্রাঙ্গণ
ব্যাপিয়া পাণ্ডব-সৈন্য, ঊর্ম্মির মতন
উদ্বেলিত মহাশোকে, কাঁদে অধোমুখে,—
গুণহীন ধনু, পৃষ্ঠে শরহীন তূণ।
রথি-মহারথিগণ বসিয়া ভূতলে
কাঁদিতেছে অধোমুখে, যেন আভাহীন
সিক্ত রত্নরাজি পড়ি' রত্নাকর-তলে।
বাণ-বিদ্ধ-মীন-মত পাণ্ডব সকল
করিতেছে গড়াগড়ি পড়িয়া ভূতলে।
মূর্চ্ছিত বিরাটপতি—স্তম্ভিত প্রাঙ্গণ—
কেন্দ্র স্থলে অভিমন্যু শরের শয্যায়,—
সিদ্ধকাম মহাশিশু ক্ষত-কলেবর,
রক্তজবা-সমাবৃত, সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত,
—সন্ধ্যাকাশে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল—
নিদ্রা যাইতেছে সুখে! বক্ষে সুলোচনা
মূর্চ্ছিতা ; মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা,

সহকার-সহ ছিন্ন ব্রততীর মত !
কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক, বিস্ফারিত,
এই মহা শোকক্ষেত্রে ; কেবল অচল
এই মহা শোকক্ষেত্রে একটি হৃদয় ;—
সেই নেত্র সেই বুক, মাতা সুভদ্রার !
চাপি' মৃত-পুত্র-মুখ মায়ের হৃদয়ে
দুই করে, বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়,
যোগস্থা জননী চাহি' আকাশের পানে,—
আদর্শ বীরত্ব বক্ষে প্রীতির প্রতিমা !—
নীরব বিস্তৃত ক্ষেত্র ! থাকিয়া থাকিয়া
কেবল কাঁপিয়া ধীরে মায়ের অধর
গাইতেছে কৃষ্ণ নাম ! মূর্চ্ছিত অর্জ্জুন
পড়িতে, ধরিলা কৃষ্ণ বাহু প্রসারিয়া ।
উচ্ছ্বাসে কহিলা কৃষ্ণ,—"অর্জ্জুন ! অর্জ্জুন !
আমরা বীরের জাতি, বীর-ধর্ম্ম রণ !
অযোগ্য এ শোক তব । এই বীরক্ষেত্র
করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
এক বিন্দু শোক-অশ্রু । বীরর্ষভ তুমি,
বীর-শোক অশ্রু নহে, অসির ঝঙ্কার !"

—নবীনচন্দ্র সেন

৬৬

বাসন্তী পূর্ণিমা

বসন্তের পৌর্ণমাসী। কি শোভা ফুটিছে !
সুধার সাগরে যেন তরঙ্গ উঠিছে !
সুনীল আকাশ, নাই একটুকু রেখা ;
ডুবেছে নক্ষত্র কত, নাহি যায় দেখা।

উঠিছে জ্যোৎস্নার ঢেউ কানায় কানায়,
না ধরে ব্রহ্মাণ্ডে যেন উছলিয়া যায় !
চন্দ্র যেন প্রেমে হেসে ঢালিয়া কিরণ
প্রসুপ্ত ধরার মুখে দিতেছে চুম্বন !

প্রাণের আরামে কিম্বা দিবস ভাবিয়া
তরুকুঞ্জে কভু পাখী উঠিছে ডাকিয়া।
ফুটেছে অগণ্য ফুল ; বায়ু মাতোয়ারা ;
খুলিয়া গিয়াছে যেন সুখের ফোয়ারা !

সে আলোকে শোভে শত কুসুম-কলিকা !
আশে পাশে হাসে যেন সরলা বালিকা।
অঙ্গে লাগে জ্যোৎস্না রস, নাসাতে সুঘ্রাণ,
কি অপূর্ব্ব সুধা-রসে ডুবাইছে প্রাণ !

কতই হইল রাতি ; উড়িয়া বাদুড়
পড়িছে কলার গাছে করি' ছুড় ছুড় ;

অদূরে আমের বনে বায়ু সর্ সর্ ;
চিকি মিকি খেলে পত্রে সুধাংশুর কর ;
মর্ম্মরিয়া শুষ্কপত্র বনজন্তু যায় ;
স্বপনে ডাকিয়া পাখী আবার ঘুমায় ।
ব্রহ্মাণ্ডের সাঁ সাঁ রব ব'হে আসে কানে ;
পরাণ ডুবিছে তাহে, সে ডোবে পরাণে !

—শিবনাথ শাস্ত্রী

৬৭

লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে রাম

রামচন্দ্র । ধরি' দেহ দুখ-সুখ সহিনু সকলি ।
মেদ-অস্থি-নির্ম্মিত এ কলেবর,
রোগ-শোকাগার অন্য দেহ সম,
মর্ম্মে বাজে সম ব্যথা,
কিন্তু প্রেমে জয় রিপু মম ;
তাপপূর্ণ দেহ সুখাগার প্রেমে ।
শিখিলাম প্রেম-খেলা,
প্রেমাকর জনক-জননী-কোলে ;
বিতরিনু কণা মাত্র তা'র অনুজে আমার,
পাইলাম প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই—
উৎসব-সঙ্কট-সাথী ।

হে সুধীর,
সেই প্রেমে তুমিও কিনিবে,
অনুজ লক্ষ্মণ তব।
বিলাইনু সে প্রেম সবারে,—
গুরুজনে, ব্রাহ্মণ-চরণে
মিনতি শিখিনু।
পরদুঃখে শিখিলাম দুখ,
তেঁই নহিনু বিমুখ তপোবনে,
গর্জ্জিল বিমানে যবে তাড়কা ভীষণা।
বুঝিলাম প্রেমের প্রভাব,--
সে প্রেম-প্রভাবে, ধরিনু হৃদয়ে,
প্রেমময়ী জনকনন্দিনী,
বিজন-সঙ্গিনী মম।
প্রেমে পিতৃসত্য-হেতু গমন গহনে,--
হারাইনু জানকীরে,
রে নিন্দুক, তবু না নিন্দিনু বিধি।
সহেছ কি কভু,
রাজ্য ত্যজি সীতাহারা শোক?
প্রেমের সন্ন্যাসী, প্রেমে কপিসেনা সাথী,
প্রেমে শিলা ভাসে জলে, ম'লে প্রাণ মেলে,
প্রেমে দশানন-জয়ী খ্যাতি,
প্রেমের শাসনে রামরাজ্য অযোধ্যায়

প্রেম হেতু সীতা ত্যজি—
লঙ্ঘি, অলঙ্ঘ্য সাগর,
দুষ্কর সমর করিলাম যা'র লাগি' !
রাম-রাজ্য আদর্শ জগতে ত্যাগ-গুণে !
জানকী-বিরহ,—
পাষাণ বিদরে তাপে,—
আছি স্থির প্রেমের আশ্রয়ে।
ভবার্ণবে প্রেম ভেলা,—
পাবে দুঃখ এ শিক্ষা ভুলিলে।
পুনঃ হের সত্য-পূর্ণ ভার,
লক্ষ্মণ-বর্জ্জন যাচে বিধি দাতা বিধি।

[বশিষ্ঠের প্রবেশ]

পুরোহিত, প্রণমি চরণে,
যাচে বিধি লক্ষ্মণ-বর্জ্জন।

বশিষ্ঠ। বৎস। ধ্যানযোগে আছি অবগত।

রাম। কহ হিতবাণী বিধান-সঙ্গত।

বশিষ্ঠ। শিবময় হে সম্পদ্ দাতা,
কোন্ বিধি অগোচর তব ?
কিন্তু যদি বাড়া'লে হে মান,
যথাজ্ঞান নিবেদি চরণে,—
সত্যের সম্মান রাখ লক্ষ্মণ-বর্জ্জনে।

রাম। হায় মুনিবর!
বিলাস-বঞ্চিত, বাস গহন মাঝারে,
তপে শীর্ণ কলেবর তব,
কেমনে হে বুঝাব তোমায়
গৃহীর অন্তর-ব্যথা!
জান না লক্ষ্মণে তুমি,
তেঁই এ নিষ্ঠুর বাণী
কহ মোরে, মুনিবর।
কিশোরে অনুজ মম বালা-ক্রীড়া ত্যজি'
নির্ভয়ে চলিল সাথে।
তাড়কা-তাড়িত বনে
ভ্রূভঙ্গে হেরিনু,
অটল-প্রতিজ্ঞা বীর-বালক শরীরে,—
না ছাড়িবে পাশ মম রাক্ষসী-সমরে।
গর্জিলা তাড়কা সিংহনাদে,—
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে,—
বুঝি আমি প্রাণের লক্ষ্মণ হেতু।
প্রলয় ঝলকে উঠিল গর্জ্জিয়া বাণ,
পড়িল রাক্ষসী, সুমেরুশিখর যেন,
টলিল ভুবন ভারে;—
অটল প্রাণের ভাই পাশে।
রাজ্য-হারা, চলিলাম বনবাসে,

সত্যাশ্রয়,—শূন্যময় ধরা,
পাছে ছায়া-সম ভাই মম !
জননী কাঁদিছে—না চায় ফিরিয়া ভাই,
না সম্ভাষে রুদ্ধমানা প্রেয়সীরে,
ঘন মুখ চায়, আঁখি ভেসে যায়,—
ভয়, পাছে নাহি করি সাথী !
ধনুর্ধারী প্রহরী আমার,
অনাহারে অনিদ্রায় বঞ্চিল বিপিনে,
চতুর্দ্দশ বিজন বৎসর !
কভু না সুধিনু আমি,
খাইল কি না খাইল ভাই,
তবু শক্তিশেল পাতি' নিল বুকে !
জাগি মহীতলে মহীরাজ ঘরে,
পাশে শুয়ে ভাই মম !
পাশে ছত্রকরে অযোধ্যার সিংহাসনে,—
জানকী বর্জ্জনে লক্ষ্মণ সারথি রথে !—
আহা শক্তিধর ! লইল কলঙ্ক মাথা পাতি',
ভ্রাতৃপ্রেমে গুণধাম !
কোথা পাব এ দোসর, কোথা ভাসাইব,
কেমনে বাঁধিব প্রাণ ?—
ন্যায়বান্ কে ক'বে আমারে,
কে আর হইবে জ্যেষ্ঠ-অনুগামী ভবে ?

বশিষ্ঠ। তব ন্যায়-স্রোত বহে অন্তরে অন্তরে,—
যেবা তব চরণ সেবিবে,
তোমারে বুঝিবে,
কি ভার তাহার, প্রভু,
সত্য-হেতু ত্যজিতে তোমায় ?
ত্রেতাযুগে সত্য লোপ একপদ,
তবু সত্যাশ্রয়ী মানব-সম্পদ্
দেখা'বে বর্জ্জন-গুণে ;
এ সম্পদে চাহ চির-অনুগত জনে
বঞ্চিতে হে দয়াময় ?
একি ন্যায় তব ন্যায়বান্ ?
গৌরব বাড়াতে গতি যা'র তব পদে,
হে বিপুল-গৌরব !
বিপুল গৌরব দান হে অনুজে তব।
রাম। শূল—শূল—শূল, হে শঙ্কর !—
পিনাক ভুবন-ক্ষয় !
কোদণ্ডে না হবে, কোদণ্ড নারিবে
বিঁধিতে কঠিন প্রাণ। —
কহ নর, নহি ন্যায়বান্ ?—
বিন্ধি প্রাণ তোর তরে।
রে লক্ষ্মণ! এ দেহে না পাব তোরে আর !

—গিরীশচন্দ্র ঘোষ

৩৮

বরষার বিল

বরষার বিল,
এমন পবিত্র স্থান, বাতাসে জুড়ায় প্রাণ,
অজানা আবেশে করে হৃদয় শিথিল।
পানা, জল, ঘাস-গাছে, কত কি মাধুবী আছে,
ভুলাইছে একেবারে ভুবন নিখিল।
ডাকে জলচর পাখী, দাম-দলে থাকি থাকি,
এত কি ললিতে গায় বসন্তে কোকিল ?
সুনীল লহবী তুলি নাচাইছে দুলি দুলি,
সন্ধ্যার শীতল অই মলয় অনিল,
নূতন সলিলে ভরা ববষাব বিল।

ববষাব বিলে
শত শত ধান ক্ষেতে, যেন শ্যাম সাগরেতে,
উঠিছে মৃদুল বাতে সবুজ লহরী,
ছুটিছে সলিলে নীচে, তরঙ্গ তরঙ্গ পিছে,
কাঁপিছে প্রকৃতি-অঙ্গ পুলকে শিহরি।
কি আনন্দ কেবা জানে, আজি প্রকৃতির প্রাণে,
কমল কুমুদ কাঁপে বুকের উপরি,
তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিছে শিহরি।
ডাহুক ডাহুকী সুখে বেড়িয়া বেড়ায়,
এখানে ওখানে সবে, মধুর মধুর রবে,

সরালী কালেম পিপী কত নাচে গায়।
চপল ও কড়্‌গাই, ওদের তুলনা নাই,
উড়িতেছে পড়িতেছে যোড়ায় যোড়ায়!
মরাল মরালী সনে, তেমনি পুলক মনে,
কমল-কুমুদ-বনে ভাসিয়া বেড়ায়।

চক্রবাক-চক্রবাকী, চঞ্চুতে চঞ্চুটি রাখি,
কত কষ্ট জানাইছে, লইতে বিদায়
সরল পাখীর প্রাণ—আসন্ন-সন্ধ্যায়।
সুশীতল সন্ধ্যাকালে,
ফুটিয়াছে থরে থরে কুমুদ কুসুম.

সুনীল গগনতলে, সহস্র হীরক জ্বলে,
ভাঙ্গিয়াছে সুরশিশু তারকার ঘুম।
অমর অধরে হাসি, অফুরন্ত সুধারাশি,
সমস্ত জগতে ওর লেগে গেছে ধূম,
হাসিতেছে সুরশিশু, কুমুদ কুসুম।

পারে পারে ঘাটে ঘাটে লইবারে জল,
গ্রামের গৃহস্থ-বধূ এসেছে সকল।
হারানো কুমুদ জ্ঞানে, ভাসে শশী অইখানে,
না চিনিয়া মিছামিছি হাসিছে কেবল।
কলসীতে ঢেউ দিয়া, শশধরে খেদাইয়া,

সরলা গৃহস্থ-বধূ ভরিতেছে জল,
ও-তরঙ্গ বিকম্পনে, কত যে পুলক মনে,
এক চন্দ্র শত হয়ে হাসিয়ে পাগল,
ভাবিয়া গৃহস্থ-বধূ কুমুদ বিমল!
গ্রাম অভিমুখে অই চলেছে তরণী,—

আকাশেতে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ কয়খানি।
কৃষক বাহিছে ধীরে, কৌমুদী মাখান নীরে,
বিলের বিমল বুকে মৃদুলে ক্ষেপণী,
করিতেছে গ্রাম্য গান, জুড়ায় তাপিত প্রাণ,
শিখিতে অমরকণ্ঠে গায় প্রতিধ্বনি।

সবুজ লহরীগুলি, সুখে করে কোলাকুলি,
এমন সলিল নৃত্য দেখিনি কখনি।
এত মধু—মাদকতা, স্বর্গীয় এ সরলতা,
মিলে কি এমন আর খুঁজিলে অবনী?
চাহিলে নয়ন কোণে, বারেক উহার পানে,

পরাণ পাগল হয় আপনা আপনি,
গ্রাম অভিমুখে অই চলিছে তরণী।
গ্রাম অভিমুখে যায় অই ক্ষুদ্র তরী,
ছৈয়ের ভিতর থেকে, শরীর লুকায়ে রেখে,
চুপি দিয়ে চেয়ে আছে সরলা সুন্দরী!

গগনের পূর্ণশশী, ভূতলে পড়েনি খসি,
ফোটেনি কুমুদ নীল জল পরিহরি !
এমনি মধুরে হেসে দাঁড়াইয়া তীর দেশে,
কি দেখিছে গ্রামের ও "ঝিয়ারী বহুরী ?"
আজি বহু দিন পরে, আসিছে বাপের ঘরে,

শৈশবের সহচরী "নূতন নায়রী,"
সারি দিয়ে দেখে তাই সরলা সুন্দরী।
কেমন পবিত্র ওই গ্রাম্য ভালবাসা,
পরস্পরে সুখে দুখে, প্রীতির প্রসন্ন মুখে,
কেমন সে মিলনের প্রথম জিজ্ঞাসা।

কেমন সে গদগদ ঢল ঢল কোকনদ,
কেমন সে আধফোটা মধুব সম্ভাষা।
সংসারের দয়া মায়া—একত্রে রমণী-কায়া,
সরলা রমণীমূর্ত্তি পূজা করে চাষা !
ইচ্ছা করে নিত্য সেবি, ও গ্রাম্য সরলা দেবী,

সামান্য গৃহস্থ হয়ে মিটাই পিপাসা !
কেমন পবিত্র ওই গ্রাম্য ভালবাসা।
দেখিছে দাঁড়া'য়ে যেন—
তীরে তীরে তরুগণ—কাতারে কাতার,
পুণ্যের পবিত্র তীর্থ—বিল বরষার।

দেখে বোধ হয় হেন, পুণ্য স্নান করে যেন,
আকণ্ঠ মগন জলে হিজল উদার!
অথবা মনের সুখে, শীতল সলিল বুকে,
ঢালিছে অনন্ত দগ্ধ প্রাণ আপনার!
ইচ্ছা করে,
অই বুকে বুক রাখি অমনি লুকায়ে থাকি,
ভুলে যাই এ সংসার জ্বালা যন্ত্রণার,
শত কষ্ট শত দুখ, এ অন্তর দগ্ধবুক,
নিবাই প্রাণের গুপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গার,
পুণ্যের পবিত্র তীর্থ—বিল বরষার!

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

৬৯

মা-মরা মেয়ে

মা-মরা দুখিনী মেয়ে বড় যন্ত্রণার!
মা-মরা দুখিনী মেয়ে, এ-ঘরে ও-ঘরে যেয়ে,
খোঁজে নিতি পাতি পাতি জননী তাহার!
শুধায় আসিয়া কাছে,—"বাবা গো, মা কোথা আছে?"
পারি না উত্তর দিতে শিশু বালিকার!
মা-মরা দুখিনী মেয়ে যারে দেখে তারে যেয়ে
মা ব'লে আঁচল ধ'রে টানে অনিবার;
কিন্তু চেয়ে মুখপানে ফিরে সে নিরাশ প্রাণে,

সে দৃশ্য দেখিতে বিশ্ব দেখি অন্ধকার !
মা-মরা দুখিনী মেয়ে　　　থাকে শুধু পথ চেয়ে,—
যে পথে চলিয়ে গেছে জননী তাহার !
আসিতে চাহে না ঘরে,　　　কাঁদিয়া পাগল করে,
হায় সে প্রাণের জ্বালা নহে বলিবার।
মা মরা দুখিনী মেয়ে　　　বিছানাতে শুতে যেয়ে
মায়েব লাগিয়া স্থান পাশে রাখে তার ;
নিশীতে ঘুমের ঘোরে　　　মা বলিয়ে গলা ধরে ;
—কে জানে মা-মরা মেয়ে এত যন্ত্রণার !

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

৭০

শেষ বিশ্রাম

গভীর নিদ্রায় পান্থ নয়ন মুদিয়া,
ধূ ধূ ধূ প্রান্তরে আছ একাকী পড়িয়া,
কোথা তব দারাসুত প্রিয় পরিজন ?
ভাবে কি গো মনে তা'রা এ ধূলি-শয়ন ?
না—সুরম্য হর্ম্ম্য-মাঝে শুভ্র শয্যা'পরে
বীজনী ব্যজনে নিদ্রা যায় অকাতরে ?
মাঝে মাঝে তব চিন্তা দুঃস্বপ্নের মতো
উদিয়া মানসে চিত্ত করে বিষাদিত ?

হে দীন, তোমার মতো আমিও এমন
ধূলির শয্যায় কবে করিব শয়ন ?
কবে যে পাইব ত্রাণ এ মরম-দাহে,
কবে মিশে যাবে অণু মৃতের প্রবাহে ?

—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

৭১

সন্তান ও জননী

ফুট্‌ফুটে জ্যোছনায়   ধব্‌ধবে আঙ্গিনায়
একখানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়াযে কাছে,   জননী শুইয়া আছে,
গৃহকাজে অবসর পেয়ে।
সাদা সাদা মুখ তুলি'   জুঁই-শেফালিকাগুলি
উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে,
প্রাচীরেতে সুশোভিতা   রাধিকা ঝুমুকালতা—
দুলিতেছে চন্দ্রকরে নেয়ে'।
মৃদু ঝুরু-ঝুরু বায়   বসন কাঁপায়ে যায়
ঝ'রে পড়ে কামিনীর ফুল ;
প্রশান্ত মুখের 'পরে   কালো কেশ উড়ে' পড়ে ;
আলসেতে আঁখি ঢুলঢুল।

মৃদু মৃদু ধীর হাতে   আঘাতে শিশুর মাথে,
গায় ঘুমপাড়ানিয়া গান।
মোহিয়া সুস্বর-ভাষে   আকুল কি ফুলবাসে
পিঞ্জরে ধরেছে পাখী পিউ পিউ তান।
শিয়রেতে জেগে শশী   যেন সে সৌন্দর্য্যরাশি
নেহারিছে মগ্ন হ'য়ে ভাবে।
ছেলে ডাকে—'আয় চাঁদ',   মা বলিছে—'আয় চাঁদ',
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে।
মা নাহি ঘরেতে যার,   ছেলে কোলে নাই যার,
যত কিছু সব তার মিছে!
চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি,   চাঁদে চাঁদে মেশামিশি,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে প্রভেদ কি আছে!

—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

৭২

ধূলা

কোন্ ঐন্দ্রজালিকের অস্থি-অবশেষ,
কহ তুমি, লো কণিকে, মোর কাণে কাণে?
সমীর-বাহিনী তন্বী কে না তোমা জানে?
উড়ে' উড়ে' কর সদা কাহার উদ্দেশ?
হেন স্থান নাহি, যথা নাহি তব গতি!

প্রকাশ্য নিবাস-পথে, যাও পায় পায়—
ঘৃণাভরে ফেলে ঝেড়ে কেবা না তোমায় ?
নিরভিমানিনি অয়ি ! তবু কর স্থিতি
লুকায়ে গৃহের কোণে ; অযত্নপালিতা—
দরিদ্র বালিকামত ধনীর ভবনে ;
দীনেরো কুটীরে তুমি নহ সম্মানিতা ।
লো মলিনে ! ওই তব মলিন বসনে
ঢাকা যে সৌন্দর্য্যরাশি, বিশ্বানুলেপন,
মোরা বিজ্ঞ, মোরা অজ্ঞ ! চিনেও চিনিনে
জগৎ-জননীরূপা ! তোমারে সে চিনে
স্বভাবদীক্ষিত শিশু, মহানন্দ মনে
মাখে কায় নিয়ে তুলে অঞ্জলি অঞ্জলি ,
নগ্ন অঙ্গে কিবা শোভা ধর তুমি ধূলি !
সর্ব্বাঙ্গে বুলায়ে কর দাও সাজাইয়া ,
নেহারি' সন্ন্যাসী নাগা মুগ্ধ হয় হিয়া !
বাল্যসখি, চিনি তব মধুর মুরতি—
করিয়াছি এক দিন সাদরে আরতি !
আদ্যন্তরূপিণি, তব মহিমা অশেষ
অবসান তোরি মাঝে সর্ব্ব-গর্ব্ব-লেশ !

—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

৭৩

ভুল-ভাঙ্গা

প্রভু, ভুল ভেঙ্গে দেও !
তুমি বিভু অন্তর্য্যামী, আমার প্রাণের স্বামী
তুমি ভিন্ন এ জগতে
নাহি মোর কেও !
প্রভু, ভুল ভেঙ্গে দেও !
আমার খেলার সাথী
দশ জনে মিলি !
করি ঘোর ষড়যন্ত্র, কানে মোর দিয়া মন্ত্র,
ছয়টি দস্যুর কাছে
নিয়া গেছে ঠেলি !
কাড়িয়া নিয়াছে তারা
যা ছিল সম্বল !
পথের ভিখারী ক'রে এখন দিয়াছে ছে'ড়ে,
কি আছে আমার আর ?
—শুধু অশ্রুজল !
ভাই ভগ্নী সুত দারা, "দূর দূর" করে তারা,
কেউ না জিজ্ঞাসে মোরে
দুটি কথা বলি !
দিন ত চলিয়া গেল, কালনিশি এ'ল এ'ল,
কে দিবে দেখায়ে পথ
যাব কোথা চলি !

চৌদিকে শত্রুর দল, করিতেছে কোলাহল,
আতঙ্কে হৃদয় কাঁপে
সঙ্গে নাহি কেও !
যে ভুলে তোমারে ভুলে' গিয়াছি মনের ভুলে,
আমার সে ভুল প্রভু
তুমি ভেঙ্গে দেও ! ২৭

বাস্তবে ছাড়িয়া আমি
অবাস্তব পাছে
ঘুরিয়াছি নিশি দিন, এবে মোর তনু ক্ষীণ
তুমি ভিন্ন এ জগতে
কে আমার আছে ? ৩২

তুমিই আমার স্বামী, পথভ্রান্ত পাপী আমি
হাত ধ'রে প্রভু তুমি,
কোলে তুলে নেও। ৩৫

যে ভুলে তোমারে ভুলে, হীরা ফেলে কাচ তুলে
ভিখারী সেজেছি আমি—
—আমার সে ভুল প্রভু,
তুমি ভে'ঙ্গে দেও ! ৩৯

—কায়কোবাদ

৭৪

সুখ

নাই কি রে সুখ ? নাই কি রে সুখ ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময় ?
যাতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরিতে
কেবলই কি নর জনম লয় ?
কাঁদিতেই শুধু বিশ্ব রচয়িতা
সৃজেন কি নরে এমন ক'রে ?
মায়ার ছলনে উঠিতে পড়িতে
মাবব-জীবন অবনী 'পরে ?
বল্ ছিন্ন বীণে, বল্ উচ্চৈঃস্বরে—
না-না-না—মানবের তরে
আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।
কার্য্যক্ষেত্র ঐই প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর-অঙ্গন সংসার এই ;
যাও বীরবেশে কর গিয়া রণ ;
যে জিনিবে, সুখ লভিবে সে-ই।
পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও ;
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরের কারণে মরণেও সুখ ;
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদ না আর ;
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
        ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।
"বিষাদ" "বিষাদ" "বিষাদ" বলিয়া
কেনই কাঁদিবে জীবন ভ'রে ?
মানবের মন এত কি অসার ?
        এতই সহজে নুইয়ে পড়ে ?
সকলের মুখ হাসি-ভরা দেখে
পার না মুছিতে নয়ন-ধার ?
পরহিত-ব্রতে পার না রাখিতে
        চাপিয়া আপন বিষাদ ভার ?
আপনারে ল'য়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে ;
সকলের তরে সকলে আমরা,
        প্রত্যেকে আমরা পরের তরে

—কামিনী রায়

৭৩

মধুর স্বপন

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।
এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে,
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে,
কি জানি কখন কি মোহন বলে,
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু তথা।
আমি শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে
পুণ্য দেবস্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা গোদাবরী নর্ম্মদা কাবেরী,
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।
আর দেখিনু যতেক ভারত-সন্তান,
একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান্,
আসিছে যেন গো তেজে মূর্ত্তিমান,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।
সবে ভারত রমণী সাজাইছে ডালি,
বীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা,
গাহিছে উল্লাসে বিজয় গাথা।

—কামিনী রায়

৭৬

পথ-ভোলা

পথ ভুলে গিয়েছিল, আবার এসেছে ফিরে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে দূরে, লাজে ভয়ে নতশিরে ;
সমুখে চলে না পদ, তুলিতে পারে না আঁখি,
কাছে গিয়ে, হাত ধ'রে, ওরে তোরা আন ডাকি'।

ফিরাস্‌নে মুখ আজ নীরব ধিক্কার করি',
আজি আন্‌ স্নেহ-সুধা লোচন বচন ভরি'।
অতীতে বরষি' ঘৃণা কিবা আর হবে ফল ?
আঁধার ভবিষ্য ভাবি' হাত ধ'রে ল'য়ে চল্‌।

স্নেহের অভাবে পাছে এই লজ্জানত প্রাণ
সঙ্কোচ হারায়ে ফেলে—আন্‌, ওরে ডেকে আন।
আসিয়াছে ধরা দিতে, শত স্নেহ-বাহু পাশে
বেঁধে ফেল্‌, আজ গেলে আর যদি না-ই আসে।

দিনেকের অবহেলা, দিনেকের ঘৃণা ক্রোধ,
একটি জীবন তোরা হারাবি জনম-শোধ।
তোরা কি জীবন দিবি ? উপেক্ষা যে বিষ-বাণ,
দুঃখ-ভরা ক্ষমা ল'য়ে আন্‌ ওরে ডেকে আন।

—কামিনী রায়

৭৭

সুনীল সাগরে সোনার কমল

হে সুধাংশু, হরি' তব শোভা নিরুপম,
কি ভাব যে উথলে এ চিতে,
হায় গো বোঝাব সুখ-স্বপনের সম
বাক্যে তাহা নারি প্রকাশিতে।
সুনীল সাগরে তুমি সোনার কমল,
আনন্দ-নির্ঝরে তুমি শোভার উৎপল।
তোমার সৌন্দর্য্য গৃহে বসি', সুধাকর,
প্রাণ ভরি' সুধা করি' পান
জ্বালা তৃষ্ণা দূরে যায়, জুড়ায় অন্তর,
ভরি' যায় দাবদগ্ধ প্রাণ।
ফলফুলময় মরি তরু-লতিকায়,
হে কুহকি, কি কুহকে ভুলালে আমায়।
সাধে কি কুমুদী হাসে হেরিয়া তোমায়?
শিখী পুচ্ছে নাহি হেন রূপ।
সাধে কি, হে স্বর্ণপদ্ম, তোমারেই চায়
শিশু-আঁখি ভ্রমর লোলুপ?
মা'র কোলে শিশু হাসে, বাহু পসারিয়া।
পিয়ে যায় মনোসাধে অমিয়া ছানিয়া।
কি আনন্দ!—জলধির তরঙ্গ যেমন
নেচে উঠে হেরিয়া তোমায়,—

চন্দ্র, তব চন্দ্রমুখ করিয়া দর্শন,
    চিত্তে মোর হর্ষ উথলায় !
হে সুধাংশু, মম চিত্ত-বনরাজি-গায়
তোমার ও জ্যোৎস্না-হাসি কি অপূর্ব্ব ভায় !

হে শশাঙ্ক, হেরি' আজ ও-মধুর রূপ
    কি বলিব ? কি বলিব আমি ?
আমি যেন হেরিতেছি—একি অপরূপ !
    শতচন্দ্র !—অখিলের স্বামী

শতচন্দ্র রূপ ধরি', হাসিয়া হাসিয়া,
দেহ, মন চিত্ত বুদ্ধি লইলা কাড়িয়া !
আহা কি মধুর রূপ ! এই বেশে, শশী,
    এস নিত্য এ চিত্ত-আকাশে !

হৃদয়ের অন্ধকার গেল সব খসি',
    তোমার ও লাবণ্য-প্রকাশে !
পাগল চকোর সম, উধাও হইয়া,
পিব আমি, পিব আমি ওরূপ-অমিয়া !

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

৭৮

বর্ষাসুন্দরী

মুক্ত-মেঘ-বাতায়নে বসি',
এলোকেশী কে ঐ রূপসী ?
জলযন্ত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে !

রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ করি'
সারাদিন, সারারাত্রি, বারিরাশি পড়িছে ঝর্ঝরি' ।
চমকিল বিদ্যুৎ সহসা !
এ আলোকে বুঝিয়াছি, এ নারীরে চিনিয়াছি ;

এ যে সেই সতত-সরসা,
ভুবনমোহিনী ধন্যা রূপসী বরষা !
শ্যামাঙ্গী বরষা আজি বিহ্বলা মোহিনী সাজি'
এলায়ে দিয়েছে তার মসীবর্ণ কালো কালো চুল ;

শ্রীকণ্ঠে পরেছে বালা অপরাজিতার মালা,
দু'কর্ণে দোদুল দোলে নীলবর্ণ ঝুম্‌কার ফুল ।
নীলাম্বরী সাড়ীখানি পরি'
অপূর্ব্ব মল্লার রাগ ধরেছে সুন্দরী !

স্রস্ত কেশরাশি হ'তে বেলফুল চৌদিকে ঝরিছে !
কালো-রূপ ফাটিয়া পড়িছে !
যাই বলিহারি !
কে দেখেছে কবে ভবে হেন বরনারী ?

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

৭৯

রাজা রামমোহন রায়

হে রাজেন্দ্র ! শ্বাস-হরা তমস্বিনী ঘোরা !
একটি নক্ষত্র নাই ! আজি এই বঙ্গে,
ভেসে যাই, ভেসে যাই, ভেসে যাই মোরা
লীলাময়ী লালসার চঞ্চল তরঙ্গে !
অপাঙ্গে মাধুরী-রাশি, চাতুরী ভ্রূভঙ্গে,
আহ্বানিছে নাস্তিকতা ! সুরা রক্তাকারা
পাত্রে ঢালে মুহুর্মুহু ! হ'য়ে মাতোয়ারা
অধর্ম্ম অঘোরপন্থী নাচে, হের, রঙ্গে !

হে রাজর্ষি ! ধ্যান-বলে, নারদী-কৌশলে,
আন, আন উষারূপ অনিন্দ্য সুন্দরী
ভকতিরে ! জ্ঞানারুণ উদয়-অচলে
ছড়াক্ আলোক রাশি ! পোহাক্ শর্ব্বরী !
আর্দ্র কেশে, শুভ্র বেশে, আনন্দে ধরিয়া
হরিপাদপদ্ম, বঙ্গ উঠুক হাসিয়া !

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

৮০

বঙ্গ-জননী

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, অয়ি জননী আমার।
তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।

শত শৃঙ্গ-বাহু তুলি' হিমাদ্রি শিয়রে
করিছেন আশীর্ব্বাদ—স্থির-নেত্রে চাহি',
শুভ্র মেঘ-জটাজাল দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষঃ বাহি'।

জ্বলিছে কীরিট তব— নিদাঘ তপন,
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্ত রশ্মি-শিখা,
জ্বলিয়া—জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশবন,
নদীতট বালুকায় স্বর্ণ-কণিকা।

গভীর সুন্দর-বনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী
বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিদ্রাকুল।
শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবহেলে পা দু'খানি আগ্রহে শার্দ্দূল।

নব-বরষার চূর্ণ-জলদ-কুন্তল
উড়িয়ে—ছড়িয়ে পড়ে শ্রীমুখ আবরি'!

চাতকী ডাকিছে দূরে, শিখিনী চঞ্চল,
মেঘচন্দ্রে কৃষকের চিত্ত যায় ভরি'।

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
বসে' আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা।
নক্রকুল নত-তুণ্ড পড়ি' পদমূলে,
তুলি শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।

সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বদন-চন্দ্রমা।
বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে,
লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্গের শ্যামল সুষমা,
চরণ-অলক্তরাগ তড়াগে তড়াগে।

মূর্ত্তিমতি হ'য়ে, সতী, এসো ঘরে ঘরে,
রাখ' ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা পা দু'খানি।
ধান্য-শীর্ষ স্বর্ণ-ঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
ভুলে' যাই—সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি।

ছুটি নবোৎসাহে মাঠে ল'য়ে গাভীদলে,
হিমসিক্ত তৃণভূমি, শুভ্র পদ্মাদল ;
হরিদ্র ধান্যের ক্ষেত্রে, পীত রৌদ্র তলে
বিছায়ে দিয়েছ তব সুবর্ণ-অঞ্চল।

কুজ্ঝটি-সায়াহ্নে হেরি—মৃগযূথ সাথে
ছুটিছ নির্ঝর-তীরে চকিতা চঞ্চলা।

মদির মধুক-বনে ম্লান জ্যোৎস্না-রাতে
ল'য়ে তুমি ঋক্ষশিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা !

নিস্তব্ধ-জয়ন্তী-চূড়ে সান্দ্র অন্ধকার,
কণ্টকী লতায় গেছে গিরিভূমি ভরি' ;
গহ্বরে গহ্বরে বন্য-বরাহ ঘূৎকার,
বহিছে উত্তর বায়ু শিহরি' শিহরি'।

হেরি'—তুমি সাশ্রুনেত্রে, অবনত-শিরে
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী !
ভগ্নস্তূপে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে
খুঁজিছ পুত্রের কীর্ত্তি—অতীত কাহিনী !

অশোকে কিংশুকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর,
পিককণ্ঠ-কলতান উঠে দিকে দিকে ;
চূত-মুকুলের গন্ধে মরুত মন্থর,
এস হৃৎ-পদ্মাসনে, সর্ব্বার্থ-সাধিকে !

এস—চণ্ডীদাস গীতি, শ্রীচৈতন্যপ্রীতি,
রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি !
প্রতাপ-কেদার-বাপ্পা, গনেশ সুকৃতি
মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বঙ্কিম-জননী !

—অক্ষয়কুমার বড়াল

৮১

মানব বন্দনা

নমি আমি প্রতি জনে,—আদ্বিজ চণ্ডাল,
প্রভু, ক্রীতদাস,
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু
সমগ্রে প্রকাশ।
নমি কৃষি, তন্তুজীবী, স্থপতি, তক্ষণ,
কর্ম্ম-চর্ম্মকার,
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড দৃষ্টি-অগোচরে
বহ অদ্রিভার।
কত রাজা, কত রাজ্য গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়,
একত্রে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—
আত্মার আত্মীয়।

—অক্ষয়কুমার বড়াল

৮২

প্রকৃতি জননী

প্রকৃতি-জননী—জননী!
করিয়া তোমার স্তনসুধাপান
পরাণে জাগিছে নূতন পরাণ;
নব শোণিত, নূতন নয়ান,
নূতন মধুর ধরণী!

কি গভীর সুখ তোমাতে !
উদার পরাণ, নাহি পর কেহ,
উথলি' উছলি' বহিছে কি স্নেহ !
বিলায়ে ছড়ায়ে আপনারে দেহ,
কত কুড়াইব দু' হাতে।

কি মধুর গন্ধ বাতাসে !
নিশা সর-সর, বন মর-মর,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া বহিছে নিঝর ;
গ্রামে গ্রামে গ্রামে উঠে কুহুস্বর,
স্বপনের স্তব আকাশে !

দেহ মন প্রাণ শিহরে !
তরল আঁধার চিবি চিবি চিরি,
উষাব আলোক কাঁপে ধীরি ধীবি,
স্থির মেঘচ্ছবি—হিমালয গিবি,
রজতের রেখা শিখরে !

নয়ন আব যে ফিরে না !
ভুলে গেছে মন—আপনার কথা,
আপনার দুখ, আপনার ব্যথা ;
প্রাণ পায় যেন প্রাণের বারতা,
বুকে যে স্বপন ধরে না।

মিটেনা মিটেনা পিয়াসা !
ম্লান শশিকলা শ্বেত মেঘে পড়ি',
তরুণ অরুণে কি রঙ্গিমা মরি !
গিরি-শির হ'তে পড়ে ঝরি' ঝরি'
তরুণ অলস কুয়াসা।
তুলিছে দ্যুলোক আলোকে।
জ্বল জ্বল জ্বল ধবল শিখরী,
কত না স্বরগ লুকান ভিতরি।
কত না অমর—কত না অমরী
ধরা পানে চায় পুলকে।
কি মধুর ধরা, আ-মরি !
দূরে দূরে গৃহ, চিত্রে যেন লেখা,
চূড়ায় চূড়ায় উঠে ধূম-শিখা ;
কুল-ভূমে নাচে বালক বালিকা,
তৃণ-ভূমে চরে চমরী।
গগনে কি মেঘ-কাহিনী।
বনছায়-ছায় উচলায় ধরা ;
তরুলতা গুল্ম ফলে ফুলে ভরা,
স্বর্ণ-শীর্ষ ক্ষেত্র।—দেছ যবে ধরা,
আর ছাড়িব না, জননী।

—অক্ষয়কুমার বড়াল

৮৩

দুরন্ত আশা

মর্ম্মে যবে মত্ত আশা সর্প-সম ফোঁসে
অদৃষ্টের বন্ধনেতে দাপিয়া বৃথা রোষে,
তখনো ভালোমানুষ সেজে, বাঁধানো হুঁকা যতনে মেজে
মলিন তাস সজোরে ভেঁজে খেলিতে হবে ক'সে।
অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব,
জন-দশেকে জটলা করি তক্তপোষে ব'সে।

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়, পোষ-মানা এ প্রাণ।
বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হোলেই মিষ্ট অতি, মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্ট-গতি, গৃহের প্রতি টান.
তৈল ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোট বহরে বড় বাঙালী-সন্তান!

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন।
চরণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন,—
ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি, জীবন-স্রোত আকাশে ঢালি'
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি' চলেছি নিশিদিন;
বরশা হাতে ভরসা প্রাণে সদাই নিরুদ্দেশ—
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধাহীন।

বিপদ মাঝে ঝাঁপায়ে প'ড়ে শোণিত উঠে ফুটে,
সকল দেহে সকল মনে জীবন জেগে উঠে।
অন্ধকারে সূর্য্যালোকে সন্তরিয়া মৃত্যুস্রোতে
নৃত্যময় চিত্ত হ'তে মত্ত হাসি টুটে।
বিশ্বমাঝে মহান্ যাহা, সঙ্গী পরাণের,
ঝঞ্ঝামাঝে ধায় সে প্রাণ সিন্ধুমাঝে লুটে।

দাস্যসুখে হাস্যমুখ, বিনীত জোড় কর,
প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবর।
পাদুকাতলে পড়িয়া লুটি' ঘৃণায়-মাখা অন্ন খুঁটি'
ব্যগ্র হ'য়ে ভরিয়া মুঠি যেতেছ ফিরি' ঘর।
ঘরেতে ব'সে গর্ব্ব করো পূর্ব্বপুরুষের,
আর্য্য-তেজ-দর্পভরে পৃথ্বী থর থর ;

হেলায়ে মাথা, দাঁতের আগে মিষ্টহাসি টানি'
বলিতে আমি পারিব না তো ভদ্রতার বাণী।
উচ্ছ্বসিত রক্ত আসি' বক্ষতল ফেলিছে গ্রাসি'
প্রকাশহীন চিন্তারাশি করিছে হানাহানি।
কোথাও যদি ছুটিতে পাই বাঁচিয়া যাই তবে,
ভব্যতার গণ্ডিমাঝে শান্তি নাহি মানি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৪

বধূ

"বেলা যে প'ড়ে এল', জল্‌কে চল্‌!"—
পুরাণো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে
কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে-জল,
কোথা সে বাঁধা-ঘাট, অশথ-তল।
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে "জল্‌কে চল্‌!"
কলসী ল'য়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূ ধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দীঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু'ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে,
কোকিল ডাকে তীরে অমিয়-মাখা।
আসিতে পথে ফিরে, আঁধার তরু-শিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা॥
অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি'
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি'।
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।

প্রাচীর বেয়ে বেয়ে   সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনী ফুলে-ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি   আড়ালে ব'সে থাকি
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি॥

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এধারে পুরাতন   শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁসে।
বাঁধের জলরেখা   ঝলসে যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি   কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।

হায়রে রাজধানী পাষাণ-কায়া।
বিরাট মুঠিতলে   চাপিছ দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া?
কোথা সে খোলা মাঠ,   উদার পথ ঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া!
কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে;
খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে।
হেথায় বৃথা কাঁদা,   দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।

আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে।
অবাক্ হয়ে সবে কারণ খোঁজে।
"কিছুতে নাহি তোষ, সেও তো মহাদোষ
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ও যে!
স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি
ও কেন কোণে ব'সে নয়ন বোজে?"
কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ,
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ্ করে সবে, করে না স্নেহ। ৫০
সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন ক'রে কাটে সারাটা বেলা!
ইঁটের পরে ইঁট মাঝে মানুষ-কীট,
নাইকো ভালোবাসা নাইকো খেলা।
কোথায় আছ তুমি কোথায় মাগো?
কেমনে ভুলে তুই আছিস্ হাঁগো!
উঠিলে নব শশী, ছাদের 'পরে বসি'
আর কি রূপকথা বলিবি না গো!
হৃদয়-বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি মা, আঁখিজলে রজনী জাগো!
কুসুম তুলি' ল'য়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো! ৬২

হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে।
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে
যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে!

নিমেষ তরে তাই আপনা ভুলি'
ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি'।
অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে,
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি'।

দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো!
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।

ডাক্‌লো ডাক্ তোরা, বল্‌লো বল্—
"বেলা যে পড়ে এল', জল্‌কে চল্।"
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস যদি কেহ আমায় বল!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৬

পদ্মা

আজি মেঘমুক্ত দিন, প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো, সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে। ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে। অর্দ্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘজলচর
রৌদ্র পোহাইছে। ভাঙ্গা উচ্চতীর,
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ-তরু প্রচ্ছন্ন কুটীর,
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষ্ণার্ত্ত জিহ্বার মতো। গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠ-মগন
করিছে কৌতুকালাপ। উচ্চ মিষ্ট হাসি
জলকলস্বরে মিশি পশিতেছে আসি
কর্ণে মোর। বসি এক বাঁধা নৌকা' পরি
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি'
রৌদ্রে পিঠ দিয়া। উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার

কলহাস্যে, ধৈর্য্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহজ্বালাতন।
তরী হতে সম্মুখেতে দেখি দুই পার,
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্ম্মল বিস্তার,
মধ্যাহ্ন-আলোক-প্লাবে জলে স্থলে বনে
বিচিত্র বর্ণের রেখা। আতপ্ত পবনে
তীর-উপবন হতে কভু আসে বহি'
আম্রমুকুলের গন্ধ, কভু রহি রহি
বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বর।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৬

বঙ্গমাতা

পুণ্যপাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত্ত বঙ্গভূমি, নব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু ক'রে আর রাখিয়ো না ধ'রে।
দেশদেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভাল ছেলে ক'রে। ৮

প্রাণ দিয়ে, দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী ক'রে, মানুষ করো নি॥ ১৪

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৭

পূজারিণী

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পাদ-নখ-কণা তাঁর।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ-কাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ
শিল্পশোভার সার।
সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি'
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন, ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপপদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনক প্রদীপমালা। ১৩

অজাতশত্রু রাজা হ'লো যবে
পিতার আসনে আসি'
পিতার ধর্ম্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হ'তে
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি। ১৯

কহিল ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে—
"বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার—
ভুলিলে বিপদ হবে।" ২৫

সেদিন শারদ-দিবা অবসান,
শ্রীমতী নামে সে দাসী,
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া,
পুষ্প প্রদীপ থালায় বাহিয়া,
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া,
নীরবে দাঁড়াল আসি' ৩১

শিহরি' সভয়ে মহিষী কহিলা—
"একথা নাহি কি মনে
অজাতশত্রু করেছে রটনা,
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা

শূলের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্ব্বাসনে ?” ৩৭
সেথা হ’তে ফিরি’ গেল চলি’ ধীরে
বধূ অমিতার ঘরে।
সম্মুখে রাখিয়া স্বর্ণ-মুকুর,
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদূর
সীমন্ত-সীমা পরে। ৪৩
শ্রীমতীরে হেরি’ বাঁকি’ গেল রেখা
কাঁপি’ গেল তার হাত,—
কহিল, “অবোধ, কী সাহস-বলে
এনেছিস্ পূজা, এখনি যা চ’লে,
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তাহ’লে
বিষম বিপদ্‌পাত!” ৪৯
অস্ত-রবির রশ্মি-আভায
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি’ একাকিনী,
পড়িতে নিরত কাব্য-কাহিনী,
চমকি’ উঠিল শুনি’ কিঙ্কিণী
চাহিয়া দেখিল দ্বারে। ৫৫
শ্রীমতীরে হেরি’ পুঁথি রাখি’ ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে।

কহে সাবধানে তা'র কানে কানে,—
"রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমন ক'রে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে!" ৬১
দ্বার হ'তে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্যথালি।
"হে পুরবাসিনী," সবে ডাকি কয়,—
"হ'য়েছে প্রভুর পূজার সময়"—
শুনি' ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তা'রে গালি। ৬৭
দিবসের শেষ আলোক মিলালো
নগর-সৌধপরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হ'য়ে এলো ক্ষীণ,
আরতি ঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজ-দেবালয় ঘরে। ৭৩
শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমির,
তারা অগণ্য জ্বলে।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
"মন্ত্রণাসভা হ'লো সমাধান"—
দ্বারী ফুকারিয়া বলে। ৭৯

এমন সময়ে হেরিলা চমকি'
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কানন মাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন, যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মতো। ৮৫

মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি'
শুধাল—"কে তুই ওরে দুর্ম্মতি,
মরিবার তরে করিস্ আরতি!"
মধুর কণ্ঠে শুনিল—"শ্রীমতী
আমি বুদ্ধের দাসী!" ৯১

সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে
পড়িল রক্ত-লিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ-কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা। ৯৭

—রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

৮৮

ভারত-তীর্থ

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর,
নদী-জপমালা ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা,
দুর্ব্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে,
সমুদ্রে হ'ল হারা।
হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন,

শক হুন-দল পাঠান মোগল
　　এক দেহে হ'ল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
　　যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহা মানবের
　　সাগর-তীরে ॥
রণধারা বাহি' জয়গান গাহি'
　　উন্মাদ কলরবে
ভেদি' মরুপথ গিরি-পর্ব্বত
　　যারা এসেছিল সবে,
তা'রা মোর মাঝে সবাই বিরাজে—
　　কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোনিতে রয়েছে ধ্বনিতে
　　তা'র বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি' দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তা'রাও আসিবে,
　　দাঁড়াবে ঘিরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
　　সাগর-তীরে ॥

হেথা একদিন বিরামবিহীন
　　মহা ওঙ্কারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
　　উঠেছিল রণরণি'।
তপস্যা-বলে একের অনলে
　　বহুরে আহুতি দিয়া,
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
　　একটি বিরাট্ হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
　　যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হ'বে মিলিবারে
　　আনত শিরে,
এই ভারতের মহা-মানবের
　　সাগর-তীরে॥
সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে
　　দুখের রক্তশিখা,
হবে তা সহিতে মর্ম্মে দহিতে
আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন করো মোর মন,
　　শোনো রে একের ডাক,
যত লাজ ভয় করো করো জয়
　　অপমান দূরে যাক্।

দুঃসহ ব্যথা হ'য়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ !
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহা মানবের
সাগর-তীরে ॥
এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃস্টান !
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমানভার ।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থ-নীরে ।
আজি ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮৯

বিদায়

তবে আমি যাই গো তবে যাই,
ভোরের বেলা শূন্য কোলে
ডাকবি যখন খোকা ব'লে,
বলব আমি—নাই সে খোকা নাই ;
মাগো যাই।
হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হ'য়ে
যাব মা তোর বুকে ব'য়ে,
ধ'রতে আমায় পারবিনে তো হাতে।
জলের মধ্যে হব মা ঢেউ,
জানতে আমায় পারবে না কেউ,
স্নানের বেলা খেলব তোমার সাথে।
বাদলা যখন পড়বে ঝ'রে
রাতে শুয়ে ভাববি মোরে,
ঝর্‌ঝরানি গান গাব ঐ বনে।
জানলা দিয়ে মেঘের থেকে
চমক্ মেরে যাব দেখে,
আমার হাসি পড়বে কি তোর মনে ?
খোকার লাগি' তুমি মাগো
অনেক রাতে যদি জাগো
তারা হ'য়ে বলব তোমায়, "ঘুমো" ;

তুই ঘুমিয়ে পড়লে পরে
জ্যোৎস্না হয়ে ঢুকব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাবো চুমো ॥ ২৩

স্বপন হ'য়ে আঁখির ফাঁকে,
দেখতে আমি আসব মাকে,
যাব তোমার ঘুমের মধ্যিখানে,
জেগে তুমি মিথ্যে আশে,
হাত বুলিয়ে দেখবে পাশে,
মিলিয়ে যাব কোথায় কে তা জানে ॥ ২৯

পূজোর সময় যত ছেলে
আঙিনায় বেড়াবে খেলে,
ব'লবে—খোকা নেই-যে ঘরের মাঝে।
আমি তখন বাঁশির সুরে
আকাশ বেয়ে ঘুরে ঘুরে
তোমার সাথে ফিরব সকল কাজে ॥ ৩৫

পূজোর কাপড় হাতে ক'রে
মাসী যদি শুধায় তোরে,
"খোকা তোমার কোথায় গেল চ'লে ?
বলিস, খোকা সে কি হারায় ;
আছে আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে ॥ ৪১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯০

শারদ প্রভাতে

গিরি-বন-নদী রঞ্জিয়া রবি
ফুটায়ে ধরায় সুহাসি।
হেরি' সে ফুল্ল প্রভাতের ছবি
আমার চিত্ত উদাসী।

প্রবাসের বাসে মানস-নেত্রে
নেহারি তোমারে, বঙ্গ !
সমতল ভূমে ধান্য-ক্ষেত্রে
অতুল শ্যামল অঙ্গ।

নাহিক এমন তটিনী সেথায়
উপলে ত্বরিত চরণা ;
ভূধরে চরণে তরুর ছায়ায়
নাচে না এমন ঝরণা।

নাহি ত সেথায় নিবিড় বিজন
বিশাল বনের গরিমা।
তবু ভালবাসি, বঙ্গ ভুবন,
তোমার শারদ প্রতিমা।

ভূষহ পদ্মে কুমুদে অঙ্গ
হে সর, হরষে বঙ্গে ;
কাদামাখা জলে তোল তরঙ্গ
বঙ্গ-পাবনি গঙ্গে !

দুলাও ধরণী ; হরিৎ বসন,
গাহ বিহঙ্গ প্রভাতে
শেফালি-গন্ধে আমোদি ভবন
এস উৎসব ধরাতে ।

গ্রামে গ্রামে আর নগরে নগরে
জাগ রে সুখ আনন্দ !
হেথায় পবন, বহিয়া আন রে
দূর উৎসব-গন্ধ ।

রঞ্জি প্রবাস, ওগো কল্পনে,
মানস-আলোক-প্রভাতে,
বঙ্গের শোভা এ দূর ভবনে
বিকাশ শারদ প্রভাতে ।

—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

৯১

ভারতবর্ষ

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে, "জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ;
গাহিল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"
সদ্যঃ-স্নান-সিক্ত-বসনা চিকুর সিন্ধুশীকর-লিপ্ত;
ললাটে গরিমা বিমল হাস্যে অমলকমল-আনন দীপ্ত;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে—তপন-তারকা-চন্দ্র।
মন্ত্রমুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ-মন্দ্র।
শীর্ষে শুভ্র তুষার-কিরীট, সাগর-ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা;
বক্ষে তুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু, যমুনা, গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।

* * *

জননি! তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি;
জননি! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ!
জগৎপালিনি! জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৯২

সমুদ্র

আবার সে গম্ভীর গর্জ্জন ; চারি ধার
সেই নীল জলরাশি ; দিগন্ত প্রসার
বারি-বক্ষ ; সেই অন্ধ মত্ত আস্ফালন ;
সেই ক্রীড়া ; সেই উচ্চ হাস্য ; সে ক্রন্দন ;
উত্তাল তরঙ্গ সেই ; উদ্দাম উচ্ছ্বাস ;
সেই বীর্য্য ; সেই দর্প ; সেই দীর্ঘশ্বাস ! ৬
হে সমুদ্র ! সপ্ত বর্ষ পরে এ সাক্ষাৎ
তোমার আমার সঙ্গে। ঘাত প্রতিঘাত
গিয়াছে বহিয়া কত আমার হৃদয়ে ;
বয়ে গেছে ঝঞ্ঝা কত, শোকে দুঃখে ভয়ে,
নৈরাশ্যে ;—এ সপ্ত বর্ষে জীবনে আমার।
নুইয়া দিয়াছে সেই সপ্ত-বর্ষ-ভার
জীবনের মেরুদণ্ড ; করি' খর্ব্বতা'র
উদ্দাম, উল্লাস, তেজ, গর্ব্ব প্রতিভার। ১৪
কিন্তু তুমি চলিয়াছ দর্পে— সেই মত
কল্লোলিয়া। কাল করে নাই প্রতিহত
তোমার প্রভাব ; রেখা আনে নাই দেহে ;
শুষে নেয় নাই মজ্জা—সেইরূপ খেয়ে
উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গে, মেঘমন্দ্রে বারি-
বক্ষ, বীরদর্পে দিক্‌দিগন্ত প্রসারি'

তুমি চলিয়াছ। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ ;
নিম্নে চলিয়াছে তব একই ইতিহাস।
এত তুচ্ছ করেছিলে মানব-জীবন
পরমেশ! এই ক্ষুদ্র ক্ষীণ আয়োজন ;
তাও এত বিবর্ত্তনশীল! যেই মত
সন্ধ্যার প্রাক্কালে, বর্ণ ভিন্ন হয় যত—
রক্ত, পীত, পিঙ্গল, ধূসর, পরিণত
শেষে কৃষ্ণে ; মানব জীবনে, সেই মত,
আসে বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ; পরে হায়,
সব শেষে সেই কৃষ্ণ মরণে মিশায়!
সপ্ত-বর্ষ পরে আজি, সমুদ্র, আবার
দেখিতেছি আন্দোলিত সে মহাপ্রসার ;
শুনিতেছি সে কল্লোল ; করিতেছি স্পর্শ
তোমার শীকর-পৃক্ত বায়ু।—এ কি হর্ষ ;
কি উল্লাস! মুদ্রা-লুব্ধ স্বার্থপূর্ণ হৃদি,
ছাড়ি' নীচ ক্রয় ও বিক্রয়,—জলনিধি,
মিশিয়াছে নিখিলের সঙ্গে যেন আসি',
হেরি' তব অসীম বিতত জলরাশি।
আমি দেখিতেছি শুক্লপক্ষ প্রথমার
নিশীথে, নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে, পারাবার!
তোমার এ মত্ত ক্রীড়া। যখন অবনী
ঘুমায়, উঠিছে ঐ হাহাকার ধ্বনি ;

চলেছে ও আস্ফালন। হৃদয়ে তোমার
বহিছে ঝটিকা যেন ;—প্রবল ঝঙ্কার
নিষ্পেষণে মুহুর্মুহুঃ মেঘ-মন্দ্র সম
উঠে মহা আর্ত্তনাদ ; বিদ্যুদ্দামোপম
জ্ব'লে উঠে রেখায়িত ফেনা সমুচ্ছ্বাসি'
পিঙ্গল আলোকে দীপ্ত করি' জলরাশি।
কি প্রকাণ্ড অপচয় এ বিশ্বসৃষ্টির—
এই নীল বারিরাশি ; এ নিত্য অস্থির
সমুচ্ছ্বাস—শক্তির কি নিরর্থক ব্যয় ;
এ গর্জ্জন, আস্ফালন, ব্যর্থ সমুদয়।
কিংবা চলিয়াছ সিন্ধু ! গর্জ্জি, আর্ত্তনাদি',
সেই চিরন্তন প্রশ্ন—"কোথা ? কোথা আদি ?"
কোথা অন্ত ? কোথা হ'তে চলেছি কোথায় ?"
উৎক্ষেপিয়া ঊর্ম্মিরাশি আঁকড়িতে চায়
অনন্তেরে ; নিজ ভারে পরে নেমে আসে।
আবার ছড়ায়ে পড়ে, গভীর নিশ্বাসে,
প্রকাণ্ড আক্ষেপে,—বক্ষ'পরি আপনার,
ব্যর্থ বিক্রমের ক্ষুব্ধ অবসাদ ভার।
উপরে নির্ম্মল ঘন নীলাকাশ স্থির,
কোটি কোটি নক্ষত্রে চাহিয়া জলধির
নিষ্ফল চীৎকার, ক্ষুদ্র আস্ফালন 'পরে
রহে সে গভীর গাঢ় অনুকম্পাভরে।

দেখে পিতা যেমতি পুত্রের উপদ্রব ;
ঈশ্বর দেখেন যথা করুণা-নীরব
গাঢ় স্নেহে,—মানুষের দম্ভ অভিমানে ;
—আছে সে চাহিয়া ক্ষুব্ধ জলধির পানে।
কি গাঢ় ও নীলাকাশ ! কি উজ্জ্বল, স্থির !
নক্ষত্র বেষ্টিয়া চতুষ্প্রান্ত জলধির।
যাহা ধ্রুব, সত্য ; যাহা নিত্য ও অমর ;
তাহা বুঝি এরূপই স্থির ও ভাস্বর। ৭২

-দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৯৩

হ'তে পাত্তেম

দেখ, "হ'তে পাত্তেম" নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর
কেবল—ঐ গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয় না স্থির।
আর ঐ বারুদটার গন্ধ, তেমন করিনে পছন্দ,
আর সঙ্গীন খাড়া দেখলেই মনে লাগে একটু ধন্দ ;
খোলা তলোয়ার দেখলেই ঠেকে মনে শিরোহীনের স্কন্ধ।
তাই বাক্যেই বীর রয়ে গেলাম আমি চ'টে মোটেই ত।
তা নইলে খুব এক বড়—হাঁ তা বটেই তো, তা বটেই তো।" ৭

"দেখ, হ'তে পাত্তেম নিশ্চয় একটা প্রত্নতত্ত্ববিদ্
কিন্তু গবেষণা শুন্‌লেই হয় আতঙ্ক উপস্থিত!
আর দেশটাও বেজায় গরম, আর বিছানাও বেশ নরম
আর তাও বলি, নিদ্রাদেবীর টানটুকু চরম ;
আর তারই চর্চ্চা কল্লে একটু কাজও দেখে বরং ;
তাই নিদ্রা-তত্ত্ব নিয়ে রইলেম চ'টে মোটেই তো।"
"হাঁ তা বটেই তো, তা বটেই তো।" ১৪
"দেখ, হ'তে পাত্তেম নিশ্চয় একটা উঁচুদরের কবি,
কিন্তু লিখ্‌তে বল্লেই অক্ষরগুলো গরমিল হয় যে সবই,
আর ভাষাটাও তা ছাড়া, মোটে বেঁকেনা, রয় খাড়া ;
আর ভাবের মাথায় লাঠি মারলেও দেয়নাকো সে সাড়া
হাজারি পা'দুলাই, গোঁফে হাজারি দিই চাড়া ;
তাই নীরব কবি হ'য়ে রইলেম চ'টে মোটেই তো।
তা নইলে খুব এক উঁচু",—"তা বটেই তো, তা বটেই তো।" ২১
"দেখ ক্ষমতাটা,—তা ছিলনাক অমন্দ বিশেষ,
কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চলে যেতাম বেশ ;
হতাম পেলে সুযোগ, এ, ও, বুঝি একটা যেও সেও,
কেষ্ট, বিষ্টুর মধ্যে আমি হ'তেম নিঃসন্দেহ,—
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটা আমায় দিলনাক কেহ ;
তাই যা ছিলাম তাই রয়ে গেলাম চ'টে মোটেই তো।
তা নইলে বুঝলে কিনা"—"হাঁ তা বটেই তো, তা বটেই তো॥" ২৮

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৭৪

সেথা আমি কি গাহিব গান

সেথা আমি কি গাহিব গান ?
যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সাম-ঝঙ্কারে,
কাঁপিত দূর বিমান।
যেথা, স্বরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্রকমলাসীনা,
রোধি' তটিনী-জল-প্রবাহ,
তুলিত মোহন তান।
যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ,
করি' হরিগুণগান নারদ,
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন,
টলাইত ভগবান্।
যেথা, যোগীশ্বর-পুণ্যপরশে,
মূর্ত্ত রাগ উদিল হরষে ;
মুগ্ধ কমলাকান্ত-চরণে
জাহ্নবী জনম পান।
যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে
মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি' ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।
আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ ?

—রজনীকান্ত সেন

৯৫

জাগরণ

তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা ;
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভোনীলাঞ্চলা,
সৌম্য মধুর-দিবাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।
দূরে হেম চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য-পুলক-গীতি-মুখর-কলুষহর-তরঙ্গা ;

ধায় মত্ত-হরষে, সাগরপদ-পরশে,
কূলে কূলে করি' পরিবেষণ মঙ্গলময় বরষা।
ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিয়া,
আর্য্যগরিমা কীর্ত্তিকাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা, কণ্ঠে বিজয়মালিকা,
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা।

ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব্ব-গগনে,
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি', ডাকিছে সুপ্তি-মগনে ;
নিদ্রালস-নয়নে, এখনও র'বে কি শয়নে ?
জাগাও বিশ্ব পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।

—রজনীকান্ত সেন

৯৬

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

গঙ্গাসাগরের স্নানে পুণ্য বাঞ্ছা করি'
মহামূল্য হীরকের অলঙ্কার পরি',
নামিলেন শেঠ-পত্নী সাগরের জলে,
অকস্মাৎ অলঙ্কার পড়ে' গেল তলে ;

কাঁদি' শেঠ-পত্নী কহে, "তুমি রত্নাকর,
ভূষণ ফিরায়ে দেহ করুণা-সাগর !"
সিন্ধু কহে, "সিন্ধু-পোতে উঠি' তব স্বামী
দূরে যাক্, লক্ষগুণ ফিরে দিব আমি।"

—রজনীকান্ত সেন

৯৭

আমি যাহা চাই

আমি চাই মহতের মহৎ পরাণ।
মুকুতা মাণিক নিধি আমারে দিওনা বিধি !
চাইনে এ জগতের রাজত্ব-সম্মান ;
বাঞ্ছিত পরাণ পেলে, প্রাণটুকু দিয়া ঢেলে'
মেগে' নেব মনুষ্যত্ব—শ্রেষ্ঠ উপাদান।
প্রাণের সাধক আমি, সাধনীয় প্রাণ।

আমি চাই শিশু-হেন উলঙ্গ পরাণ,—
মুখে মাখা সরলতা, কয়না সাজানো কথা,
জানেনা যোগাতে মন করি' নানা ভান ;
প্রাণ খোলা, মন খোলা, আপনি আপনা-ভোলা,
আর স্নেহ প্রীতি সবি হৃদয়ের টান ।
আমি চাই স্বরগের উলঙ্গ পরাণ । ১২

আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ,
পবিত্র—উষার রবি, কোমল—ফুলের ছবি,
মধুর—বসন্ত-বায়ু, পাপিয়ার গান ;
আনন্দে—শারদ ইন্দু, গাম্ভীর্য্যে—অতল সিন্ধু,
পূর্ণ—বরষার বিল ভরা কানেকান,—
আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ ! ১৮

আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ ।
পায়ে ঠেলে তোষামোদ, নীচতার অনুরোধ ;
তার ব্রত—সত্যরক্ষা সত্যানুসন্ধান ;
চাহেনা নিজের ইষ্ট, অতুল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ
ধরা প্রতিকূল হ'লে নহে কম্পমান ;
জীবন-সংগ্রামে নিত্য বিজয়ী তাহার চিত্ত,
অনন্তে উড়িছে তার বিজয়-নিশান !
আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ । ২৬

আমি যাহা চাই

আমি চাই জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ,—
ছিঁড়িয়াছে মোহপাশ, ছয় রিপু চির দাস,—
নরনারী ভাই বোন, নাহি অন্যজ্ঞান ;
চাহিতে মুখের পানে সঙ্কোচ আসে না প্রাণে,
কি যেন দেবত্ব মাখা সে পূত বয়ান !
আমি চাই জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ। ৩২

পরে সদা ভালবাসে, পরের সুখের আশে
চির আত্ম বিসর্জ্জন, চির আত্মদান।
ব্যথিতে পড়িলে মনে ধারা বয় দুনয়নে,
হৃদিতলে সদা চলে প্রেমের তুফান।
সে নয় স্বতন্ত্র কেহ,— বিশ্বই তাহার গেহ,
সে সাধে আপনা দিয়ে ভবের কল্যাণ।
আমি চাই প্রেমিকের প্রেমিক পরাণ। ৪০

আমি চাই বিশ্বোদার উদার পরাণ,
অভেদ খ্রীষ্টান হিন্দু, দ্বেষ নাই এক বিন্দু,
নিরখে জগৎ-ভরা এক ভগবান্ ;
জ্ঞান সত্য নীতি পূজে, দলাদলি নাহি বুঝে,
সে জানে সকলে এক মায়ের সন্তান।
মরমে মহত্বপূর্ণ, হীনতা করেছে চূর্ণ,
হৃদয়ের ভাব সব উদার মহান্ ;

ন্যায়-তরে প্রিয়ত্যাগী, প্রীতিতে পরানুরাগী,
সমাদরে রাখে জ্ঞানী-গুণীর সম্মান ; ৪৯
অনুতপ্ত-অশ্রুধার কখনো সহেনা তার,
অনুতাপী পাপী পেলে পুণ্য করে দান ,
বিশ্বের উন্নতি-আশা, বিশ্বময় ভালবাসা,
বিশ্বের মঙ্গল সাধে করি' আত্মদান,
মরতে সে দেবোপম উপাস্য নমস্য মম,
বসুধা কৃতার্থা তারে কোলে দিয়ে স্থান,
আমি সাধি সাধনা সে দেবতার প্রাণ। ৫৬

—মানকুমারী বসু

৯৮

চাতক

সহিছে আঁধার কালো,
ঊষার নবীন আলো
দেখাইছে জগতের আধ আধ ছবি ;
এত ভোরে কোন্ পাখী !
গাহিছ ! আকাশে থাকি,
জাগাইয়া ধরাতল মাতাইয়া কবি ? ৬
মধুর কাকলী মুখে,
খেলিছ মনের সুখে,
হেরি ও মাধুরী মরি নয়ন জুড়ায় !

সুনীল গগন-কোলে,
কাঞ্চনের ফোঁটা দোলে !
সজীব কুসুম যেন পবনে উড়ায় !
কি জানি কি যোগ-বলে
স্বরগে যেতেছ চলে,
দেখি যেন থেকে থেকে জলদে লুকাও ;
দেবতার শিশুগুলি
খেলে যেথা হেলি দুলি,
কে তুমি তাদের সনে খেলিবারে যাও ?
চিনেছি চিনেছি আমি
ওই যে চাতক তুমি,
প্রভাতী কিরণ মেখে কর ঝলমল ;
নাচিছ তপন আগে,
জাগাইছ জীব-ভাগে,
সুললিত গানে মরি মাতায়ে ভূতল ।
শুনি ও অমৃত গীতি
কার না জনমে প্রীতি ?
কে যেন অমৃত ধারা ঢালিছে ধরায় ;
ছুটিছে অমৃতরাশি,
অমৃত-হিল্লোলে ভাসি,
অমৃত তুফানে যেন মন ভেসে যায় ।

হেন গান কোথা ছিল ?
কে তোমারে শিখাইল ?
কহরে চাতক ! মোরে সেই সমুদয় ;
আমি ত বুঝেছি এই,
জগত-জননী যেই,
তাঁহারি শিখানো গীত, আর কারো নয় !

যে সাজায় রামধনু,
যে হাসায় শশী ভানু,
অমল কমল যেই সলিলে ভাসায় ;
যাঁহার কৌশল বলে
গ্রহ তারা শূন্যে চলে,
তোমারে এহেন গীতি সেইরে শিখায় !

অমন মধুরে পাখি !
তাঁরেই ডাকিছ নাকি
স্বরগ-দুয়ারে উঠি পরাণ খুলিয়া ?
তুমি রে ! ডাকিছ যাঁরে,
আমি সদা ডাকি তাঁরে,
আমি ডাকি ধরাতলে হৃদয় ভরিয়া !

—মানকুমারী বসু

৯৯

ঊষার জাগরণ

কখন্ জাগিলে তুমি, হে সুন্দরী ঊষা !
রজনীর পার্শ্বে ছিলে স্বপন-মগন—
কখন্ করিলে তুমি স্বর্গ-বেশ-ভূষা ?
ললিত রাগিণী দিয়ে রঞ্জিলে গগন !

তোমারে আবরি' ছিল যে ঘোর রজনী
তিমির-কুন্তল তার বাঁধিলে যতনে ;
অধরে ভাতিছে হাস্য বিমল বরণী,
সরল নির্ম্মল সুখ কমল-নয়নে !

কোমল চরণে আসি' শিয়রে আমার
বুলাইলে আঁখি-'পরে কুসুমিত কেশ ;
চকিতে চাহিয়া দেখি অধর তোমার
আরক্ত আনন্দ-ভরা,—রজনীর শেষ !
পরশিয়া দেহে তব আলোক-অঞ্চল
নিদ্রাতুর হৃদি মোর পুলক-চঞ্চল !

—চিত্তরঞ্জন দাশ

১০০

প্রত্যাবর্ত্তন

ওরে পাখি, সন্ধ্যা হ'ল আয় রে কুলায় !
সমস্ত গগন ভ'রে
আঁধার পড়িছে ঝ'রে,
ওরে পাখি, অন্ধকারে নীড়ে ফিরে আয় !
বন্ধ কর্ পক্ষ তোর আয় রে কুলায় ।

যতক্ষণ ছিল আলো মেটেনি কি আশ ?
ওরে সারা দিন মান
তুই করেছিস্ পান
যত মধু ছিল ভরি' গগন আকাশ ;
এবে আলো সাঙ্গ হ'ল মেটেনি পিয়াস ?

ওরে আয়, ফিরে আয়, আপনার মাঝে,
ওরে বন্ধ কর পাখা,
অপূর্ব্ব আলোক-মাখা
অনন্ত গগনতল হেথায় বিরাজে !
ওরে আয়, ফিরে আয়, আপনার মাঝে ।

—চিত্তরঞ্জন দাশ

১০১

নীরস শীতের গৃহে আজি কে গাইল গান

নীরস শীতের গৃহে আজি কে গাইল গান,
মেলিয়া অলস আঁখি চমকি' উঠিল প্রাণ!
নব কিসলয়ে সাজি পরাণে উচ্ছাস ব'য়ে
তরুকুল উঠে জাগি বিচিত্র নিশান ল'য়ে ;
শীতল মলয় বায়
সুধীরে বহিয়া যায়,
নিশ্বাসে নিশ্বাসে করে ভূতলে সুরভি দান—
নীরস শীতের গৃহে আজি কে গাইল গান। ৮

অলস শয়ন ত্যজি পাখীরা জাগিল সব,
কোথা হ'তে ভেসে এল কত-কি যে সুধারব,
নন্দনের পথ ভুলে
সমীরণে দুলে দুলে
স্বপনে ভাসিয়ে এল কোকিলের কুহুতান—
নীরস শীতের গৃহে আজি কে গাইল গান। ১৪

সুদূর নিকুঞ্জ হ'তে শুনি যে এ কা'র বাঁশী,
আলো করি বনালয় ফোটে ফুল রাশি রাশি ;

সুবাসে মোহিত অলি
ফুলে ফুলে পড়ে ঢলি,
প্রজাপতি করে সুখে ফুলে ফুলে মধুপান—
নীরস শীতের গৃহে আজি কে গাইল গান ! ২৫

তুলিল কমল-মুখ, নলিনী হরষ মাখি' ;
নবীন তৃণের বনে হরিণী সঁপিল আঁখি ;
তটিনী গাহিল ধীরে,
জোছনা হাসিল নীরে,
চাঁদের বদন হ'তে হিমছায়া অবসান—
নীরস শীতের গৃহে আজি কে গাইল গান ! ২৬

নীরস শীতের গৃহে আজি কে গাইল গান,
মেলিয়া অলস আঁখি চমকি উঠিল প্রাণ !
আকাশে নবীন রবি,
প্রান্তরে নবীন ছবি,
নবীন নবীন সবি', নবীনে ডুবিল প্রাণ—
নীরস শীতের গৃহে আজি কে গাইল গান ! ৩২

— নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

১০২

ভাবপতঙ্গ

মনোবাতায়ন-তলে উড়ে আসে দলে দলে
ভাবরাশি পতঙ্গের প্রায়,
অশোক কিংশুক রাঙা ইন্দ্রধনু ভাঙা ভাঙা
বরণের বিচিত্র ছটায়,
স্বচ্ছ ক্ষীণ পক্ষ মেলি' কাঁপিয়া পড়িয়া হেলি'
এসে শুধু দেখা দিয়ে যায়—
ধরিতে, রাখিতে নারি হায় !

ওগো বাতায়ন-তলে হেন কি আলোক জ্বলে,
যার লাগি' আস বারবার ?
দেখা যদি দাও এসে, একাকী ফেলিয়া শেষে
ফিরে তবে কেন যাও আর ?
নয়ন, অধর, মম কক্ষ, বক্ষ—শিশুসম
এসো সবে কর' অধিকার,
নাহি ভয় অনল-শিখার !

—প্রিয়ম্বদা দেবী

১০৩

বিশ্ব-ব্যাপ্তি

আজিকে ঊষার মতো হৃদয় আমার
সৌন্দর্য্যে উঠেছে ফুটি, আলোকে গলিয়া
সবিতার পানে যেন রয়েছে চাহিয়া !

আজি বসন্তের রসে হৃদয় আমার
রোমাঞ্চ পুলক-ভরে উজ্জ্বল আবহে
আপনার সীমা লঙ্ঘি' বিশ্বপ্রাণে বহে !

আজি আকাশের সম পরাণ আমার
ঘেরিয়া—বেড়িয়া বুকে অখিল সৃষ্টিরে !
—কে তুমি দাঁড়ায়ে ওই বিশ্ব-পরতীরে !

—শশাঙ্কমোহন সেন

১০৪

জীবন-ভিক্ষা

(বুদ্ধদেবের প্রতি কিসাগোতমী)

"দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরি গো,
দুলালে আগলি' বক্ষে,
বিয়োগ-উৎস উষ্ণ সরিতে
দর-বিগলিত চক্ষে,

শত চুম্বনে মেলে না নয়ন,—
চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন !
অভাগী বিহগী দারুণ আহত
মরণ-শ্যেনের পক্ষে ।

স্তন-ক্ষীরধার অধরে বাছার
আজ কি লাগিছে তিক্ত ?
রসনা-প্রসূন কোন পরসাদ—
মধুরসে পরিষিক্ত !

মুখচম্পকে মরুর বর্ণ,
শুষ্ক অধর-কমল-পর্ণ ;—
কি পাপে আমার প্রাণের ইন্দু
সুধার বিন্দু-রিক্ত ?

অমরা-মাধুরী আধ আধ বুলি ;
কুন্দ বৃন্ত-ছিন্ন,
দন্ত-রুচিতে কই সে কান্তি
পুণ্য-হাসির চিহ্ন ?

জানি, প্রভু, তব পাণির পরশে,
ননীর পুতলি জাগিবে হরষে !
কোন্ পাষাণের বিষমাখা বাণে
এ নয়ন-মণি ভিন্ন ?

কানন হয়েছে আমার ভুবন
স্বখশশী রাহুগ্রস্ত,
ধাই দিশেহারা— রোদনের রোলে
ধ্বনিয়া উদয়-অস্ত।

যে দিকে তাকাই, বাছা মোর নাই।
প্রাণ দিলে যদি প্রাণ ফিরে পাই—
উড়িয়া উড়িয়া শ্মশানের ছাই
ভরিল বিকল হস্ত।

প্রভু, অবনীর এই পদ্ম-বেদীতে
হরিলে ত্রিতাপ-দুঃখ,
যাত্রা করেছ, দুরগম পথ
ক্ষুর-ধাব সম সূক্ষ্ম।

দিলে তপোবল, মহানির্ব্বাণ
কুমারে আমার কর প্রাণদান—”
লুটায় যুবতী বুদ্ধ-চরণে
আলু থালু কেশ রুক্ষ।

চাহেন শুদ্ধ সৌম্য, শান্ত
গৌতম ধ্যান-ভঙ্গে
অখিল-পাবন করুণা-জ্যোৎস্না
বরষি' বালক-অঙ্গে,—

নিমেষের তরে মেলিবে কি চোখ ?
উথলি' অরুণ-পুলক-আলোক,
নিবাবে আগুন কিসা-গোতমীর
শিশুহারা উৎসঙ্গে ?

কহেন বুদ্ধ, "কুমার তোমার
নীরব-সমাধি-মগ্ন,
বরণ করেছে চিরসুন্দর
মরণের মহালগ্ন ;
থাকে যদি কোথা অশোক আলয়,
ভিখ্‌ মাঙ্গি' আন সর্ষপ-চয়,
পরশে তাহার তুলিয়া উঠিবে
পরাণ-মৃণাল ভগ্ন।"

বিশাল পুরীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে,
কেহ নাহি দেয় ভিক্ষা ;
নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে,—
"শিখাইলে শেষ শিক্ষা ;
জিয়াতে চাহি না তনয়ে আমার,
ভবনে ভবনে উঠে হাহাকার—
হর জগতের বিরহ-আঁধার
দাও গো অমৃত-দীক্ষা।"

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

১০৫

আজ্‌কে রে মন ঘোমটা খোল

বন-কোকিলের ডাকের জবাব
দেয় শোনো ওই হর্‌বোলা ;
মেঘের কোলে তরল-তর
'অ্যাম্বারে' রি রঙ্‌গোলা !
পথের পাশে সবুজ ধানে
স্তরে স্তরে পাহাড়-পানে
ঢেউ চলেছে, মন গলেছে,
ছন্দে ভাষায় দেয় দোলা !
কাঁপছে ভোরের একতারাতে
রিনি ঝিনি স্বুর কোমল !
দুপুর-বেলা দীপক জ্বালে
কমল হীরের অমল দল।
সাঁঝ্-রূপসী চুপে চুপে
প্রণমে কোন্ বিরাট্ রূপে,
গালিয়ে সোনা শৈল-কোণে
অঞ্জলি দেয় ঝরণা-জল।
দুখ-ভোলানো বোল ফুটেছে,
উঠ্‌ছে তারি মৌন রোল,
লাজ-হরা এই বিজন পথে
আজ্‌কে রে মন ঘোমটা খোল !
যুগে যুগের বিস্মরণে
চিনেছি মোর প্রিয়জনে,
তা'রি হাসি তা'রি বাঁশী,
সেই করেছে প্রাণ-পাগল !

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

১০৬

চির নবীনতা

বছরের ফুল বাসি হয়ে গেল, চৈত্র-পাপড়ি পড়িল খসি',
রিক্ত-শস্য শূন্য ধরণী সন্ধ্যা-হাওয়ায় উঠিল শ্বসি';
মহাকাল গলে পদ্মবীজের মাল্য-গুটিকা জপের শেষে
মুদ্রিত-আঁখি রুদ্র তাহার পূজার অর্ঘ্য লভিল হেসে।

যে ফুল কুড়ায়ে সাজায়েছি ঘর, যে ফুলে যতনে ভরেছি ডালা,
যে ফুল তুলিয়া আপন খেয়ালে মনের মতন গেঁথেছি মালা,—
সে ফুল ঝরেছে ; সূত্রটি তারি গন্ধমাখা যা' দুলিছে গলে,
বাসনার তীরে বসি' আজি তারি তর্পণ করি নয়নজলে।

কত সুখসাধ কত অপরাধ কত আশা কত মধুর স্মৃতি
ডোরের মাঝারে বন্ধন হয়ে বক্ষে কেবলি বাজিছে নিতি,
যত-না পরশ যত-না গন্ধ যত রূপ যত বর্ণ ফুলে—
সবি কি স্বপ্ন সকলি কি মোহ—বন্ধনি শুধু সবার মূলে ?

নয় নয়, ওগো নয় তাহা নয়, বন্ধন যাহা মুক্তি তাই,
বৈশাখী বীজে শঙ্কর নিজে ফলায় তাহারই সত্তাটাই।
নূতন গন্ধে ভরে যে ভুবন, নূতন বর্ণে যে ফুল ফুটে,
নবীন হরষে প্রাণের পরশে মাল্যে ফিরি' তা ভরিয়া উঠে।

পিঙ্গল আঁখি কালবৈশাখী যতই হানুক ভ্রান্তি ভয়,
অতীতের বল—হয় তা সফল তারি মাঝে করি মৃত্যু জয় ;
নূতনের ফুল আজি যা মুকুল—উঠে তা ফুটিয়া মেলিয়া দল,
অর্ঘ্যের সাজি ভরে সে আবার লভি বেদনার অশ্রুজল।

বছরের ফুল বাসি হয় যাহা, মহাকাল গলে লভিয়া ঠাঁই
পদ্মমালার গুটিকারই মত আবার ফিরিয়া আসিবে তাই।
আশা-নিরাশায় হরষে-ব্যথায় ফুটে যার লীলা কমল-দলে
ভাল বা মন্দ, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব অর্পিণু তাঁরি চরণতলে। ২৪

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

১০৭

আমার স্বর্গপুরী

ঐ যে গাঁ-টি যাচ্চে দেখা 'আইরি' ক্ষেতের আড়ে
প্রান্তটী যার আঁধার-করা সবুজ কেয়াঝাড়ে,
পূবের দিকে আম-কাঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা,
জটলা করে যাহার তলে রাখাল-বালকেরা—
ঐটি আমার গ্রাম—আমার স্বর্গপুরী,
ঐখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি! ৬

বাঁশ বাগানের পাশটি দিয়ে পাড়ার পথটি বাঁকা,
পথের ধারে গলাগলি সজ্‌নে গাছের শাখা,
গোরুর গাড়ীর চাকায় পথে শুকায়নাক কাদা,
কোথাও বা তার বেড়ার পাশে আবর্জ্জনার গাদা;—
তবু আমার জন্মভূমি স্বর্গপুরী,
বিশ্ব-শোভা ঐখানেতে গেছে চুরি! ১২

যত দেশের যত পাখী ঐ গাঁয়ে কি আছে!
ঝোপে-ঝাড়ে বেড়ায় উড়ে' বাসার কাছে কাছে;

পথের পাশে গাছের ডগা নুইয়ে পড়ে গায়ে
চল্‌তে গেলেই শুক্‌নো পাতা মাড়াই পায়ে-পায়ে ;—
        বনে-ভরা এমনি আমার স্বর্গপুরী
        তবু আমার চিত্ত সেথায় গেছে চুরি !

পদ্মদীঘি কোথায় পা'ব—পদ্ম নাইক মোটে,
চৈৎ-বোশেখে শুকিয়ে ওঠে, জলটুকু না জোটে !
পানায়-মরা ডোবায় ভরা, সিদ্ধি গাছে ছাওয়া,
ভাঁট-পিঠিলির জঙ্গলেতে হাঁপিয়ে বেড়ায় হাওয়া—
        এমনি আমার স্বর্গছাড়া স্বর্গপুরী,
        স্বর্গশোভা তবু সেথায় গেছে চুরি ।

পাঠশালাটিও নাইক গাঁয়ে—নাই কোনো ডাকঘর,
কোথায় বদ্দি, যদিও কম্‌তি নয়ক বড় জ্বর ,
রাজার প্রাসাদ নাইক সেথা, ধনীর দেবালয়,
সজ্জাহীনের লজ্জা নাইক, দারিদ্র্যে নাই ভয় ;—
        সৃষ্টিছাড়া এম্‌নি আমার স্বর্গপুরী
        সকল অভাব তবু সেথায় গেছে চুরি !

তবু ওঠে কুমোর-পাড়ায় কদমতলার ধারে
সঙ্কীর্ত্তনের মধুর-গীতি সন্ধ্যে অন্ধকারে ;
সবাই যেন স্বাধীন সুখী, বাধা-বাঁধন-হারা—
আবাদ করে, বিবাদ করে, সুবাদ করে তারা ;
        এমনি আমার সাদাসিধে স্বর্গপুরী
        তাইত আমার মনটি সেথায় গেছে চুরি !

শোভা বল', 'স্বাস্থ্য বল'—আছে বা না আছে,
বুকটি তবু নেচে উঠে এলে গাঁয়ের কাছে ,
ঐ খানেতে সকল শান্তি, আমার সকল সুখ—
বাপের স্নেহ, মায়ের আদর, ভায়ের হাসিমুখ ;—
তাইত আমার জন্মভূমি স্বর্গপুরী,
যেথায় আমার হৃদয়খানি গেছে চুরি ! ৪২

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

১০৮

মাটি

এই যে মাটি—এই যে মিঠা—এই যে চির চমৎকার,—
চরণে লীন, এই যে মলিন—এই যে আধার নিরাধার,—
এই মাটি গো, এই পৃথিবী—এই যে তৃণ-গুল্মময়,—
তারার হাটে মাটির ভাঁটা,—তাই ব'লে এ তুচ্ছ নয় । ৪
মাটি তো নয়—জীবন কাঠি,—কণায় কণায় জীবন তার,—
মাটির মাঝে প্রাণের খেলা,—মাটিই প্রাণের পারাবার !
মাটি তো নয়—মায়ামুকুর—এক পিঠে তার লীলার খেল,
আর একটি দিক্ অন্ধ-অসাড়, রশ্মিঘাতে অনুদ্বেল ! ৮
মাটিই আবার মরণ-কাঠি, মাটির কোলে উদয়-লয়,
যে মাটিতে ভাঁড় গড়ে রে তাতেই মানুষ মানুষ হয় !
মাটির মাঝে যা' আছে গো সূর্য্যেও তার অধিক নেই,
তড়িৎ-সূতার লাটাই মাটি, জীবন-ধারার আধার সেই ! ১২

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১০৯

হায় !
বসন্ত ফুরায় !
মুগ্ধ মধু মাধবের গান
ফল্গু সম লুপ্ত আজি, মুহ্যমান প্রাণ।
অশোক নির্ম্মাল্য-শেষ, চম্পা আজি পাণ্ডু হাসি হাসে,
ক্লান্ত কণ্ঠে কোকিলের যেন মুহুর্ম্মুহু কুহুধ্বনি নিবে নিবে আসে !
দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জ্বল জাঙ্গল-অনিমিখ
নিঃশ্বসিছে নিঃস্ব হাওয়া, হুতাশে মূর্চ্ছিত দশদিক্ !
রৌদ্র আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিঙ্গল,
ফুকারিছে চাতক বিহ্বল,—
খিন্ন পিপাসায় ;
হায় ! ১২

হায় !
আনন্দ ধরায়
নাহি আজ আনন্দের লেশ,
চতুর্দ্দিকে ক্রুদ্ধ আঁখি, চারিদিকে ক্লেশ।
সংবর ও মূর্ত্তি, ওগো একচক্র-রথের ঠাকুর !
অগ্নি-চক্ষু অশ্ব তব মূর্চ্ছি বুঝি পড়ে,—আয় সে ছুটাবে কত দুর ?

সপ্ত সাগরের বারি সপ্ত অশ্বে তব করিছে শোষণ তৃষ্ণাভরে,
তবু নাহি তৃপ্তি মানে, পিয়ে নদ, নদী, সরোবরে ;—
পঙ্কিল পল্বলে পিয়ে গোষ্পদে ও কূপে,
পুষ্পে রস—তাও পিয়ে চুপে।
তৃপ্তি নাহি পায়।
হায়। ২৪

হায় !
সান্ত্বনা কোথায় ?
রৌদ্রের সে রুদ্র আলিঙ্গনে
জগতের ধাত্রী ছায়া আছে উন্মা-মনে ;
আশাহত ক্ষুব্ধ লোক,—আকাশের পানে শুধু চায়,
ময়ূরের বর্হ সম ময়ূখের মালা বহ্নিতেজে চৌদিকে বিছায় !
হর্ম্ম্যতলে, জলে, স্থলে, স্নিগ্ধ পুষ্পদলে আজ শুধু অগ্নি-কণা ক্ষরে
হাতে মাথে ধুনী জ্বালি' বসুন্ধরা কৃচ্ছ্র ব্রত করে ;
ওঠে না অনিন্দ্য চরু অমোঘ প্রসাদ,—
দেবতার মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ,—
দীর্ঘ দিন যায়,
হায়। ৩৬

হায় !
হৃদয় শুকায় !
নাহি বল, নাহিক সম্বল,
অন্তরে আনন্দ নাই, চক্ষে নাহি জল !
মূক হ'য়ে আছে মন, দীর্ঘশ্বাসে অবসান গান,
বিস্মৃত সুখের স্বাদ হৃদি অমুৎসুক,—ধুক্ ধুক্ করে শুধু প্রাণ।
কে করিবে অনুযোগ ? দেবতার কোপ ; কোথা বা করিবে অনুযোগ ?
চারিদিকে নিরুৎসাহ, চারিদিকে নিঃস্ব নিরুদ্‌যোগ !
নাহি বাষ্প-বিন্দু নভে,—বরষা সুদূর ,
দগ্ধ দেশ তৃষ্ণায় আতুর,
ক্লান্ত চোখে চায় ;
হায় ! ৪৮

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১১০

ফুল-শিৰ্ণি

গুগ্‌গুল্ আর গুলাবের বাস মিলাও ধূপের ধূমে !
সত্যপীরের প্রচার প্রথমে মোদেরি বঙ্গভূমে।
পূর্ণিমা রাতি ! পূর্ণ করিয়া দাও গো হৃদয় প্রাণ ;
সত্যপীরের হুকুমে মিলেছে হিন্দু মুসলমান॥ ৪

পীর পুরাতন,—নূর নারায়ণ,—সত্য সে সনাতন ;
হিন্দু মুসলমানের মিলনে তিনি প্রসন্ন হ'ন্।
তাঁরি ইশারায় মিলিয়াছি মোরা হৃদয়ে জ্যোৎস্না জ্বালি' ;
তাঁহারি পূজায় সাজায়ে এনেছি ফুল-শির্ণির ডালি।

পুলকের ফেনা সফেদ্ বাতাসা শুভ্র চামেলি ফুল,—
হৃদয়ের দান প্রীতির নিদান আলাপের তাম্বুল!
মিলন-ধর্ম্মী মানুষ আমরা মনে মনে আছে মিল্,
খুলে দাও খিল, হাসুক নিখিল দাও খুলে দাও দিল্!

হিন্দু-মুসলমানে হ'য়ে গেছে উষ্ণীষ-বিনিময়,
পাগ্ড়ী-বদল্-ভাই—সে আদরে সোদর-অধিক হয়।
সুফি-বৈষ্ণবে করে কোলাকুলি আমাদের এই দেশে!
সত্যদেবের ইঙ্গিতে মেশে বাউলে ও দরবেশে!

বাহারে মিলায়ে বসন্ত রাগ, সিন্ধুর সাথে কাফি,—
এক মার কোলে বসি' কুতূহলে মোরা দোঁহে দিন যাপি।
মিলন-সাধন করিছে মোদের বিশ্বদেবের আঁখি,
তাঁর দৃষ্টিতে হ'য়ে গেল ফুল-শির্ণিতে মাখামাখি!

গুগ্গুলু জ্বালি' ধূপের ধোঁয়ায় মিলায়ে দাও গো আজি,
বাণী-মন্দিরে বীণার সঙ্গে সিতার উঠেছে বাজি'!

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১১১

ছিন্ন মুকুল

সব চেয়ে ছোটো পীঁড়ি খানি
সেই খানি আর কেউ রাখে না পেতে,
ছোটো থালায় হয় নাকো ভাত বাড়া,
জল ভরে না ছোট্টো গেলাসেতে ;
বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে ছোটো
খাবার বেলায় কেউ ডাকে না তাকে,
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
তারি খাওয়া ঘুচেছে সব আগে।
সব চেয়ে যে অল্পে ছিল খুসী—
খুসী ছিল ঘেঁষাঘেঁষির ঘরে,
সেই গেছে হায়, হাওয়ার সঙ্গে মিশে
দিয়ে গেছে জায়গা খালি ক'রে ;
ছেড়ে গেছে, পুতুল, পুঁতির মালা,
ছেড়ে গেছে মায়ের কোলের দাবী,
ভয়-তরাসে ছিল যে সব চেয়ে
সেই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবী !
সব চেয়ে যে ছোটো কাপড়গুলি
সে গুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে,
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোটো
আজকে সেটি শূন্য প'ড়ে কাঁদে ;
সব চেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে স'রে
ছোট্টো যে জন ছিল রে সব চেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য ক'রে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

১১২

দেয়ালি

মঙ্গলকোটে বিজয় শেঠের
সমান ছিল না ধনী,
কাজি খোন্দকার মোল্লা সাহেব
সবে তার কাছে ঋণী।
কত জমিদারী, আয়মা মহল
সুদের দেনায় তার,
ভিখারী করিয়া বড় বড় বাড়ী
হয়ে গেছে ছারখার।
গ্রামের ভিতর আলি নওয়াজ
দয়াশীল জমিদার,
কতই হিন্দু, কত মোস্‌লেম,
কৃপায় পালিত তাঁর।
তাঁহার নিমক খায়নি যাহারা
অল্পই ছিল সেথা,
বিজয়ের কাছে তিনিও যে ঋণী
অন্যের কিবা কথা!
গ্রামে কাণাকাণি, শীঘ্রই শেঠ
নিলামে লইবে কিনে,
তাঁর জমিদারী, আয়মা যে সব
বন্দক আছে ঋণে।

শুনিয়া একথা বিষম ব্যথিত
গ্রামের গরিব দুখী,
কেবল ক'জন আত্মীয় তাঁর
হয়েছিল কিছু সুখী।

আলি নওয়াজ নীরবে সহেন
মরমের ব্যথা মনে,
অস্ফুট তাঁর গভীর বেদনা
জানে শুধু এক জনে।

চাহিয়া পাঠালে কত আত্মীয়
শুধে লয় ঋণভার,
আলি নওয়াজ করিবে কি নত
উন্নত শির তার ?

সে যে মোখাদিম্ নহে ত বেতস
দুখবেগে হবে নত,
দাঁড়ায়ে পুড়িবে বজ্র-আগুনে
ভীম তালতরু মত।

আলি নওয়াজ করিলেন স্থির
আল্লা করেন যাহা,
ঋণ শোধ দিয়ে মদিনা যাবেন
কাটায়ে দেশের মায়া।

হ'ল যদি হায় ফলছায়াহীন
বিশাল বিটপী হেন,
পথিকের দয়া লইতে এখানে
দাঁড়ায়ে রহিব কেন ?

* * *

পুড়িছে পটাকা উড়িছে হাউই
খেলিছে আকাশ-বাজি,
ঘরে ঘরে শত জ্বলিতেছে দীপ
হিঁদুর দেয়ালি আজি !
অশ্বে আরোহি' নওয়াজ সাহেব
দেখিতে গেলেন ঘটা,
আঁধার হৃদয়ে আসিয়া পড়িল
খর আলোকের ছটা।
ফিরালেন ঘোড়া দেখিলেন দূরে
বিজয় দাঁড়ায়ে আছে,
চমকি' উঠিল হৃদয় তাঁহার
কোন কথা বলে পাছে।
আভূমি আনত সেলাম করিল
আসি' শেঠ তাড়াতাড়ি।
বলিলেন আলি সেলাম শেঠজী,
এই আপনার বাড়ী ?

বিজয় বলিল, "হুজুর, আজিকে
এসেছেন এই পথে,
ছাড়িয়া দিব না, আমার গৃহেতে
পদধূলি হবে দিতে।"

বুঝিলেন আলি, ঋণের কথাই
গোপনে বলিতে একা,
চতুর বিজয় গৃহে লয়ে যাবে,
করিতে এসেছে দেখা।

যা হ'ক নামিয়া বিজয়ের সাথে
গেলেন ভবনে তাঁর,
কি জানি কি বলে— এই ভাবি' হৃদি
কাঁপিল যে কতবার।

সজ্জিত গৃহে চারু কেদারায়
বসায়ে তাঁহারে হেসে,
বিনয়ের সাথে বিজয় বসিল
জানু পাতি' ভূমে এসে।

মুগ্ধ নওয়াজ হেরিয়া বিনয়
দেখেন আলোকরাজি,
মাগেন বিদায়, শেষ হ'ল যবে
পোড়ানো আতসবাজি।

বিজয় বলিল,   দেখিলেন যাহা
এ সব তবু ত ফাঁকি,
মোর হাতে গড়া   রিঙ্ বাতি আলো
দেখাতে রয়েছে বাকি।
এত বলি' ধীরে   বাক্স হইতে
গুটানো কাগজখানি,
প্রদীপে ধরিয়া   পোড়াতে পোড়াতে
সম্মুখে ধরিল আনি।
কি কর, কি কর-!   বাতি নয়, ও-যে
আমারি সে তমস্সুক !
জানি আমি তাহা,   বলিল বিজয়
পুলক-মাখানো মুখ।
আপনার স্নেহে   জনক পালিত
শুনিয়াছি বহু দিন,
শুভ আগমনে   করিলাম তাই
এই রোশ্‌নাই ক্ষীণ।
আজিকে আমার   সুখের দেয়ালি
বিজয় বলিল হাসি',
আলি নওয়াজের   বিশাল নয়ন
শুধু জলে গেল ভাসি'।

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১১৩

পল্লীরাণী

জড়ানো শ্যাম শ্যাম-লতাতে নদীতীরের গুল্মগুলি
স্বচ্ছ তরল মুকুর পানে হর্ষে চেয়ে উঠ্‌ছে দুলি' ;
ওই যেথা ওই শশক চরে শঙ্কাবিহীন হৃষ্ট মনে,
মিশ্‌ছে নদীর কলধ্বনি মৌমাছিদের গুঞ্জরণে ;

ঝরা পাতার আসন পাতা, গাছটি ভরা মল্লিকাতে,
আস্‌ছে ভেসে ফুলের পরাগ শীতল শীকর-সিক্ত-বাতে,
প্রকৃতির ওই নর্ম্ম-গৃহে, শোভার প্রমোদ-ভবন-মাঝে,
মোদের রাণীর মৌন মুখর মধুর বীণা নিত্য বাজে।

ওই যে বিশাল হর্ম্ম্য ভাঙা, জঙ্গলেতে পূর্ণ বাড়ী,
চঞ্চলা তাঁর পেচক রাখি' অনেক দিবস গেছেন ছাড়ি' ;
পড়্‌ছে ঝরি' চূণাবালি সব, জীর্ণ কবাট বন্ধ থাকে,
ভগ্ন পূজার আঙ্গিনাতে দিন দুপুরেই শৃগাল ডাকে ;

রুগ্‌ণ বালক-পৌত্র ল'য়ে হোথায় থাকে একলা বুড়ী,
করবীর ওই ক্ষীণ শাখাতে একটি হের ফুলের কুঁড়ি ;
অতীত সুখের পাষাণ-লিপি ধরার মাঝে বড়ই দীনা,
ওই বাড়ীতে মোদের রাণীর বাজে করুণ মধুর বীণা !

শস্যশ্যামল মাঠের মাঝে ওই দেখ ওই অশথ-ছায়ে
পল্লীবাসীর ভক্ত রাখাল কতই গীতি নিত্য গাহে,—
কোন্ যুগে কোন্ অতীত দিনে মাঠে গেল ফসল মারা,
পঙ্গপালে শস্য-সকল ক'রেই গেল ছন্নছাড়া !

কোন্ যুগে কোন্ জমিদারের মারা গেছে তনয় বুঝি,
রাখালগণের কণ্ঠগীতি আজো তারে বেড়ায় খুঁজি' !
অতীত দিনের ক্ষুদ্র কথা, দুঃখ সুখ ও কান্না হাসি,
মোদের রাণীর মৌন মুখের বীণার স্বরে উঠ্ছে ভাসি' !

ঠেলে রেখে কাজের বোঝা, বন্ধ ক'রে বইর পাতা
মায়ের বিজন মন্দিরেতে এসো, তোমায় ডাক্ছি ভ্রাতা !
আজকে শ্যামল মাঠ যে আলো বেগুনী ওই মস্নে ফুলে,
মেঠো ঝিঙার সতেজ লতা পড়্ছে ঝুলে নদীর কূলে ;

বেগুন-ক্ষেতের কুটীর হ'তে মিঠা মেঠো আস্ছে গীতি,
নূতন আমের মঞ্জরীতে আন্ছে টেনে সুদূর স্মৃতি !
পল্লীরাণীর শান্ত গৃহে পল্লীরাণীর স্নিগ্ধ ছবি
দেখ্তে সবায় ডাক্ছি আমি—এস ভাবুক—ভক্ত—কবি !

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১১৪

স্নেহের দাগ

ঘুরে ঘুরে বুড়ী জীর্ণ শীর্ণ
ভিক্ষা করিয়া খায় ;
'রাজেশ্বরী' এ অদ্ভুত নাম
কে দিয়াছে তারে হায় !
খঞ্জ কুব্জ অতি কুৎসিত
বয়স ষাটের পার,
বুঝিতে পারিনে মদন নামটি
রাখিল কেমনে তার !
সুখের মূর্ত্তি দেখেছিল কিনা
জানার উপায় নাই,
"সুখলাল" নাম বাগ্দীর-ঘরে
কে রেখেছে তার ভাই ।
সদাই দুঃখ অতি জরাতুরা—
ছাড়ে না যাহারে ব্যাধি,
তাহার নামটি রাখিয়া গিয়াছে—
কোন্ জন আহ্লাদী ?
নামের সহিত চেহারা মিলায়ে
বসে বসে ভাবি আমি,
চক্ষু ছাপায়ে দর দর ধারে
বারি-ধারা ঝরে নামি ।

জনক জননী স্বজনের স্নেহে
শত আদরের কথা ;
স্মরাইয়া দেয়, বুকেতে আমার—
জাগায়ে দারুণ ব্যথা। ২৪
ভাঙ্গা নৌকার সিঁদূরের দাগে
হেরি উৎসব তার,
বুড়া বকুলের জীর্ণ বেদিতে
পুলক প্রতিষ্ঠার। ২৮
মোছা এলুনেব লক্ষ্মীর পাঁজে
কমলায় খুঁজি বৃথা
ভগ্ন প্রদীপ স্মরায় আমরে—
রজনী দীপান্বিতা। ৩২
নামের খেয়াল স্মরি' অনুক্ষণ
কভু কাঁদি কভু হাসি,
অন্নাভাবের বেদনা ভুলায়
অন্ন প্রাশন আসি। ৩৬
দৈন্যের মাঝে নয়নের জলে
গৌরব হেরি নিতি,
'পুরীর' শুষ্ক 'কেয়ার' ঠোঙায়—
রথ-যাত্রাব স্মৃতি। ৪০

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১১৮

আশা

বল, বল, বল সবে, শত বীণা-বেণু-রবে
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্ম্মে মহান্ হবে, কর্ম্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে!
আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি' তিন দিক্ নাচিছে লহরী,
যায় নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী,
এখনো অমৃতবাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা-বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরব কাহিনী।
বিদুষী মৈত্রী, খনা, লীলাবতী,
সতী, সাবিত্রী, সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি,
—আমরা তাঁদেরি সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতি-পুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ
আমরা তাদেরই সন্ততি।
ভোলেনি ভারত ভোলেনি সে কথা;
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা;

নানক নিমাই করেছিল ভাই,
সকল ভারত-নন্দনে,
ভুলি ধর্ম্ম, দ্বেষ, জাতি-অভিমান,
ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক প্রাণ ;
এক জাতি প্রেম-বন্ধনে।
বল, বল, বল সবে, শত বীণা বেণু-রবে
ভারত আবার জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্ম্মে মহান্ হবে, কর্ম্মে মহান্ হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পূরবে।

—অতুলপ্রসাদ সেন

১১৬

ভারত-ভানু

ভারত-ভানু কোথা লুকালে ?
পুনঃ উদিবে কবে পূরব-ভালে ?
হা রে বিধাতা ! সে দেব-কান্তি
কালের গর্ভে কেন ডুবালে ?
আছে অযোধ্যা—কোথা সে রাঘব !

আছে কুরুক্ষেত্র—কোথা সে পাণ্ডব!
আছে নৈরঞ্জনা—কোথা সে মুক্তি!
আছে নবদ্বীপ—কোথা সে ভক্তি!
আছে তপোবন—কোথা সে তপোধন!
কোথা সে কালা কালিন্দী-কূলে!

পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে;
নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে;
কোথা সে বীরেন্দ্র শূর দানবারি;
কোথা সে বিদুষী তাপসী নারী;
সিংহের দেশে বিচরিছে শিবা,

বীর্য্য-বিড়ম্বিত খল কোলাহলে।
নানক, গৌরাঙ্গ শাক্যের জাতি,
নাহিক সাম্য, ভেদে আত্মঘাতী;
ধর্ম্মের বেশে বিহরে অধর্ম্মী।
কোথা সে ত্যাগী, প্রেমী ও কর্ম্মী?

কোথা সে জাতি যাহারে বিশ্ব
পূজিত কালের প্রভাত-কালে?

—অতুলপ্রসাদ সেন

১১৭

চাষীর দুঃখ

বাজার পাইক বেগার ধ'রেছে,
ক্ষেতে যাওয়া বন্ধ হল আজ ;
পরের কাজে কাটুবে সারাদিন,
রৈল প'ড়ে ঘরের যত কাজ।
আষাঢ় মাসে চাষের ক্ষেতে,
খাটুছে সবে দিনে ও রেতে,
শেষ জোয়ে'তে 'রুই'ব বলে
বেরিয়েছিলাম আজ—
হঠাৎ প'ল রাজার বাড়ী কাজ। ৯

লোকের ক্ষেতে নূতন চারাগুলি
সবুজ—যেন টিয়ে পাখীর পাখা ;
পাটের ডগা লকলকিয়ে উঠে,
মাঝের গাঁয়ের বাজার দিল ঢাকা।
গাঙের জল বানের টানে
আস্‌ল ধেয়ে গ্রামের পানে,
পল্লীপথ গরুর খুরে
হ'ল যে কাদামাখা ;
শস্যভারে পড়্‌ল চড়া ঢাকা। ১৮

চাষীর দুঃখ

উপর-ঝরণ দারুণ এ বাদলে
জীর্ণ আমার কুটীর ভাসে জলে ;
মোড়লের ঝি ভাবছে অধোমুখে,
ছেঁড়া কাঁথায় কাঁদ্‌ছে দু'টি ছেলে।
'শ্যামলা' আমার দুঃখ বুঝে
উঠান কোণে দাঁড়িয়ে ভেজে,
দেনার দায়ে দাদাঠাকুর—
গোয়াল ভেঙ্গে নিলে।
সামলে নিতাম আজকে রু'তে পেলে।

জীর্ণ চালে হ'ল নাকো দেওয়া
কোথাও দুটি পচা খড়ের গুঁজি ;—
রাজার কাজে বেগার দিতে লোক
মিল্‌ল না কি পল্লীখানি খুঁজি !
সারা সনেব অন্ন ছাড়ি'
যেতে হবে রাজার বাড়ী,
স্বর্ণচূড়ার বর্ণ সেথা
মলিন হ'ল বুঝি !
মিল্‌ল না এই গরীব ছাড়া পুঁজি।

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

১১৮

হাট

দূরে দূরে গ্রাম দশবারো খানি,
মাঝে একখানি হাট ;
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ,
প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচা-কেনা সেরে বিকাল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায় ;
বকের পাখায় আলোক লুকায়
ছড়িয়ে পূবের মাঠ ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে ওঠে দীপ—
আঁধারেতে থাকে হাট।
নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা একা
ক্লান্ত কাকের পাখে ;
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস
পার্শ্বে পাকুড় শাখে।
হাটের দো-চালা মুদিল নয়ান,
কারো তরে তার নাই আহ্বান ;
বাজে বায়ু আসি' বিদ্রূপ-বাঁশি
জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে ;
নির্জ্জন হাটে রাত্রি নামিল
একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল
চেনা-অচেনার ভিড়ে ;
কত না ছিন্ন চরণ-চিহ্ন
ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে'।
মাল চেনাচিনি, দর জানাজানি,
কাণাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি ;
হানাহানি ক'রে কেউ নিল ভ'রে
কেউ গেল খালি ফিরে।
দিবসে থাকেনা কথার অন্ত
চেনা-অচেনার ভিড়ে।
কত কে আসিল, কত বা আসিছে,
কত না আসিবে হেথা ;
ওপারের লোক নামালে পসরা
ছুটে এ পারের ক্রেতা।
শিশির-বিমল প্রভাতের ফল,
শত হাতে সহি' পরখের ছল—
বিকাল বেলায় বিকায় হেলায়
সহিয়া নীরব ব্যথা।
হিসাব নাহি রে— এল আর গেল
কত ক্রেতা-বিক্রেতা।
নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা
পুরানো হাটের মেলা ;

দিবস রাত্রি নূতন যাত্রী
নিত্য নাটের খেলা।
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে
ঘরে ফিরিবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে
চিরকাল একই খেলা।

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

১১৯

বঙ্গলক্ষ্মী

ইতিহাসে খুঁজি তোমা, স্বপ্ন-সুষমায়
গ'ড়ে তুলি অপরূপ মোহিনী মুরতি—
মনোময়ী প্রতিমার করি যে আরতি
বর্ষে, বর্ষে, কোজাগর লক্ষ্মী-পূর্ণিমায়।
জ্যোৎস্না-রাতে পদচিহ্ন রাখিলে কোথায়—
খুঁজিয়াছি তরী বেয়ে সারা ভাগীরথী,
হেরি শুধু ভাঙা-ঘাট বিজন বসতি—
প্রয়াণের পথ-রেখা নদী-সিকতায়! ৮

গেছে রূপ, ছায়া তবু ভাসে যেন চোখে ;
হেমন্তের মায়ামৃগ—স্বর্ণ-মরীচিকা—
ধায় আজো শস্য-শীষে, চম্পকে অশোকে
বসন্ত বিদায় মাগে ; আজো মালবিকা
চেয়ে থাকে অনিমিখ নব মেঘালোকে—
কবির অমর শ্লোকে লভে জয়টীকা।
উপবাসী চাষী কাঁদে শূন্য আঙিনায়,
শরতের পীত-রৌদ্রে দাহ জ্বর-জ্বালা।
কে গাঁথিবে তরুমূলে শেফালির মালা—
অর্চ্চিবে কমল তুলি' কমলাসনায় ?
তুমি লক্ষ্মী ছিলে কবে ? আজ কল্পনায়,
নাই ঝাঁপি, আছে শুধু নৈবেদ্যের থালা,
নিত্যপূজা-অভিনয়ে—বৃথা দেয় বালা
গৃহদ্বারে আলিপনা প্রতি পূর্ণিমায়। ২২
ছিলে যবে হে জননী সারা দেশ ভরি'
তখন করেছি পূজা গৃহদেবী-রূপে,
আজ তুমি গৃহে নাই, তাই চুপে চুপে
সমগ্র দেশের রূপে মূর্ত্তিখানি গড়ি।
লক্ষ্মীরে চাহি না বটে দীপে আর ধূপে—
বঙ্গলক্ষ্মী! সেও যে রে ছায়া ধরাধরি! ২৮

—মোহিতলাল মজুমদার

১২০

রবীন্দ্র-বরণ

যে সুরে সাধিল গীত একদা সে অজয়ের কূলে,
আঙিনায় একা বসি', হেরি' মেঘে মেদুর অম্বর,
যে রস অমৃত-বিষে মূরছিয়া মরমের মূলে
দ্বিজ-কবি করেছিল এ জাতিরে গানে জাতিস্মর—
সেই রসে, সেই সুরে, এতকাল পরে তুমি, কবি,
মুক্তবেণী মুক্ত করি' বহাইলে হৃদয়-জাহ্নবী
বাঙালার ; এই জল, এই মাটি, এই ছায়ালোক,
গুঞ্জরিল সুন্দরের স্বপ্নময় স্নেহের কাহিনী !
এ জীবনে এত শোভা ! নহে শুধু শ্মশান-বাহিনী—
এ নদীর উভ-কূলে বারাণসী—ভূলোকে দ্যুলোক !

মোদের কুটীর-দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখেছি তাহারে—
গ্রামান্তের বনরেখা-অন্তরালে, সায়াহ্ন-ধূসর
সীমন্ত-গুণ্ঠনবাসে ঢাকি' আঁখি, তিতি' অশ্রুধারে,
খুঁজিয়া যে লয় নিতি বিস্মৃতির তিমির-বাসর ।
তুমি তারে ফিরাইলে অস্ত হ'তে উদয়ের পানে—
সে মুখে পড়িল আলো, তব গীত-অভিষেক-স্নানে
মোহভঙ্গে দাঁড়াইল দেশ-লক্ষ্মী রাজরাজেশ্বরী !
স্যমন্তক-মণি শিরে, অঙ্গে বাস হরিত-হিরণ,
বাণীর মঞ্জীর-বাঁধা দুইখানি রাতুল চরণ,
ধরি' আছে বক্ষে তবু করপদ্মে নীবার-মঞ্জরী !

সেই রূপধ্যান-শেষে করি আমি তোমারে বরণ,
হে বরেণ্য বঙ্গ-কবি, জাতি-দেশ-ভাষার দিশারী !
আজ তুমি বিশ্ব-কবি—সেই গর্ব্ব জানি অকারণ,
যা' দিয়েছ বিশ্বে তুমি, আমি তার নহি যে ভিখারী।
নিখিলের নীলাকাশে আছে শুধু মহা মরুপথ,
নাই সেথা স্নেহ-শ্যাম ছায়া-তরু, নীড়ের জগৎ।
রচিয়াছ যেই নীড় সুনিবিড় হর্ষে শিহরিয়া—
ভুঞ্জিয়াছি শুধু মোরা যে নবান্ন অমৃত-সমান,
যে আনন্দ-অধিকারে বিদেশীর বৃথা অভিমান—
তারি গর্ব্বে সমর্পিনু এই অর্ঘ্য অঞ্জলি ভরিয়া।

—মোহিতলাল মজুমদার

১২১

বেলা যায়

একদা পল্লীতে কোন রজকের ঘরে
ডাকিছে বালিকা এক সোহাগের স্বরে,
নিদ্রিত পিতারে, 'ওঠ বাবা, বেলা যায় ;'
অস্তমান সান্ধ্য সূর্য্য অন্তর্হিত প্রায়।
বালিকার কম্প্রকণ্ঠ চঞ্চল পবনে
সঞ্চারিল স্তব্ধতায়, শিবিকারোহণে
অদূরে গৃহের পথে ফিরেছেন যথা

লালাবাবু কর্ম্মস্থল হ'তে, দু'টি কথা
চলে গেল সেথা।
নিস্তব্ধ শিবিকা হ'তে
'থামাও থামাও'—প্রৌঢ় বলে মধ্য-পথে,—
'ও বেলা যায়।' বিস্মিত বাহকগণ
রাখিল শিবিকা। লালা কম্পিত-চরণ,
দাঁড়াইয়া জীবনের প্রশান্ত সন্ধ্যায়
আপনারে উঠিলা ডাকিয়া,—'বেলা যায়'।
বহুমূল্য বেশ-বাস ফেলিলেন খুলে,
ভৃত্যগণে দিলেন বিদায়। বক্ষে তুলে'
লইলেন জীবনের কুজ্ঝটিকা হ'তে
প্রজ্ঞার আলোক।
অগ্রসর বিশ্বস্রোতে
ঝাঁপায়ে পড়িল বেগে। জ্বলে হুতাশন
ছলছল নেত্রপ্রান্তে, কি জানি দাহন
অনুতপ্ত উচ্চ হৃদয়ের। ঊর্দ্ধে চাহি'
নিঃশ্বাসিলা। কোথা হ'তে উঠিলা কে গাহি'
সেই দুটি কথা—'বেলা যায়।' 'বেলা যায়।'
বিশাল অনন্ত প্লাবি' গম্ভীর সন্ধ্যায়।
সাবধানী তিরস্কার, মঙ্গল-শাসন
স্নেহ-বোধে ইঙ্গিতে কি জানাল গগন?
হু হু করি' সান্ধ্য বায়ু ফেলিয়া নিঃশ্বাস

নেমে এল শূন্য হ'তে ; ত্যজি' দিবাবাস,
মহাবেগে ব্যোমচর ধাইছে অম্বরে,
অকিঞ্চন রশ্মিলেশ কম্পিত অন্তরে
যাইতেছে হারাইয়া !

কোথা গেল রবি
দিগন্তের প্রান্তে নেমে' ? মুছে' গেছে ছবি
দীপ্ত দিবসের ! ফিরে' আসে গাভীগুলি
অর্দ্ধভুক্ত তৃণ ফেলি' ; হেরিয়া গোধূলি
কর্ম্মব্যস্ত কৃষাণেরা লইল বিদায়
ধান্যপূর্ণ ক্ষেত্র-পাশে রুদ্ধ বেদনায় !
হেরিলা অদূরে প্রৌঢ়, চারিদিক্ ভরা
কেবল বিদায়যাত্রা, মুক্ত, মায়াহারা
ত্যাগের ঘোষণা !

ছুটিলা তৃষিত মনে,
কার ছদ্ম করুণার শুভ আকর্ষণে !
লক্ষ কোটি নভ-আঁখি সাক্ষী হ'ল তা'র,
নীরবে দেখাল পথ নাশি' অন্ধকার !
পুরাতন, পরিচিত, বহু-উচ্চারিত
'বেলা যায়'—এই দুটি কথা রোমাঞ্চিত
অন্তরের অন্তঃকর্ণে লাগিলা শুনিতে
সম্মোহন কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত নিশিতে !

—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

১২২

লালাবাবুর দীক্ষা

সিত মর্ম্মরে খচি'   বিরাট দেউল রচি'
আর্ত্ত আতুর তরে খুলি দানসত্র,
গড়িয়া অনাথশালা,   সার করি ঝোলামালা,
ভক্তগণের নামে লিখি দান-পত্র,
লালাবাবু বৈরাগী,—   গুরুকরণের লাগি,
সারা পথ ভরি ভেট-উপহারপুঞ্জে,
বাবাজী কৃষ্ণদাস   যেখানে করেন বাস
একদা এলেন সেই নিভৃত-নিকুঞ্জে।
সাধুমুখে নাম গান   শুনিয়া জুড়াল প্রাণ
বাজিয়া উঠিল তাঁর হৃদয়ের যন্ত্র,
সাধুর চরণে ধরি'   ক'ন লালা, "কৃপা করি
এ অধমে দি'ন তরী,—তরণের মন্ত্র।"
সাধু ক'ন স্নেহভরে   "এবে ফিরে যাও ঘরে,
এখনো আসেনি তব দীক্ষার লগ্ন,
নিজে যাবো, এলে দিন   রবোনাক উদাসীন।"
এত কহি আঁখি মুদি পুন জপে মগ্ন।
লালাবাবু যা'ন ফিরে   বুক ভাসে আঁখিনীরে,
ভেট দক্ষিণা সাথে ধিক্কারে ক্ষুণ্ণ,
ভাবেন, "হায় রে কবে   যশই কিনেছি ভবে,
পায়ের কড়ির থলি একেবারে শূন্য ?

পুণ্যের আহরণে   এখনো মনের কোণে,
ছায়ারূপে বিরাজিছে অভিমান দম্ভ,
ছাড়িয়া বিষয়-মায়া   সে বুঝি ধরেছে কায়া,
বাহিরে তাহার রূপ,—মঠ, বেদী, স্তম্ভ।
এই ভাবি সব ছাড়ি   মন্দির মঠ বাড়ী,
চলিলেন লালাবাবু ঝুলি লয়ে স্কন্ধে,
পথে পথে ব্রজধামে   জয় শ্যাম রাধা নামে,
মাধুকরী করি সদা ফিরেন আনন্দে।
ব্রজবাসিগণ তায়   সবে পিছু পিছু ধায়,
লাখপতি ভিখ মাগে 'বলি রাধাকৃষ্ণ',
দীন ভিক্ষুক যারা   দুই পাশে কেঁদে সারা,
দু'ধারে ভবনগুলি চাহিছে সতৃষ্ণ।
ভাণ্ডার খালি ক'রে   আনে থালী ডালি ভ'রে
দিতে রাজভিখারীরে,—ছুটে সবে ত্রস্ত,
ভিখারী লয় না কিছু   বদন করিয়া নীচু,—
মুষ্টি ভিক্ষা তরে পাতে এক হস্ত।
মাস-ছয় গেল চ'লে   গুরুর চরণ তলে
জানালেন লালাবাবু পুন সঙ্কল্প,
হেসে তারে গুরু ক'ন,   "দেরী নাই, শুভক্ষণ
নিকটে এসেছে বাছা,—বাকী আছে অল্প।"
সারা পথ আঁখি-জলে   ভিজাইয়া লালা চলে,
নয়নে নাহিক নিদ—রুচে না ক' অন্ন,

শেঠেদের বাড়ীটার   পাশ দিয়ে যেতে তাঁর
জাগিল সহসা চিতে নব-চৈতন্য ।   ৪৪
সহসা ভাবেন থামি,   "কি ধন পেলাম আমি,
কে করিল করাঘাত হৃদয়-মৃদঙ্গে ?
এই শেঠেদের বাড়ী,   রেশারেশি আড়া আড়ি,
চলিয়াছে কতদিন—ইহাদের সঙ্গে,
ব্রত দান খয়রাতে   কতই এদের সাথে,
প্রতিযোগিতায় আমি ছিনু রজোদৃপ্ত,
পুণ্য-পণ্য তরে   দর-ডাকাডাকি ক'রে,
যশ-পিপাসারে মোর করিয়াছি তৃপ্ত ।
মনের কুহর মাঝে   আজো অভিমান রাজে,
হায়, হায়, অধমের হলো না ক' শিক্ষা,
এ ব্রজের দ্বার-দ্বার   গেছি আমি বারবার,
পারি নাই এ দুয়ারে মাগিবারে ভিক্ষা ।"   ৪৬
এত ভাবি একেবারে   শেঠের তোরণ-দ্বারে,
হাঁকিলেন লালাবাবু, "রাধে গোবিন্দ ।"
শেঠেদের ঘরে ঘরে   সে ধ্বনির সাড়া পড়ে,
ছুটে আসে পরিচর-পরিজনবৃন্দ ।
কাঁদিল প্রহরী দ্বারী,—   কেঁদে উঠে ভাণ্ডারী,—
দেওয়ান কাঁদিয়া চুমে পদধূলিপঙ্কে,
শেঠজী ছুটিয়া আসে   বাঁধে তাঁরে বাহুপাশে,
নারীরা ফুঁপায়ে কাঁদে ফুকারিয়া শঙ্খে !

ভেদি' রোদনের রোল, হরিবোল, হরিবোল,
টলমল সারা বাড়ী প্রেমের তরঙ্গে,
উদ্দাম কীর্ত্তনে তাণ্ডব নর্ত্তনে,
প্রেমের গুরুর নাম ঘোষিল মৃদঙ্গে।
শেঠ কয় জুড়ি পাণি আজি পরাজয় মানি,
ইহলোকে পরলোকে জিতে গেলে বৈরী,
ঝুলিখানি তব কাঁধে ভরা জয় সংবাদে,
সোনা দিয়ে পরাজয় করিয়াছি তৈরী।"
শেঠ হাঁকে, বার বার "সারা শেঠ-ভাণ্ডার
সাথে দাও বন্ধুর, তবে পাবো তুষ্টি।"
লালাবাবু ক'ন "ভাই, এ জঠরে ঠাঁই নাই
এক কটোরারো, চাই শুধু এক মুষ্টি।"
এক মুঠি প্রেমকণা,— ভিখারী হাজার জনা,
লালাবাবু ফিরে যান, সাথে চলে হর্ষে
সবে হরি হরি বলি', করতাল কুতূহলী,
শেঠকুল-মহিলারা ফুল লাজ বর্ষে।
ফিরে যেতে দ্বারদেশে হেরিলেন, গুরু এসে
কহিছেন' "আজি শেষ হয়েছে পরীক্ষা,
নেচে হরি হরি বলো, যমুনার ঘাটে চলো,
লগ্ন এসেছে লালা, লও আজি দীক্ষা।"

—কালিদাস রায় (কবিশেখর)

১২৩

প্রকৃত লক্ষণ

মুখ হাসে যাহে, হাসেনাক' চোখ, তার নাম নয় হাসি
বুক না কাঁদিলে হয় কি কান্না, চোখে শুধু জলরাশি ?
কণ্ঠ গাহিলে হয় নাক গান, নাহি গায় যদি প্রাণ,
আত্মা না দিলে শুধু হাতে-করে-দেওয়ারে কে বলে দান ? ৪

—কালিদাস রায় (কবিশেখর)

১২৪

বৈশ্বানর

বিশ্বনরের আত্মস্বরূপ নমি তোমা দেব হব্যবহ,
সপ্তরসনা-অঞ্জলিপুটে মম বাঙ্ময় অর্ঘ্য লহ।
হে গূঢ় চেতনা, হও আজি মম ধেয়ান-নেত্রে পরিস্ফুট,
মর্ম্মকোষের বাঁধন দহিয়া জীবনে আমার জ্বলিয়া উঠ। ৪
মরুতে জ্বলিছ মৃগতৃষ্ণায় মেরুতে জ্বলিছ অরোরা-রূপে,
জাগিছ ধরার জবায়ুর মাঝে জ্বলিতেছ জ্বালামুখীর কূপে।
জ্বলিতেছ তুমি সমরকুণ্ডে রুধির-মজ্জা-সর্পি লভি,
জ্বলিতেছ তুমি সান্ধ্য চিতায় পশ্চিমমেঘে পিঙ্গছবি। ৮
হিংসায় প্রতিহিংসায় তব লক-লক শিখা নিয়ত যুঝে,
কোপ-ঘূর্ণিত রক্তলোচনে ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলি আহুতি খুঁ
পাপীর পরাণে অনুশোচনার তুষানলে জ্বলি দগ্ধ কর,
বিরহকুণ্ডে ধিকি ধিকি জ্বলি প্রেম-কনকের শ্যামিকা হর'। ১২

মম শীতজড় হৃদিশিলাতলে কত দিন আর রবে গো বল ?
এ চিত্ত-অরণি অরণ্য মাঝে হিরণ্যরেতা জ্বল গো জ্বল'।
ব্যথীর পাঁজর-সমিধে জ্বলিয়া জীবনযজ্ঞে বিতর শুভ,
ঋষির বচনে যোগীর নয়নে হে অনল, তব আসন ধ্রুব।
জ্বালাও তাতাও মাতাও আমায় কব দেব মোরে অর্চ্চিময়,
মম অবসাদ দৈন্য জড়তা কুণ্ঠা লজ্জা করিয়া ক্ষয়।
নির্ভীক কর নির্ম্মল কর হে পাবক মোরে শুদ্ধ করি,
চিতা জ্বেলে রেখে সম্মুখে যেন জীবন-সমরে যুদ্ধ করি।
জীর্ণ দেহটি দগ্ধ করিয়া মুক্তি আমায় দিবে গো যবে
আপনার দেহ ভস্ম মাখিয়া আত্মা আমার বিবাগী হবে।
তাহারেও যদি কর গো দাহন হে দহন মোর শুভের লাগি
নির্ব্বাণ তরে হে চির-বুদ্ধ তবে আমি তব শরণ মাগি।

—কালিদাস রায় (কবিশেখর)

১২৫

কেয়ামত রাত্রি

যাত্রীরা রাত্তিরে হ'তে এল খেয়া পার ;
বজ্রেরি তূর্য্যে এ গর্জ্জেছে কে আবার ?
প্রলয়েরি আহ্বান ধ্বনিল কে বিষাণে !
ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে !

নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ,
মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ !
নিঃশেষে নিশাচর গ্রাসে মহাবিশ্বে,
ত্রাসে কাঁপে তরণীর পাপী যত নিঃস্বে।

তমসাবৃতা ঘোরা 'কেয়ামত' রাত্রি,
খেয়া-পারে আশা নাই ডুবিল রে যাত্রী !
দমকি দমকি দেয়া হাঁকে কাঁপে দামিনী,
শিঙ্গার হুঙ্কারে থরথর যামিনী !

লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে
ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে,
অবহেলি' জলধির ভৈরব গর্জ্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জ্জন !

পুণ্য-পথের এ যে যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্ম্মের বর্ম্মে সু-রক্ষিত দিল্-সাফ্।
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র-নিপাতে-ও
কাণ্ডারী আহ্মদ তরী ভরা পাথেয় !

আবুবকর্ উস্মান উমর্ আলী হায়দর
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর !
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ি-মুখে সারি-গান—"লা শরীক আল্লাহ্" !

'শাফায়ত্'-পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
'জান্নাত্' হ'তে ফেলে হুরী রাশ্ রাশ্ ফুল !
শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল-দাত্রী,
গাও জোরে সারি-গান ও-পারের যাত্রী !

বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া ভার,
ঐ হলো পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার !

—কাজি নজরুল্ ইস্লাম

১২৬
বাদল দিনে

ঐ নীল-গগনের নয়ন-পাতায়
নাম্লো কাজল-কালো-মায়া !
বনের ফাঁকে চম্কে বেড়ায়
তারি সজল আলো ছায়া ॥

ঐ তমাল-তালের বুকের কাছে
ব্যথিত কে দাঁড়িয়ে আছে—
দাঁড়িয়ে আছে !
ভেজা পাতায় ঐ কাঁপে তার
আতুল ঢলঢল কায়া ॥

যার　　শীতল হাতের পুলক-ছোঁয়ায়
　　　　কদম-কলি শিউরে উঠে ;
　　যূঁই-কুঁড়ি সব নেতিয়ে পড়ে,
　　　　কেয়া-বধূর ঘোমটা টুটে !

আহা !　আজ কেন তার চোখের ভাষা
　　বাদল-ছাওয়া ভাসা-ভাসা—
　　　　জলে-ভাসা ?
　　দিগন্তরে ছড়িয়েছে সেই
　　　　নিতল আঁখির নীল আবছায়া॥

ওকাব　ছায়া দোলে অতল কালো
　　শাল-পিয়ালের শ্যামলিমায় ?
　　আম্‌লকী-বন থাম্‌লো ব্যথায়,
　　　　ঘাম্‌লো কাঁদন গগন-সীমায় !

আজ　　তার বেদনাই ভরেছে দিক্—
　　ঘর-ছাড়া হায় এ কোন্ পথিক—
　　　　এ কোন্ পথিক ?

　　একি স্তব্ধ তারি আকাশ-জোড়া
　　　　অসীম-রোদন-বেদন-ছায়া !

কাজি নজরুল্ ইস্‌লাম

———

১২৭

সত্যেন্দ্র-স্মরণে

চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে',
ওগো এই গঙ্গার কূলে।
দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই
নিয়ে গেছে কোলে তুলে'
ওগো এই গঙ্গার কূলে ॥

চপল চারণ বেণু-বীণে তা'র
সুর বেঁধে শুধু দিল ঝঙ্কার,
শেষ গান গাওয়া হ'লনাক তা'র
উঠিল চিত্ত দুলে'
তারি ডাক-নাম ধ'রে ডাকিল কে যেন
অস্ত-তোরণ-মূলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে ॥

ওরে এ ঝোড়ো হাওয়ায় কারে ডেকে যায়
এ কোন্ সর্ব্বনাশী,
বিষাণ কবির গুমরি' উঠিল,
বেসুরো বাজিল বাঁশী!

আঁখির সলিলে ঝলসালো আঁখি,
কূলে কূলে ভ'রে উঠে থাকি' থাকি'
মনে পড়ে কবে আহত এ পাখী
মৃত্যু-আফিম-ফুলে,
কোন ঝড়-বাদলের এমনি নিশীথে
পড়েছিল ঘুমে ঢুলে',
ওগো এই গঙ্গার কূলে ॥

তা'র ঘরের বাঁধন সহিল না সে যে
চির-বন্ধন-হারা,
তাই ছন্দ-পাগলে কোলে নিয়ে দোলে
জননী মুক্তধারা !

ও সে আলো দিয়ে গেল আপনারে দহি'
অমৃত বিলালো বিষ-জ্বালা সহি'
শেষে শান্তি মাগিল ব্যথা-বিদ্রোহী
চিতার অগ্নি-মূলে !

পুনঃ নব-বীণা-করে আসিবে বলিয়া
এই শ্যাম তরুমূলে।
ওগো এই গঙ্গার কূলে ॥

—কাজি নজ্‌রুল্ ইসলাম

১২৮

হাজী মহম্মদ মহসীন

পুণ্য-শ্লোক, দানবীর, মহাপ্রাণ, হে হাজী মহ্‌সীন !
কে বলে মরেছ তুমি ? হে অমর, আছ চিরদিন !
আজো তাই যাও নাই বেহেস্তের নন্দন-কাননে,
আজিও ঘুরিছ তুমি ব্যথিতের কুটীর প্রাঙ্গণে ।

অনাহারে কে রয়েছে, কাঁদিতেছে কোন্ ব্যথাতুর,
শোকে দুঃখে লাঞ্ছনায় আজি কার অন্তর বিধুর ?
কে রয়েছে ঘুমাইয়া অজ্ঞতার নিবিড় তিমিরে,
আলোকের যাত্রা-পথে দৈন্যাহত কা'রা আসে ফিরে ?—

আজিও ফিরিছ তাই পথে পথে করিয়া সন্ধান,
অন্ধজনে করিতেছ দ্বারে দ্বারে জ্ঞানালোক দান ।
সবার আত্মীয় ছিলে, বন্ধু ছিলে, হে মৌনী তাপস !
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় ঘুচায়েছ অজ্ঞান-তামস ।

মানুষ সে, পর হোক—তবু সে যে আপনার ভাই,
একথা তোমার মতো আর কেহ কভু বুঝে নাই ।
বঙ্গের 'হাতেম' তুমি, 'নব-কর্ণ', হে যুগ-পাবন,
আবুবকরের মত বিলাইলে সর্ব্বস্ব আপন ।

আপন সম্পদ্ দিলে বিলাইয়া পরের লাগিয়া,
দৈন্যের কলঙ্কখানি নিলে তুমি আপনি মাগিয়া ।
হে মহ্‌সীন ! তব তরে মণি-মুক্তা-হীরক-খচিত
নূতন এমামবাড়া স্বর্গ-লোকে হতেছে রচিত ।

রোজ-কেয়ামৎ-শেষে সে বিরাট্ মর্ম্মর-প্রাসাদে
দীন দুঃখী আর্ত্তগণে যাবে কি গো নিয়ে তব সাথে ?

—গোলাম মোস্তাফা

১২৯

কবর

এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম-গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙ্গে গেল ব'লে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ী ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা!
সোনালী ঊষায় সোনামুখ তার আমার নয়ন ভরি'
লাঙল লইয়া ক্ষেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত,
এ কথা লইয়া ভাবী-সা'ব মোরে তামাসা করিত শত।
এমনি করিয়া জানিনা কখন জীবনের সাথে মিশে,
ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।
বাপের বাড়ীতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা,
"আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ।"
সাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু'পয়সা করি দেড়ী,
পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হ'ত না দেরী।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যা বেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুর বাড়ীর বাটে!
হেস্ না—হেস না—শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদী যে তোমার কত খুশী হ'ত দেখতিস্ যদি চেয়ে!

নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া, "এতদিন পরে এলে,
পথ পানে চেয়ে, আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখি জলে।"
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর-দেশেতে ঘুমায়ে র'য়েছে নিঝ্‌ঝুম নিরালায়!
হাত জোড ক'রে দোয়া মাঙ্‌ দাদু, "আয় খোদা! দয়াময়,
আমার দাদীর তরেতে যেন গো ভেস্ত্‌ নাজেল হয়।"

* * * *

তাব পর এই শূন্য জীবনে যত কাটিযাছি পাডি
যেখানে যাহারে জড়াযে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনেব শত কবরেব অঙ্ক হৃদযে আঁকি'
গণিয়া গণিযা ভুল ক'রে গণি সারা দিত-রাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিযা কঠিন মাটার তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখেব জলে।
মাটীরে আমি যে বড় ভালবাসি, মাটীতে মিশায়ে বুক,
—আয়—আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।
এইখানে তোর বাপ্‌জী ঘুমাযে, এইখানে তোর মা,
কাঁদ্‌ছিস্‌ তুই? কি করিব দাদু পরাণ যে মানে না।
সেই ফাল্গুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি,
"বা-জান, আমার শরীর আজিকে কি যে করে থাকি থাকি!"
ঘরের মেঝেতে 'সপ্‌'টি বিছায়ে কহিলাম, বাছা শোও—
সেই শোয়া তার শেষ শোওয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ?

গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে ব'য়ে,
তুমি যে কহিলা—"বা-জানরে মোর কোথা যাও দাদু লয়ে?"
তোমার কথার উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে,
সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে।
তোমার বাপের লাঙ্গল-জোয়াল দু'হাতে জড়ায়ে ধরি
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি,
গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝ'রে
ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শূনো-মাঠখানি ভ'রে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো-পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি',
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি'!
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গহীন সায়রে ডুবায়ে সকল গাঁ।
উদাসিনী সেই পল্লী-বালার নয়নের জল বুঝি,
কবর দেশের আঁধার ঘরে পথ পেয়েছিল খুঁজি'
তাই জীবনের প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ,
হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণ-বিষের তাজ।
মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে কহিল, "বাছারে, যাই,
বড় ব্যথা রো'লো দুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই;
দুলাল আমার, যাদুরে আমার, লক্ষ্মী আমার ওরে,
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা, ছাড়িয়া যাইতে তোরে!"

ফোঁটায় ফোঁটায় দুইটি গণ্ড ভিজায়ে নয়ন জলে,
কি জানি আশীষ ক'রে গেল তোরে মরণ-ব্যথার ছলে।
ক্ষণ পরে মোরে ডাকিয়া কহিল,—"আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার 'মাথাল' খানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।"

* * * *

সেই সে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটীর সনে,
পরাণের ব্যথা মরেনাক সে যে কেঁদে উঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড় মাণিকেরা ঘুমায়ে র'য়েছে এইখানে তরু-ছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে প'ড়েছে গায়।
জোনাকী মেয়েরা সারারাত জাগি' জ্বালাইয়া দেয় আলো'
ঝিঁঝিঁরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।
হাত জোড় ক'রে দোয়া মাঙ্ দাদু "রহমান খোদা। আয়
ভেস্ত নাজেল করিও আজিকে আমার বাপ ও মায়।"

* * * *

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে,
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ লাগে।
মজীদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর?
জোর হাতে দাদু মোনাজাত কর, "আয় খোদা! রহমান,
ভেস্ত্ নাজেল করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত-প্রাণ!"

— জসিম্ উদ্দিন

১৩০

পুত্র-স্নেহ

রাত থম থম্, স্তব্ধ নিঝুম, ঘোর-ঘোর—আঁধার,
নিশ্বাস ফেলি, তাও শোনা যায়, নাই কো সাড়া কার,
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
করুণ চাহনি ঘুম-ঘুম যেন, ঢুলিছে চোখের পাতা,
শিয়রের কাছে নিবু নিবু এক দীপ কেঁপে কেঁপে জ্বলে,
তারি সাথে বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে।
ভন্ ভন ভন জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান,
এঁদো ডোবা হ'তে বহিছে তীব্র পচানি পাতার ঘ্রাণ।
ছোট কুঁড়েঘর, বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতের বায়ু—
শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু।
ছেলে কয় মা'রে—"কত রাত আছে, কখন সকাল হবে?
ভাল যে লাগে না, এমন করিয়া কেবা শুয়ে থাকে কবে?"
মা কয়—"বাছা রে। চুপটি করিয়া ঘুমো ত একটি বার।"
ছেলে রেগে কয়—ঘুম যে আসে না, করিব কি আমি তার?"
পাণ্ডুর গালে চুমো খায় মাতা, গায়েতে বুলায় হাত,
পারে যদি বুকে যত স্নেহ আছে ঢেলে দেয় তারি সাথ।
নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
"ছেলেরে আমার ভাল ক'রে দাও"—কাঁদে জননীর প্রাণ।
"ভাল ক'রে দাও আল্লা রসুল, ভাল ক'রে দাও পীর,—"
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে বহিয়া নয়ন-নীর।

বাঁশ-বনে বসি' ডাকে কাণা-কুয়ো রাতের আঁধার ঠেলি,
বাদুড়-পাখার বাতাসেতে পড়ে সুপারীর বন হেলি'।
চলে বুনো পথে জোনাকী-মেয়েরা কুয়াসা-কাফন ধরি'।—
দূর ছাই। কিবা শঙ্কায় মা'র পরাণ উঠিছে ভরি'।
যে কথা ভাবিতে পরাণ শিহরে তাই ভাসে হিয়া-কোণে,
"বালাই বালাই, ভাল হবে যাদু"—মনে মনে জাল বোনে।
ছেলে কয়,—"মা গো, কালকেই আমি হ'য়ে যাই যদি ভাল,
করিমের সাথে খেলিবারে গেলে দিবে না ত তুমি গাল ও ?
আচ্ছা মা বলো, এমন হয় না—রহিম-চাচার ঝাড়া
এখনি আমারে এত রোগ হ'তে করিতে পারে না খাড়া ?"
মা কেবল বসি' রুগ্ন ছেলের মুখ পানে আঁখি মেলে'
ভাসা-ভাসা তার যত কথা যেন সারা প্রাণ দিয়ে গেলে।
"শোন মা! আমার লাটাই কিন্তু রাখিও যতন ক'রে,
রাখিও ঢ্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাতনরি শিকা ভ'রে।
খেজুরে' গুড়ের নয়া পাটালীতে হুড়ুমের কোলা ভরি'
ফি-শিকা সাজাইয়া রেখো আমার সমুখ 'পরি'।"
ছেলে চুপ করে, মা-ও ধীরে ধীরে মাথায় বুলায় হাত,
বাহিরেতে নাচে জোনাকী-আলোয় থমথম্ কালো রাত।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া কত কথা পড়ে মনে।—
কোন দিন সে যে মায়েরে না ব'লে গিয়াছিল দূর বনে।
সাঁঝ হয়ে গেল, তবু আসে নাকো, আইঢাই মা'র প্রাণ।
হঠাৎ শুনিল আসিছে দুলাল হর্ষে করিয়া গান,

এক কোঁচ ভরা বেথুল তাহার ঝুমুর-ঝুমুর বাজে।—
"ওরে মুখপোড়া কোথা গিয়াছিলি এমনি একালি সাঁঝে ?" ৪৪
কত কথা আজ মনে পড়ে মা'র গরীবের ঘর তার ;
ছোটখাট কত বায়না ছেলের—পারে নাই মিটাবার।
আড়ঙের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটে নি, তাই
বলেছেন,—"মোরা মোসলমানের আড়ং দেখিতে নাই ! ৪৮
"করিম সে গেল ? আজিজ চলিল ?" এমনি প্রশ্নমালা
উত্তর দিতে দুঃখিনী মায়ের দ্বিগুণ বাড়িত জ্বালা।
আজও রোগে তার পথ্য জোটে নি, ওসুধ হয়নি আনা ;
ঝড়ে কাঁপে যেন নীড়ের পাখীটি জড়ায়ে মায়ের ডানা। ৫২
ঘরের চালাতে ভুতুম ডাকিছে ; অকল্যাণ এই স্বর ;
মরণের দূত এল বুঝি হায়, হাঁকে মায—দূর দূর।
পচা ডোবা হ'তে বিরহিণী ডা'ক ডাকিতেছে ঝুরি' ঝুরি'—
কৃষাণ ছেলেরা কাল্কে তাহার বাচ্চা করেছে চুরি। ৫৬
ফেরে ভনভন মশা দলে দলে, বুড়ো-পাতা ঝরে বনে ,
ফোঁটায় ফোঁটায় পাতা-চোঁয়া জল ঝরিছে তাহার সনে।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা,
সম্মুখে তার ঘোর কুজ্ঝটি মহাকাল রাত পাতা।
পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল,
আঁধারের সাথে যুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল। ৬২

—জসীম্ উদ্দিন

১৩১

কোকিলের প্রতি

কে তুমি বসন্তসনে আসিয়াছ নবীন অতিথি,
অমিশ্র-আনন্দ-ঘন সঞ্চারিণী শরীরিণী গীতি,
কোন্ গান শুনাতে ধরায় ?

করোজ্জ্বল কুসুমিত পল্লবিত ফুল্ল তরুলোকে
তুলিয়া পুলকপুঞ্জ সঙ্গীতের স্বপন কুহকে
কি অমৃত ঢালিছ হিয়ায় ?

ভূলোক দ্যুলোক মরি ! কণ্ঠ তব করিছে মুখর,—
যেমতি নির্ম্মল করে মেঘ-ঢাকা স্নিগ্ধ শশধর
বিপ্লাবিত করে দশ দিশি ;
কিংবা যেন ইন্দ্রধনু-বিমণ্ডিত জলদ তরল।
বিন্দু বিন্দু বারিধারে বিগলিয়া পিপাসা-বিহ্বল
ধরা-বক্ষে ধীরে যায় মিশি' !

কম্পিত তৃণের মুখে বরষার প্রথম চুম্বন,
কিংবা নব বারিপাতে কুসুমের মৃদু জাগরণ
যেন ওই সুরে বিজড়িত !
শীতল শিশির-মাখা শ্যামপত্রে ঢাকি' কলেবর
যে মৃদু কিরণ ঢালে হীরাতনু খদ্যোৎ সুন্দর,
স্বরে তব তা' যেন মিশ্রিত !

হরিৎ পল্লবে ঢাকা গোলাপের স্নিগ্ধ পরিমল
মাতাইয়া মধুচোর মলয়েরে করে যে পাগল,
চুরি করি, মূর্চ্ছনা তোমার ;

লুকাইয়া ভাবলোকে কবি-কণ্ঠ তুলে যে ঝঙ্কার,
যে গানের সুরে সুরে নরহৃদে পুলক-সঞ্চার,
লভে যে তা' তোমারি মাঝার !

কোথা সে সুবর্ণ-ক্ষেত্র ? কোথা সেই মাধুরী-নির্ঝর ?
কোথা সে গোপন-সিন্ধু—বক্ষে যার ও সুধা-লহর
নিরন্তর সন্তলীলা-রত ?

স্বরগের কোন্ স্বপ্ন, মরতের কোন্ মধুরিমা
জলে স্থলে বিতরিছে সঞ্জীবনী ও স্বর-পূর্ণিমা
মনপ্রাণ করিয়া পূর্ণিত ?

পুষ্প-শয্যা 'পরে শুয়ে শুনি ওই কুহক সঙ্গীত,
মনে হয়, ধরা যেন নহে আর পাষাণ-নির্ম্মিত,
মানবের কর্ম্ম-কারাগার ;

অনন্ত-সৌন্দর্য্যময়ী কায়াহীন আনন্দ-নিলয়
এ ধরণী, নাহি হেথা কামনার ক্ষণ পরিচয়,
ভব নহে ভোগের আগার ।

নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে যবে রহে পড়ি' নিঝুম ধরণী,
দূরে স্বার্থ-কোলাহল পড়ে ঘুমি' আপনা-আপনি,
চিত্তে যবে ইন্দ্রিয় নিশ্চল,

তখনি শ্রবণে মম অকস্মাৎ পশে তব ধ্বনি ;
শুনি' তাহা ভাবি মনে—চিদাত্মার মৃদু প্রতিধ্বনি
মর্ম্মে যেন জাগিছে কেবল !

শুনি ও সঙ্গীত তব, মনে হয় অতীতের মত,
আবার এ ধরণীতে সত্যলোক হবে সমাগত,
দ্বেষ হিংসা পাইবে বিলয় ;

না রবে শোণিত-তৃষ্ণা, মিথ্যাভাষ, দানব-আচার,
মানব দেবতা হবে ভু'লি তুচ্ছ স্বার্থ আপনার,
বিশ্বপ্রীতি পূরিবে হৃদয় ।

প্রেমের আকাশ-গঙ্গা ওই সুধা-সঙ্গীত মতন
মানবের ধূলিম্লান চিত্তভূমে বহিবে তখন,
লুপ্ত হবে কাম ভোগবতী ;

এক ধর্ম্ম, এক মর্ম্ম, এক কর্ম্ম, এক মন্ত্র ধরি'
বহুতার বহুরূপ বহু ব্যথা যাবে সে পাশরি'
বিশ্বাত্মারে করিতে আরতি ।

—ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

১৩২

নব বসন্ত

নব বসন্ত ইঙ্গিতে কার ফুটাল ফুলের কলিকা,
মধুপের দল গুঞ্জরি তোলে বন-বীথিকার গীতিকা।
রক্ত কমল নব অনুরাগে ফুটিয়া উঠিল তড়াগে ;
বনপথতল হইল পিছল আম্রমুকুল-পরাগে।
বকুলের রাশি ঝরিয়া পড়িল মৃদুল দখিনা বাতাসে,
সহকার-শাখে হাসিল মাধবী, কি যেন বলিছে কথা সে !
অশোকের মুখ রাঙা হ'ল লাজে না জানি কি কথা স্মরি যে,
কোকিলের গানে বিশ্ব-ভুবন বসন্তে লয় বরি সে !
সুর ভরা বাঁশী দূর হ'তে আসি আকুল করিল এ-হিয়া,
জাগে শোক-গাথা, হৃদে বাজে ব্যথা, আঁখি উঠে জলে ভরিয়া।
বসন্ত কি আসে বরষের শেষে জাগাতে ভুলানো স্মৃতিটি ?
দিকে দিকে জাগে ফাগুনের ফাগে কার মধুমাখা প্রীতিটি ?

—সালেমা খাতুন

১৩৩

পান্থশালা

বিরস বদনে দরবারে আসি' বসিলা বল্‌খপতি,
গত রজনীতে ঘটেছে ব্যাপার বিস্ময়কর অতি।
দ্বিযাম যামিনী, স্তব্ধ ধরণী, নিদ্রিত নৃপ ঘরে,
সহসা বিষম শব্দ হইল প্রাসাদের শিরোপরে !

ভাঙ্গিল সুপ্তি, সুধান্ নৃপতি বজ্রকঠোর স্বরে,
"কে তুমি কোথায় ? কি কাজে গিয়েছ রাত্রি দ্বিপ্রহরে ?"
বিনয়-বচনে কহিল, "রাজন। উষ্ট্রচালক আমি ;
হারায়েছে উট, খুঁজিতে তাহারে ফিরিতেছি ভ্রমি ভ্রমি।"
ক্রুদ্ধ ভূপাল কহিলা, "মূর্খ। উষ্ট্র কি ছাদে আসে ?
কহিল রাখাল, "তবে কি রাজন! এমন বিলাস-বাসে
সুখের শয়নে সুপ্ত রহিলে মিলে সে সর্বেশ্বর ?
তোমার আমার কা'র কাজ বল অধিক হাস্যকর ?"
ক্ষুব্ধ নৃপতি উঠিয়া বসিলা, মরমে জাগিল ব্যথা,
চিত্তের মাঝে ধ্বনিল তাহার কত না গোপন কথা।
পোহাল রজনী, গাছে গাছে পাখী গাহিল ভজন গান,
তখনো ভূপাল শয্যায় বসি' চিন্তায় ম্রিয়মাণ।
ভাবিতে ভাবিতে দরবারে গিয়া বসিলেন মহারাজ,
বিক্ষত প্রাণ কহিল কাঁদিয়া—"ছাড় এ তখত তাজ।
বিশ্বের পথে বাহিরিয়া যাও, তবে তো পাইবে দেখা,
ধনের অর্ঘ্যে তুষ্ট নহে সে, প্রাণ চায় প্রাণসখা।
ত্যাগে ধরা দেয়, বিলাসে পলায়, এমনি স্বভাব তা'র,
অসার লইয়া মজিয়া রহিলে, কেমনে পাইবে সার ?"
মরমের কথা মরমে গুমরি বাহির হইতে চায়,
বুক ফাটে দুখে, কে বুঝে পরাণে কি ঝড় বহিয়া যায়।
সহসা সেথায় পশিল অচেনা সন্ন্যাসী এক আসি,
নয়নে তাঁহার বিদ্যুৎ-ছটা, মুখখানি হাসি-হাসি

দ্বারী দ্বারপথে রহিল দাঁড়ায়ে কাষ্ঠপুত্তুল প্রায়,
সভাজন যত মৌন-মোহিত, এ উহার পানে চায়।
সম্ভ্রমে নমি' কহিলা ভূপতি, "হে পূজ্য তাপসমণি।
কোন দ্রব্যে তব কহ আকিঞ্চন, দিব তাই ত্বরা আনি।"
কর্কশ ভাষে কহে মহাজন "দ্রব্যে কি মোর কাজ ?
বিশ্রাম-আশে আসিয়াছি এই পান্থশালায় আজ।"
যুড়ি' দুই পাণি কহিলা নৃমণি, "এ নহে পথিকাবাস ;
ভুল ক'রে প্রভু, এসেছেন হেথা, এ গৃহে আমার বাস।"
"বটে" "বটে" বলি' হাসিলা তাপস, সুধাইলা আরবার,
"তোমার পূর্বের এই গৃহমাঝে বসবাস ছিল কা'র ?"
বাদশা বলেন, "পূর্বপুরুষ ছিলেন আমার হেথা ,"
সাধু ক'ন, "বাছা, ভেবে দেখ তবে এখন আমার কথা—
কেহ এই গৃহে করে নাই বাস চিরদিন একভাবে ;
একজন পরে আর একজন এসেছে, গিয়েছে, যাবে।
তুমি চ'লে গেলে আসিবে অন্য, থাকিবে সে এই গৃহে ;
তবে কেন বল, তব গৃহ ইহা,—"পথিক-নিবাস" নহে ?"
প্রাণের ক্ষতটি দ্বিগুণ করিয়া সাধু গেল পথে চলি',
বাদশা ভাবেন, স্বর্গের দূত গেল বুঝি তারে ছলি'।

—সেখ ফজলল করিম

১৩৪

স্বর্গ ও নরক

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক ? কে বলে তা' বহুদূর ?
মানুষেরি মাঝে স্বর্গ নরক,—মানুষেতে সুরাসুর !
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,
অত্মগ্লানির নরক-অনলে তখনি পুড়িতে হয় ।
প্রীতি-প্রেমের পুণ্য-বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়ে-ঘরে ।

—সেখ ফজলল করিম

১৩৫

খোদেজা বিবির প্রতি

ঘন ঘোর অন্ধকারে আরব-গগন
যবে সমাচ্ছন্ন, দেখি, আরব সন্তান
কু-আচারে ব্যভিচারে ঘোর নিমগন,
সে সময়ে যে বীরেন্দ্র, মানব প্রধান,
জ্ঞানের বিমল জ্যোতি করি' বিতরণ
নাশিল তিমিররাশি, সকলের আগে

চিনিলে তাঁহারে তুমি। করিয়া যতন
শত ভালবাসা দিয়া শত অনুরাগে
বরিলে সে বরবপু, একাগ্র অন্তরে
স্থাপিলে বিশ্বাস দেবি, ইস্‌লাম-উপরে।

কত যুগ মিলাইল কালের প্রবাহে,
তবু দেবি, তব কথা মোস্‌লেমের গেহে
ভক্তিভরে নবোৎসাহে হয় উচ্চারিত
প্রতিদিন, শত শত ভক্ত-রসনায়;
তোমার কাহিনী গায, করি' বিমোহিত
প্রতি মোস্‌লেমের প্রাণ। প্রত্যেক হিয়ায়
যাচে বর— কন্যা জায়া হউক তাহার
তব মতো পতিপ্রাণা, সতীত্ব আধার,
তব মতো ধর্ম্মে তার হোক স্থির মতি,
তব মতো প্রতিকর্ম্মে ধর্ম্মে থাক মতি।

তোমারি মতন তারা পতি-বুকে থাকি',
প্রকৃত কর্ম্মের পথে নিক তাঁরে ডাকি'।

—সৈয়দ্ এম্‌দাদ্ আলী

১৩৬

ঈদ

কুহেলি তিমির সরায়ে দূরে
তরুণ অরুণ উঠিছে ধীরে
রঙ্গিয়া প্রত্যেক তরু-শিরে
আজি কি হর্ষ-ভরে !
আজি প্রভাতের মৃদুল বায়
রঙ্গে নাচিয়া যেন ক'য়ে যায়,—
"মোস্‌লেম-জগতে" আজি একতায়
দেখ কত বল ধরে !
হের আজি সবে শুভ লগ্নে মিলি'
দ্বেষ-হিংসা সব দূরে ঠেলি ফেলি
ভাই ভাই বলি করে কোলাকোলি ;
সে দৃশ্য কি মধুময় !
আজিকে যেন রে আসিছে ভাসি,—
নন্দন-কুসুম-গন্ধ-রাশি,
আমারি পরাণে জাগায়ে হাসি,—
আশার লহরীচয় !
আমি প্রভাতের সুস্নিগ্ধ বায়,
নিশা শেষে লভি' জনম হায়,
যুগ যুগ ধরি বিপুল ধরায়,
উত্থান-পতন হেরি,

কত সখ্য-ঐক্য-প্রীতির কথা,
কত সুকবির হৃদয়ের ব্যথা
কত বীরেন্দ্রের তেজোময়ী গাথা,
শুনিনু শ্রবণ ভরি'।

কিন্তু গো সকলি মানে পরাজয়
সে দৃশ্যের কাছে, যে দৃশ্যনিচয়
হেরে'ছি মোস্‌লেম-জগৎময়,
আজি পুণ্যের পুলকে।

সব গেছে তবু সে ধর্ম্ম-বন্ধন
আজিও অটুট রয়েছে তেমন,
তেমনি করিয়া মোস্‌লেম-জীবন
ভাসে সে আশার আলোকে!

কত নিদ্রিত হায় জাগি' ভবে,
নেচে ছুটে যায় জীবন-আহবে;
মোস্‌লেম শুধুই পড়িয়া রহিবে
অনন্ত আঁধার ঘোরে?

সে কি জাগিবে না, সে কি হাসিবে না?
দিনেকের এই অক্ষম চেতনা
সক্ষম করিয়া, উন্নতির পথে
যাবে না সে বেগ-ভরে?

—সৈয়দ এমদাদ্ আলী

১৩৭

চণ্ডীদাস

প্রণাম তোমারে, হে আদি উৎস,
বঙ্গভাষার অগ্রদূত !
বঙ্গভারতী তোমারি কণ্ঠে
স্ফূর্ত্তি লভিল কি অদ্ভুত !
সহজ ভাষায় সহজ ভাবের
ওহে সহজিয়া সহজ-প্রাণ !
তব সঙ্গীত-নির্ঝরে হ'ল
বঙ্গবাণীর প্রথম স্নান !
না ছিল দেউল, না ছিল আসন,
না ছিল মন্ত্র অর্চ্চনার ;
তুমি পল্লবে রচিলে কুটীর,
তৃণ-বেদী দিলে আসন মা'র ।
নব উৎপল তুলি 'সর' হ'তে
রাখিলে যতনে বেদীর পাশ ;
উপচার শুধু তব কণ্ঠের
আবেগ-পূরিত গীতোচ্ছ্বাস ।
দীনের কুটীরে দীনতা-নাশিনী
রূপময়ী যেন উষার রবি,
শ্বেত-বাস-পরা শ্বেতভুজা বাণী
আসিল তোমার স্বপন-ছবি ।

তৃণ-বেদী' পরে বসিলা জননী,
বীণা শোভে তাঁর অতুল করে ;
স্থাপিলা কোমল কমল-চরণ
তব তোলা সেই কমল' পরে।
তুমি গাহ গান, দেবী শোনে বসি ;—
ঝরে ঝর-ঝর সুধার ধারা ;
হে সহজ, তব সহজ পূজনে
মুগ্ধা সে দেবী উদাস পারা।
তখনও দেবীর কুঞ্জ মুখরি'
গাহেনিকো শ্যামা, গাহেনি পিক ;
তুমি এলে সেথা উষারও অগ্রে
ঝঙ্কারে ভরি' সুপ্ত দিক্।
তোমার প্রাচীন সে ভাষা আজিও
নহেক প্রাচীন, নবীন অতি ;
আজও বাঙ্গালীর কণ্ঠে সে ভাষা
নাচে উল্লাসে ছড়ায়ে জ্যোতি।
শুধু প্রেমরীতি, হে মহাপ্রেমিক
শিখাইলে তুমি প্রেমিকগণে।
শিখালে—"মানুষ সবার উপরে,
ভালবাসা দিও জনে ও জনে।"
প্রেমিক, সাধক, অতুল গায়ক,
আদি কবি তুমি মানব-মিতা ;
আদি তুমি তবু অনাদি নূতন,
প্রণাম, বঙ্গভাষার পিতা।

—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

১৩৮

গৃহবধূ

দূর গ্রামে মেটে-ঘরে সখী মোর থাকে,
একবার গিয়েছিনু দেখিতে তাহাকে ;
কী মধুর শান্তি ল'য়ে ছিনু তা'র কাছে,
আজো যেন সেই স্মৃতি বুকে ভ'রে আছে।

বুড়ো স্বামী, তার চেয়ে আরো কত বুড়ী
মরণ-দুয়ার-ঘেঁসা স্থবিরা শাশুড়ী,
ক্লান্তিহীন সেবা দিয়ে যেন দু'জনায়,
রেখেছে আড়াল করি, আপন ছায়ায়।

যতনে রোপিত গাছ, গাভী দুটো তা'র
কত যে স্নেহের ধন নয় বলিবার।
শাশুড়ী-স্বামীর তবু পায় সে কি মন ?
তিলেক ত্রুটীতে কত সহে যে শাসন !
সর্ব্বতাপহরা তবু হাসিমুখ তা'র ;
আপন অন্তরে সে কি পায় পুরস্কার ?

—উমা দেবী

১৩৯

মেনি

মোদেরি ঘরের ওই সমুখের পথে--
এক ধারে ছেঁড়া পাটি পেতে কোনো মতে—
রোজ দেখি বসে এক মেয়ে গোলগাল,
সাজায়ে পুতুল আর ঘটী বাটি থাল।

আঁটসাঁট বাঁধা চুল, পিছে দোলে বেণী,
তাই নিয়ে খেলা করে তা'রি পোষা মেনি ;
সেদিকে খেয়াল নেই, আপনার মনে
"বেনে-বউ" পুতুলেরে সাজায় যতনে।

একদা শুনিনু—তা'রে "চাঁপা" "চাঁপা" বলি'
দূর হ'তে কে ডাকিল,—ছুটে গেল চলি'।
সে সুযোগে মেনি তা'র পুতুলের ঝুড়ি
ভেঙ্গে চুরে দিয়ে মহা খেলা দিল জুড়ি'।
চাঁপা এসে কেঁদে ওঠে দেখে এই দশা,
মেনিরে মারিতে গিয়ে চুমিল সহসা॥

—উমা দেবী

১৪০

আকবর

হে সম্রাট্, ব'সে আছি আজি তব সমাধির পাশে,
একান্ত বিজন।
দূর হ'তে অরণ্যের অন্ধকার ভেদি' ভেসে আসে
বিহগ-কূজন।

নীরব মধ্যাহ্ন-বেলা, শব্দহীন নিঃসাড় ভুবন,
কেহ কোথা নাই ;
অকস্মাৎ মর্ম্মরিল তরুশাখে মন্থর পবন
চমকিয়া চাই।

জীবনের গতি হেথা আসিয়াছে মন্দ হ'য়ে ধীরে,
নাহিক স্পন্দন ;
বন্দী হ'য়ে কেঁদে ফিরে সমাধির পাষাণ-প্রাচীরে
স্মৃতির ক্রন্দন !

কত দিবসের ব্যথা জীবনের আবেগ উত্তাল
গিয়াছে নিভিয়া ;
স্মৃতির কন্দরে মম শতাব্দীর অন্ধকার-জাল
উঠে শিহরিয়া।

তোমার হৃদয় ভরি' জেগেছিল কি মহা স্বপন !—
এ ভারতভূমি,

এক ধর্ম্ম, এক রাজ্য, এক জাতি, একনিষ্ঠ মন,
বেঁধে দিবে তুমি !

সমাজ-আচার-ভেদ, মর্ম্মভেদ ভুলে যাবে সবে ;
রহিবে স্মরণ—
এক মহাদেশে বাস, চিরদিন একসাথে হবে
জীবন মরণ !

হায় ! স্বপ্ন টুটে যায় কঠিন ধরার ধূলা লাগি' !
দেখি আঁখি মেলি'—
ক্রূর সর্প-সম হিংসা হিয়া-তলে রহিয়াছে জাগি',
উঠিছে উদ্বেলি'

বিদ্বেষ, সমুদ্র সম আস্ফালিয়া করিয়া গর্জ্জন
ছাইয়া হৃদয় ;
নীরব আকাশ-তলে প্রতি পলে বাজিছে ক্রন্দন,
রক্তধারা বয় !

ধরণীর শ্যাম শোভা ক্লিস্ট আজি রক্তের ধারায়,
ভা'য়ের শোণিতে ;
আকাশের শান্ত সৌম্য নীরবতা স্থধু ভেঙ্গে যায়
সংগ্রাম-ধ্বনিতে !

স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব লাগে, রক্ত ঝরি' পড়ে অহর্নিশি,
উঠে শূন্য-পানে

ক্রন্দন-গর্জ্জন-রোল, অভিশাপ-হাহাকার মিশি',
কাহার সন্ধানে ?
তোমার সমাধি-পাশে বসি' আজি পড়ে মোর মনে
তোমার কীরিতি ;
নিখিল ভারত ভরি' উঠেছিল ধ্বনিয়া গগনে
মিলনের গীতি !
তোমার মহৎ হিয়া পুনর্ব্বার আসুক ফিরিয়া
আমাদের মাঝে ;
আত্মদ্বন্দ্ব-সর্ব্বনাশ আমাদের রেখেছে ঘিরিয়া
অপমান লাজে !
হে মহৎ, তব বাণী নিখিল ভারত ভরি' আজি
জাগুক আবার ;
উঠুক মিলন-মন্ত্র সাম্যবাদে কম্বুকণ্ঠে বাজি'
টুটিয়া আঁধার !
হিংসা-দ্বেষ—মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো—শঙ্কাভরে
হোক্ শান্ত হোক্ ;
আঁধারের প্রাণী যত ফিরে যাক্ আঁধার বিবরে,
নামুক আলোক !

—হুমায়ুন কবীর

১৪১

সাথী

আজি মোর মনে পড়ে একদিন ভেবেছিনু মনে
রচিব এ ধরণীতে আপনার লাগি' সযতনে
নিরালা বিরাম-কুঞ্জ। সংসারের সংগ্রামে যুঝিয়া
ঘটনার নিত্যঘাতপ্রতিঘাত পরিশ্রান্ত হিয়া
সেথায় টানিয়া লব বিশ্রামের লাগি। সুগোপনে
ঝরিবে অমৃতধারা, দিবানিশি বরষিবে মনে
স্নেহের সান্ত্বনাবাণী। উৎসবের বাঁশী দিবারাতি
বাজিবে সেথায় মৃদু—সেই সুখগৃহে হবে সাথী
পরিজন স্নেহপ্রীতি, চিন্তাহীন বাধাহীন হাসি।

আজি আর সেই স্বপ্ন নাহি মম নয়নের আগে
চন্দ্রানিশীথের মায়া নিদাঘের দীপ্ত রবিরাগে
মিলাইল অকস্মাৎ, প্রভাতের পুষ্পের অন্তরে—
নিশির শিশিরবিন্দু দিবসের রুদ্র সূর্য্যকরে—
শুকায় যেমন করি'। আজি যবে দেখি' আঁখি মেলি
তরঙ্গিত সিন্ধুসম এ জীবন উঠিছে উদ্বেলি'
সংগ্রামের আবাহনে, নাহি সেথা স্নেহপ্রীতিমায়া,—
সকলের নয়নের অন্তরালে নাহি স্নিগ্ধ ছায়া,—

সেথা মুক্ত নভোতলে ঝঞ্ঝা বহে দিবসরজনী
অনাবৃত নগ্নপথে চলিয়াছে পুরুষ রমণী—
অন্তরের দীপখানি সযতনে জ্বালি'। পথ ভরি'
কণ্টকিত তরুলতা, অন্ধকারে উঠিছে গুমরি
হিংস্র সর্প ফণা মেলি'। ক্ষণে ক্ষণে উঠিছে নিশ্বসি'
দুর্ম্মদমাতাল বায়ু, মেঘপুঞ্জ-তিমির ঝলসি'
শাণিত বিদ্যুতরেখা! সে পথে যে হবে মোর সাথী
তাহারে চলিতে হবে কণ্টকিত পথে দিবারাতি।
তাহারে দাঁড়াতে হবে এ ভুবনে নগ্ন উচ্চশিরে—
নিঃশঙ্ক অন্তরে পথ চলিবারে নিবিড় তিমিরে,
বিপদ্ আঘাত সহি' শঙ্কাকুল পথে হাত ধরি',—
চাহি একে অপরের মুখপানে মরণ উতরি'
দিবসরজনী হবে স্থির-আঁখি—চলিতে সম্মুখে।

—হুমায়ুন কবীর

১৪২

তাজের স্বপ্ন

“চোখের দৃষ্টি হ’য়ে আসে ক্ষীণ,
দেহে কমে আসে বল।
ধীরে ধীরে হায় দীপ নিভে যায়—
আঁধার ভূমণ্ডল!

গত যৌবন, আজি দেহমন
জরার বিজয়-ভূমি,
দরদী আমার, দুর্দ্দিনে আজ
কোথা মমতাজ তুমি!

এপারেতে এই দুর্গ-ঝরোখা, ওপারে কবর তোর!
মাঝে নীল জল, যমুনা উছল! অশ্রু দরিয়া মোর!
ওপারেতে ওই স্বপনের প্রায়
আধ-আলো-আঁধিয়ারে

কালো পাথরের সমাধি ফুটেছে
সবুজ ঘাসের আড়ে।
সেথা মোর প্রেম ধরি’ তৃণরূপ
জনমি’ নিত্য নব

সাজাইতে চায় সবুজ শোভায়
কঙ্কালগুলি তব!

এখনো নিবিড় হয়নি তিমির,
এখনো দেখিতে পাই
সজল, ডাগর আঁখিতে তোমার
ওপারে নিদ্রা নাই !
এপারের এই চোখেতে কখন নামিবে অন্ধকার !
ওই ছোট দু'টি শিলার সমাধি দেখিতে পাবো না আর !

"রাজার তক্তে বসিয়াছি যবে
পরম পুণ্যবলে
রাজ-প্রেয়সীরে দেবো না ডুবিতে
বিস্মরণীর জলে !

যতদিন আছে চোখের দৃষ্টি,
রয়েছে সিংহাসন,
তোমারে মহিষি, অমর করিতে
করিব পরাণ পণ !

তোমার ও-কালো সমাধির 'পরে
দুধিয়া পাথর দিয়ে
অপরূপ এক রূপ-নিকেতন
গড়িয়া তুলিব প্রিয়ে !

খুঁজিয়া খুঁজিয়া তামাম দুনিয়া
শিল্পী আনিব ডেকে,

অপরূপ তাজ দিবে, মমতাজ,
সমাধি তোমার ঢেকে।

দিন-দিনান্ত, যুগ-যুগান্ত, বাহি' অনন্তকাল,
বিশ্ব-মানব বিস্ময়ে চাহি' হেরিবে তাজমহাল!
"কোটি ক্রোশ হ'তে কোটি কোটি লোক
মিলিবে হেথায় এসে,

কোটি প্রেমিকের মিলন-তীর্থ
হ'বে এ কবর শেষে!
এক সুরে মিলে উঠিবে হেথায়
একটি প্রেমের গান,
লভিবে সে সব সঙ্গীত রব
একটি স্বরগে স্থান!
নশ্বর দেহে প্রাণ দিব আমি র'বে না পাষাণ স্তূপ—

নিখিলের লোকে দেখিবে ইহার নিত্য নূতন রূপ!
"যবে মোর শেষ দিবসের আলো
ম্লান হবে আঁখিপুটে
সে দিন নয়নে যেন তাজখানি
সুমুখে ভাসিয়া উঠে।

কি জানি আঁধার ভাগ্যে আমার
কি আছে লিখন শেষে,

বুড়া শাজাহান নিহত হ'বে কি
বাঁচিবে বন্দী-বেশে !

যদি মোর ছেলে রাজ্যের লোভে
আমারে বন্দী করে,
ভিক্ষা করিয়া ল'ব একটুকু
ঠাঁই, এ দুর্গ-প'রে ;

সেথা নিশিদিন বসিয়া রহিব চাহিয়া তাজের দিকে
বেদনা যাতনা মধু হ'য়ে যা'বে বিষ হ'য়ে যা'বে ফিকে !
"যদি আঁখিতারা হয় জ্যোতিহারা সেই আঁখি দু'টি ল'য়ে
ওই তাজপানে ফিরাইয়ে মুখ রহিব তুষ্ট হ'য়ে !
যদি তার পর হয়ে যায় শেষ, যেন এ দেহটি মোর
ধীরে ধীরে দেয় তাজের তলায় শোয়ায়ে পাশে তোর !

—রামেন্দু দত্ত

১৫৩

শীতের শেষে

শীতের শেষে' ভীরুর মত
কে এলি তুই, বল ?
শিশির ফোঁটায় ঐ যে টোপায়
তোরি চোখের জল।

তুই এলি মোর কুঞ্জ বনে
ফাল্গুনে আজ সঙ্গোপনে,
অমনি ফুটে উঠ্‌লো আমার
ফুল-কলিদের দল !

ঘুমিয়েছিল আমার নিখিল
আঁধার কুয়াশায়
স্বপন মাঝে তোমায় পাবার
বিপুল দুরাশায়,

আজ ভোরে তার ঘুম ভাঙ্গালে ;
দখিন হাওয়া গন্ধ ঢালে,—
তোমায় হেরি কানন ঘেরি,
ফুলেরা চঞ্চল।

রাঘেন্দু দত্ত

১৪৪

কবির বীণা

আমার হাতে তুলিয়া দেছ
এই যে বীণাখানি
সুরের লীলা তাহার সাথে
চলিছে না সে জানি।
ছন্দ-তলে লুকিয়ে আছে
বিপুল ঘন ব্যথা,
ইন্দ্রধনুর অন্তরালে
মেঘের ব্যাকুলতা।
এই যে আলো-হাসির মাঝে
ছায়ার ঘন কাঁদন বাজে—
শুনিতে পেনু ইহার মাঝে
বিপুল তব বাণী।
তুলিয়া দিলে এই যে বীণা
কঠিন মম হাতে,
গুঞ্জরিতে মোহন ধ্বনি
সকল দিনে-রাতে;
বাজাতে এরে নাই-বা যদি
জানি গো প্রিয়তম,
আপন গুণে সরম-লাগা
সকল ত্রুটি ক্ষমো।
ঘর-ছাড়ানো এই সে বীণা
অনেক যেন কালের চিনা,
জনম হতে জনম ব্যাপি
ফিরেছে মোর সাথে।

—বন্দে আলী মিঞা

১৪৩

শারদলক্ষ্মী

বাতাসে বাজে নূপুর এমন বেলা
এলো কে ভাসিয়ে নভে মেঘের ভেলা ?
সবুজ ঘাসের পরে জ্বলিছে নীহার
সফেদ শেফালী হলো কণ্ঠের হার ;—
কাশের ফুলেতে তাঁর চামর দোলে
মেঘেতে মেঘেতে ঘন মৃদঙ্ বোলে।
সোনালি জরির বাস আলোক লতা
টগর শাখায় জাগে চঞ্চলতা,
পাপড়ি মেলিয়া ডাকে কুমুদ কুঁড়ি
আল্‌পনা আঁকে মাঠ আঙ্গন জুড়ি
বকুলে চাঁপায় গেছে কানন ছেয়ে
তার পরে পদ রাখি কে আসে মেয়ে ?
যে আসে মোদের ধরায় একা একা—
ভুবন ভরিয়া তার পেয়েছি দেখা।

—বন্দে আলী মিঞা

১৪৬

অন্ধের ব্যথা

আকাশের আলো দেখি নাই আমি,
অরুণ আমারে দিয়েছে ফাঁকি ;
অকরুণভরে চিরতরে মোরে
বিধাতা আঁধারে রেখেছে ঢাকি !
দিন গুণি শুধু দিন গুণি ;
সুখ-স্বপনের জাল বুনি
মনের খেয়ালে নিশিদিন ধ'রে
রঙ্গের তুলিতে ছবি আঁকি ;
আশার কুহকে মরীচিকা রচি
হতাশার জ্বালা জুড়ায়ে রাখি !
দেখিনি শিশুর উল্লাস গতি
কলরোল শুধু ভাসিয়া আসে,
তারা কি আমার অন্ধতা হেরি
বিদ্রূপ করি এমন হাসে ?
মা'র হাসি ওগো মা'র ছবি,
আঁকা আছে মোর হৃদে সবি,
কেমনে জানাব কি যে শিহরণ
তোলে জননীর ব্যথিত শ্বাসে ;
সামালিয়া হায় রাখিতে যে নারি—
বুক ঠেলে মোর কান্না আসে।

কুসুমের শোভা জানি না কেমন,
সৌরভ তবু হৃদয় হরে ;
উদাসী পবন পথ ভুলে বুঝি
অন্তরে মোর লুটায়ে পড়ে !
বিফল-জীবন একা বহি,
কেমনে সবার কাছে রহি ?
চারিদিক হতে সুরের পরশ
আমারে যে এসে পাগল করে !
বাঁধন যতই টুটিবারে চাহি
ধরণী ততই আঁকড়ি ধরে !
করুণায় গলি আসে বুঝি সবে
মিতালি করিতে আমার সাথে ;
কত ব্যথাতুর মমতা-মধুর
সুনিবিড় ডোরে আমারে গাঁথে।
এত সুখ আমি কোথা রাখি,
দীনতা আমার কিসে ঢাকি ?—
স্নেহের সুধায় বুক ভ'রে যায়,
হৃদয় আমার উলসি মাতে !
নয়ন-পাতায় পাইনি যাহায়—
দেখি সে যে আছে পরাণ-পাতে !

—শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ

১৪৭

প্রতিশোধ

ঘৃণা করি আমায় যারা
ব্যথাই হানে নিতি,
আজকে পাঠাই তাদের তরে
মোর হৃদয়ের প্রীতি,
বন্ধু নহে, শত্রু যারা,
চক্ষে বহায় অশ্রুধারা,
পলায় দূরে, অন্তরেতে
ভীষণ সায়ক হানি'
আজকে ভালবাসব তাদের
বক্ষে লব টানি'।
কর্‌ল যে জন কৃতঘ্নতা
"মারীচ" সম আসি'
ছল করি যে জানায় মুখে—
"বড়ই ভালবাসি,"
চতুর সাজি আমায় যারা,
চায় ভুলাতে কথার দ্বারা,
পাঠাই শুভ-কামনা মোর
তাদের লাগি' আজি,
চাই ধোয়াতে নয়ন-জলে
সবার চরণ-রাজি।

ফুল বলি যে কণ্ঠে দিল
কণ্টকেরি মালা.
আজকে রে মন তাহার লাগি'
প্রাণের প্রদীপ জ্বালা,
গান্ গেয়ে তুই চল্ পুলকে
ভূলোক ভরি প্রেম-আলোকে,
বল "প্রতিশোধ দিবই আজি
কৃতঘ্নতার তরে,
প্রেম দিয়ে জয় সবার হৃদয়
করব সোহাগ ভরে।"

—কাদের নওয়াজ

১৪৮

বিধাতার ভিক্ষা

হাশরের দিন বিচারে বসিয়া
সুধা'বে জগৎ স্বামী
"তুমি তো আমার কর নাই সেবা
রুগ্ন ছিলাম আমি!"
কহিবে মানব, "তব সেবা হায়
ওগো নিখিলের প্রভু,
সাধ্য কি মোর? নারিনু বুঝিতে।"
কহিবে তখন বিভু—

"ভৃত্য আমার রুগ্ন আছিল
সে কথা কি মনে আছে ?
সেবিলে তাহারে মোর দেখা তবে
পাইতে তাহার কাছে।"
আবার বিধাতা সুধা'বে তখন,
"আদমের সন্তান,
ক্ষুধায় কাতর অন্ন চেয়েছি,
করনি অন্ন দান।"
কহিবে মানব, "রাজ্জাক, ওগো
তুমি নিখিলের স্বামী,
তোমারে কেমনে অন্ন দিতাম
নারিনু বুঝিতে আমি।"
কহিবে আল্লা, "বান্দা আমার
অন্ন চাহিল দান,
যদি তারে দিতে, আজি হেথা তবে
পেতে তার প্রতিদান।"
আবার কহিবে, "আদম তনয়,
চাহিলাম আমি জল,
পিপাসায়.বারি দাওনি আমায়
এত ছিলে বিহ্বল ?,,
কহিবে সেজন, "তুমি পরমেশ,
তুমি চেয়েছিলে বারি ?

তোমার পিপাসা, অখিলের প্রভু,
আমি কি মিটাতে পারি ?”
আল্লা কহিবে, “বান্দা আমার
মাগিল তৃষার জল,
দাওনি তাহারে, দিতে যদি তবে
পেতে আজি তার ফল।”

—আবুল হাসেম

১৪৯

পিতা স্বর্গ

নীল আকাশের কোন্‌খানে ঐ
নীল আকাশের কোন্ কোণে,
পরীরা সব কর্‌ছে খেলা পারিজাতের ফুলবনে ?
মিথ্যে অলীক কল্পনা—
কামধেনু আর কল্প লতার ছলনাতে ভুল্‌ব না !
তুমি আমার স্বর্গ পিতা, তুমিই আমার দেব্‌তা গো !
দাও চরণের পুণ্য ধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য !

হোম আরতি ঘিয়ের বাতি তপ-তপস্যার আড়ম্বর,
জপ্‌ব না নাম, ন্যাস প্রাণায়াম কর্‌বনাকো অতঃপর।
কাজ কি মিছে জঞ্জালে !

কি হবে মোর চক্ষু বুজে আসন পেতে বাঘছালে ?
তুমিই আমার তপ-তপস্যা, তুমিই আমার দেব্‌তা গো !
দাও চরণের পুণ্য ধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য !

জানিনিকো শৈশবে, আর মানিনিকো যৌবনে,
পাপ করেছি হাজার হাজার আদেশ-নিষেধ-লঙ্ঘনে।
অপরাধ আর দোষ ত্রুটী
ক্ষমা করো, ভিক্ষে মাগি জোড় ক'রে মোর হাত দুটি।
ঠেকিয়ে মাথা তোমার পায়ে আর মাগি এই ভিক্ষা গো—
দাও চরণের পুণ্য ধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য !

তোমার অতল স্নেহ-শীতল পরশখানি মোর প্রাণে
বুলিয়ে দে' যায় শান্তি-সুখের কি অমৃত কে জানে ?
মনে মনে হয় ধোঁকা—
আজো আমি তেম্‌নি তোমার ছোট্ট কচি সেই খোকা !
আড়াল ক'রে আগ্‌লে আছ যা-কিছু ঝড় ঝঞ্ঝা গো !
দাও চরণের পুণ্য ধূলি—নাও হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য !

—কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

১৮০

চাষী

ওরে আমার গাঁয়ের চাষী !
ওরে আমার দুঃখী ভাই !
সবার লাগি' অশ্রু ঝরে,
তোর দুখে মোর অশ্রু নাই !

কে জানে কোন্ কুটীর-তলে
অজানা কোন্ পল্লী-বাটে,
না জানি হায় ! দুঃখে সুখে
কেমনে তোর জীবন কাটে,—

কেমনে তোর জোটে, ও ভাই,
দুবেলা দুই অন্ন-মুঠি,
প্রিয়ার শতছিন্ন শাড়ী,
মেয়ের হাতের কাঁকণ দু'টি !

সজল চোখে ছেলের পানে
চেয়ে থাকিস আপন ভুলে,
পারিস্‌নি তাই কপ্‌নি ছাড়া
দিতে কিছু অঙ্গে তুলে ;

কুটীরখানি পড়-পড়,
মহাজনের রক্ত-আঁখি,

খেটে খেটে শীর্ণ, তবু
জমিদারের খাজনা বাকি।
পিতল কাঁসা বাউটি তাগা
পেটের দায়ে বাঁধা আছে,
কান্না চাপিস্ প্রিয়া যখন
রিক্ত-দেহে দাঁড়ায় কাছে।

ভাবিস্ কভু, সেবার কবে
বিশ বছরের লায়েক ছেলে
মহামারীর করাল গ্রাসে
কেমন ক'রে দিলি তুলে ;—

পারিস্‌নিকো একটি ফোঁটা
ওষুধ দিতে শুষ্ক মুখে,
ডালি দিয়ে সোনার দেহ
ফিরে এলি ভাঙ্গা বুকে!

আঁকি তবু রঙীন ক'রে
কল্পনাতে তুলি দিয়া,—
আঁকি তোরে সোনার চাষী,
কলসী-কাঁখে চাষীর প্রিয়া,

ঢলঢল অঙ্গ-শোভা
ঘোম্‌টা-আড়ে কাজল-আঁখি ;—

কত মধুর প্রেমের ছবি
নিত্য নূতন বর্ণে আঁকি !
হেরি তোরে সকাল-সাঁঝে
ধানের ক্ষেতে কাস্তে হাতে,—
ঢেউ তুলে যায় পাগল হাওয়া
মেঠো সুরের মূর্চ্ছনাতে ;

পল্লী-মায়ের শ্যামল বুকে,
নদীর তীরে, তরুর মূলে,
কবির চারু কল্পনাতে
হেরি তোরে হৃদয়-ভুলে।

কে বুঝে তোর দুঃখ ও ভাই ?
কে শোনে তোর দীর্ঘশ্বাস ?
কে জানে তোর অর্দ্ধাহারে
দিন কাটানো বর্ষ মাস ?

তৃষায় কোথা লভিস বারি,
ক্ষুধায় কোথা অন্ন জোটে,—
আপন মনে কাব্য রচি,
সে খোঁজ আমার নাইকো মোটে !

অনশনে দিবস যাপি’
যোগাস্ আমার অন্ন-থালা,

আমার দেহ-সজ্জা তোরি
নগ্নদেহের শোণিত-ঢালা !

হোক্ সে ;—তবু কল্পনাতে
আঁকি তোরি মোহন ছবি ;
ক্ষুধায় যদি মরিস্, তবু
কাব্যে তো তুই অমর হবি !

—পরিমলকুমার ঘোষ

১৫১

কবির কামনা

অসীম সমুদ্রমাঝে ক্ষুদ্র বারিকণা,
মিলাইতে চাই আমি সবার মাঝার,
দেখি যদি পারি আজ হারাতে আপনা',—
উন্মুক্ত করেছি তাই হৃদয়-দুয়ার !
আপনার মাঝে বাস সে শুধু যাতনা,—
শুকায় একটি বিন্দু একেলা অসার !
আত্মমুখী ক্ষুদ্র তৃপ্তি আর চাহিব না,—
সবে আসে বুকে, বাড়ে বুকের প্রসার !

ওগো জন-পারাবার, আজ প্রাণ জুড়ে'
তোমার মহিমা ভাসে, সঙ্গীত উথলে !
আর আমি তীরে তীরে রহিব না দূরে,
তলাইতে চাই আজ তোমার অতলে,—
লও মোরে ছিন্ন ক'রে সকল বন্ধন,
তোমার রহস্যমাঝে করিয়া মগন !

—সুশীলকুমার দে

১৩২

আদার ব্যাপারী

পুরাকালে এক আদার ব্যাপারী অতি বড় উজ্‌বুক,
জাহাজের না কি খবর জানিতে হয়েছিল উৎসুক ;
তাই শুনে নাকি কোন্‌-এক বিজ্ঞ অতীব সমজদার
ব্যাপারী ভায়াকে দিয়েছিল এক ধমক চমৎকার !
চমৎকার যে ধমকটা তাঁর প্রমাণ তা' সেটা হয়,
সে ধম্‌কানির চমক এখনো রয়েছে দেশটাময় ।
দেশ জুড়ে যত আদার ব্যাপারী আদা নিয়ে আছে সুখী,
জাহাজের কথা ভুলেও তাদের মনেতে মারে না উঁকি ।
কত পাল তুলে কত না জাহাজ আসে যায় অপরূপ,
পৌরাণিক সে ধমকের চোটে ব্যাপারীরা সব চুপ !

—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

সূচনা

বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বনফুল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ যাত্রাপথ তোমরা এইবার অতিক্রম করিয়াছ। বহু কবিতার সহিত তোমাদের পরিচয় হইল। কখনও তোমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছি কোন বৃহৎ কাব্যের খণ্ডিত অংশ, কখনও স্বয়ং-সম্পূর্ণ কোন গীতি-কবিতা। যাহা কিছু তোমরা পাইয়াছ, তাহা ভাবে, ভাষায় ও সুরে বিভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে একটী বিষয়ে সাধর্ম্ম্য রহিয়াছে। সেই সাধর্ম্ম্য বা সাজাত্য-বন্ধনে তাহারা এক ;—তাহারা কবিতা অর্থাৎ কবিকৃতি।

কবিতা কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ কখনও একরূপ হয় নাই। এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু তোমরা একটু নিবিষ্ট হইয়া পাঠ করিলেই কবিতা ও অকবিতায় যে প্রভেদ তাহা সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারিবে। মনে রাখিবে, কোন প্রকারে অক্ষরে অক্ষরে মিল দিয়া, কোন বিশেষ বক্তব্য বিষয়কে, যে কোন ভাষায়, মনে কর, গদ্যাত্মক ভাষায়, প্রকাশ করিলেই কবিতা হয় না। আমার এই তিনটী কথা ভাল করিয়া বুঝিবে—(১) অক্ষরে অক্ষরে মিল, (২) বক্তব্য বিষয়, (৩) গদ্যাত্মক ভাষা।

প্রথম,—'মিল' কবিতার কোন অপরিহার্য্য লক্ষণ নয়। তৃতীয় প্রবাহের (৪১) কবিতাটী পড়িয়াই তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। মিলের বন্ধন ছিন্ন করিয়াও ঐ অংশটী কেমন রসোত্তীর্ণ কবিতা হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয়, কবিতায় কবি যাহা বলেন তাহা বক্তব্য বিষয় মাত্র নয়, তদতিরিক্ত অন্য কিছু। কবিতার মধ্যে কোন প্রকার মনোহর ভাববস্তু বা কল্পনাটক প্রকাশ করাই কবির উদ্দেশ্য ; কেবব বক্তব্যবিষয় জ্ঞাপনমাত্র নহে। কোন এক প্রাচীন রস-সমালোচনা গ্রন্থে 'রমণীয়ার্থ প্রতিপাদন'কেই কবি-কর্ম্ম বলা হইয়াছে। এই প্রতিপাদন বা প্রকাশ-ব্যাপারে কবির নানা উপায় ও উপকরণের শরণাপন্ন হইতে হয়। কেবল মাত্র বক্তব্য বিষয় যাহা, তাহা সহজভাবেই বলা চলে, কবিকে বলিতে হয় নানাপ্রকার "ছলাকলা'র সাহায্যে। ভাববস্তুকে

মূর্ত্ত করিয়া না তুলিলে, স্পষ্ট করিয়া অনুভূতির বিষয়ীভূত না করিতে পারিলে, কবির চলে না। তাই ভাবের মূর্ত্তিনির্ম্মাণে কবি কত উপমা-অনুপ্রাস, কত লক্ষণা-ব্যঞ্জনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছ কবিতা বক্তার বক্তব্যমাত্র নয়, ইহা স্রষ্টার সৃষ্টি।

এইবার গদ্যাত্মক ভাষার কথা। কোন একটী ভাল কবিতা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিবে কবির শব্দচয়নে, শুধু শব্দচয়নে নয়, শব্দনির্ম্মাণে কি অদ্ভুত নৈপুণ্য রহিয়াছে। ঐ বিশিষ্ট শব্দগুলির সার্থকতা অর্থপ্রতিপাদনেই নিঃশেষ হয় না। ঐ শব্দগুলির যেন এক প্রকার নিজস্ব সঙ্গীত আছে। সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিলে সেই সঙ্গীত বাজিয়া উঠে। ইহার নাম দেওয়া যাইতে পারে শব্দসঙ্গীত বা melody of words. সমালোচকগণ বলিয়া থাকেন শব্দ সঙ্গীত কবিতার এক সম্পদ্। শুধু তাহাই নহে, অর্থের অনুরোধেও এমন সব শব্দ কবি প্রয়োগ করেন যাহাকে আর পরিবর্ত্তিত করা চলে না। বিশেষ শব্দের বিশেষ একপ্রকার অর্থ বুঝাইবার শক্তি থাকে, যাহাকে ব্যঞ্জনা-শক্তি বা power of suggestion বলা হয়। এইভাবে সঙ্গীত-গৌরবে বা অর্থ-গৌরবে শব্দ এবং অর্থের একরূপ সুচারু সম্মেলন হইয়া থাকে। সুতরাং কবিতার শব্দ শুধু শব্দমাত্রই নয় তাহা কবির অন্তর হইতে আহৃত এবং গীত-রস-সিক্ত। গদ্যাত্মক ভাষা কবিতায় অচল। কবিতার ভাষা হইবে সঙ্গীতাত্মক বা melodious এইবার একটা উদাহরণ দিতেছি,—

> "নিখিল চিত্ত-হরষা
> ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।"

"নিখিল-চিত্ত-হরষা"র মধ্যে যে সঙ্গীত বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহা সমার্থক অন্য শব্দসমষ্টিতে ব্যাহত হইত। 'নিখিল-চিত্ত-হরষা'—ইহার মধ্যে কথাগুলি যেন পরস্পর পরস্পরের সহিত চারুবন্ধনে আবদ্ধ। কবিতা-ব্যাখ্যায় আমি তোমাদিগকে এইরূপ শব্দগুলি দেখাইয়া দিব।

আশা করি, কবিতার সংজ্ঞার সহিত তোমাদের পরিচয় না হইলেও এইবার তোমরা খাঁটি কবিতা চিনিয়া লইতে পারিবে এবং কোন বিশেষ গুণে কোনটী উৎকৃষ্ট কবিতা হইয়া উঠিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিবে। তোমাদিগকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্যই পরবর্ত্তী অংশ, অবতরণিকার আয়োজন করিয়াছি।

অবতরণিকা

প্রথম প্রবাহ

বিদ্যাপতি—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কবি ; মিথিলার রাজা শিবসিংহের ছিলেন ইনি সভাসদ্। ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। বহু গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি আছে। সেই সব গ্রন্থে তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং কবিপ্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ; কিন্তু তাঁহার রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাবিষয়ক পদাবলীই তাঁহাকে বঙ্গদেশের রসিক ও রসজ্ঞ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মিথিলায় ছিল কবির বাস ; সেখানে অদ্যাপি তিনি "মৈথিল কোকিল" বলিয়া প্রসিদ্ধ ; কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে এই "মৈথিল কোকিলের" উপর বাঙ্গালীর দাবী চিরদিন ছিল—এখনও আছে। সেইজন্য আমরাও আমাদের কবিতা-সংগ্রহ পুস্তকে তাঁহার জন্য স্থান রাখিয়াছি। বাঙ্গালী গায়ক ও পদকর্ত্তা তাঁহার পদাবলীর মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার রচনার আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালীর কণ্ঠে মৈথিল কবির আদি ভাষা যুগে যুগে রূপান্তরিত হইতে আসিয়াছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বাঙ্গালী গায়ক মূল পদাবলীর উপর এমন প্রক্ষেপ দিয়াছে যে, বর্ত্তমানে মনে হয়, যেন আদি মৈথিল বিদ্যাপতির পাশে সম্পূর্ণ এক পৃথক্ বিদ্যাপতি উদ্ভূত হইয়াছে।

আত্মনিবেদন [১]—বিদ্যাপতির প্রার্থনা-পদগুলি ভাব-সমৃদ্ধিতে অতুলনীয়। প্রাণের নিগূঢ় ভক্তিরসে প্রত্যেকটী কথা সঞ্জীবিত। এই কবিতায় ভগবানের নিকট ভক্তের এক আবেগময় আত্মসমর্পণের ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

তাতল সৈকতে........(৮—১১) এই পংক্তি কয়েকটীর মধ্যে আছে অনুতাপানলে দগ্ধ হৃদয়ের হাহাকার।

সেই তুলসীতিল........(২০—২১) তিল ও তুলসীদ্বারা যে দান, সে দান নিঃশেষ করিয়া দান—পুনঃপ্রাপ্তির আশাশূন্য দান।

তুহুঁ জগন্নাথ........(২৪—২৫) তুমি জগন্নাথ; সমস্ত জগৎ তোমার। আমি তো জগতের বাহিরে কেহ নই, জগতের মধ্যেই একজন; সুতরাং আমিও তোমার। ইহা কূট তর্ক হইলেও ভক্তিরসে সিক্ত বলিয়া তর্কের নীরস রূপ পরিহার করিয়াছে।

তুয়াপদপল্লব........(৩২—৩৩) ভবসিন্ধুতরণে তোমার পদরূপ পল্লবই ভেলা। রূপকের মধ্যে আর একটী রূপক ব্যঞ্জনা-বোধ্য হইয়া রহিয়াছে।

মরণক বেরি—মরণের বেলা সমাওত—প্রবেশ করে। জনু—যেন না। কহায়সি—কহাও।

কম্মবিপাক—কম্মপরিণতি অর্থাৎ কম্মফল। কম্মফলই অদৃষ্টরূপে পরিণত হয় এবং এই অদৃষ্টই ভাবি-জন্ম নিয়ন্ত্রিত করে।

করম—কর্ম। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ।

ঋতুরাজ [২]—ছন্দ ও সঙ্গীত ঝঙ্কারে বিদ্যাপতির পদ এক বিশিষ্ট বাণীমূর্ত্তি ধারণ করে। এই পদটী তাহারই নিদর্শন। বাসন্তী শ্রীর রূপ-নিম্মাণ-দক্ষ কবির সঙ্গীতও যেন উচ্ছ্বসিত পঞ্চমস্বরে বাঁধা। এই বিশেষ ঋতু বসন্তের সঙ্গে যেন বিদ্যাপতির কবিহৃদয়ের একটা যোগসূত্র আছে। কবির কল্পনায় বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছে রাজ বেশে। সমস্ত পদটীর মধ্যে বসন্তের একটা রাজকীয় মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথম পংক্তিতে বসন্তঋতুকে রাজা বলা হইয়াছে এবং পদটীর বাকী অংশ তাহার সেই রাজ-রূপ সমর্থনের জন্য রচিত হইয়াছে।

দিনকর...........পয়গণ্ড—সূর্য্যের কিরণ শৈশব অতিক্রম করিয়া 'পোগণ্ড' অবস্থা প্রাপ্ত হইল; অর্থাৎ কিঞ্চিৎ বৰ্দ্ধিত ও প্রবল হইয়া উঠিল।

কেশর-কুসুম........কেশর কুসুমের মধ্যস্থিত দণ্ডটী দীর্ঘ হইয়া স্বর্ণদণ্ডের মত দেখিতে হইল ;

পীঠল—(১) পাটলা, (২) পাটলি।

অলিকুলযন্ত্র—অলিকুল বাদ্যযন্ত্রের কার্য্য করিতেছে।

আন দ্বিজকুল........অন্য পক্ষীগুলি আশীর্ব্বাদ মন্ত্র পড়িতেছে। তাহারা যেন রাজার আশীর্ব্বাদে নিরত ব্রাহ্মণ।

পাটলতূণ—পাটল ফুলগুলি দেখিতে তূণের মত।

চণ্ডীদাস—চণ্ডীদাস-সমস্যা সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মহলে আজও অমীমাংসিত রহিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসনামধেয় কবির অস্তিত্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে অনুমিত হইয়াছে এবং তাঁহাকেই বাঙলাভাষার আদি গীতিকবির জয়মালা দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়াও এক বা একাধিক চণ্ডীদাস ছিলেন। তিনি বা তাঁহারা সম্ভবতঃ (কেহ কেহ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ) পরচৈতন্য যুগের কবি। চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস বা দীন চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলির রচয়িতা যে উচ্চদরের গীতি-কবি তাহাতে রসজ্ঞ পাঠক-সমাজ একমত।

ভুবন-মোহনশ্যাম [৩]—পদটীতে শ্যামের ভুবনমোহনমূর্ত্তি শব্দরেখায় অতি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। সে চিত্রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং বর্ণলাবণ্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

নয়ন-চকোর মোর........(৩—৪) রূপ যেন চন্দ্র। রূপমুগ্ধ আমার চক্ষু যেন চন্দ্রিকালুব্ধ চকোর। নিমেষালস দৃষ্টিতে যে রূপ-দর্শন, তাহা শুধু দর্শনমাত্র নয়, যেন রূপসুধা পান করা ; নয়ন দুইটী যেন তৃষ্ণার্ত্ত, সুতরাং তাহারা শ্যামের রূপ পান করিতেছে। কবির ব্যাকুল দর্শন-তৃষ্ণাকে প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ইহা হইতে জোরাল কোন ভাষা নাই। তুলনীয়—"পপৌ নিমেষালস-পক্ষ্ম-পংক্তিরুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্।" —রঘুবংশ ২য় সর্গ ১৯ শ্লোক।

ভাঙ্ ধনুভঙ্গিঠাম........(৯) জোড়া ভ্রূ দুইটী যেন বাঁকা ধনু, তাহতে কটাক্ষ হইতেছে তীক্ষ্ণ বাণ।

অঞ্জন—কাজল। নিমিখ—নিমেষ। 'ষ' এর 'খ' উচ্চারণ লক্ষ্য করিবে। ভাঙ্—ভ্রূ। বুলে—ভ্রমণ করে, ঘুরিয়া বেড়ায়। দর্পণাকার—দর্পণের মত উজ্জ্বল ও মসৃণ। মঞ্জীর—নূপুর।

বিরহিণী রাধা [৪]···বিদ্যাপতির পদগুলিতে শব্দ-গৌরব অধিক পরিমাণে আছে। চণ্ডীদাসের পদে বিশেষ করিয়া লক্ষিত হয় অনুভূতির প্রগাঢ়তা। নির্ব্বাচিত অংশে রাধার যে রূপ দেখা যাইতেছে তাহা ভাবতন্ময়, বিদ্যাপতির রাধার মত লীলাচঞ্চল নহে।

শ্যামদর্শনে রাধার পূর্ব্বরাগের কথা এখানে বলা হইয়াছে—মেঘে কৃষ্ণের রূপচ্ছবি আছে বলিয়া "সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে"।

বিরতি আহারে....(৬—৭) "দৃঙ্ মনঃ সঙ্গসংকল্পো জাগবঃ কৃশতারতিঃ। হ্রীত্যাগোন্মাদমূর্চ্ছান্তা ইতি স্মর-দশা দশ।" দর্শন, মনন, সঙ্গসঙ্কল্প, জাগরণ, কৃশতা, অরতি, লজ্জা-পরিত্যাগ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু এই দশটী স্মরদশা বা কামাবস্থা। এই দশ কামাবস্থার মধ্যে ষষ্ঠ দশাটী 'অরতি' (কিছু ভাল না লাগা) এখানে সূচিত হইয়াছে।

রাঙাবাস—যোগিনীর বেশ। উচাটন—অধীর ও অস্থির। ইহাতে অন্যমনস্কভাবে বুঝা যাইতেছে। বিরতি—বিরাগ।

জ্ঞানদাস—চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে সারা বাঙ্গালায় যে একটা বৈষ্ণবভাবের প্লাবন আসিয়াছিল তাহাতে শুধু ধর্ম্মক্ষেত্রে নহে, বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রেও নবজাগরণের শুভসূচনা হইয়াছিল। এই কাল বিভাগে যে সমস্ত বৈষ্ণব কবির নাম বিশেষভাবে স্মরণ-যোগ্য তাঁহারা জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রভৃতি।

জ্ঞানদাসের জন্ম হয় ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত কাঁদড়া গ্রামে। ইনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য ছিলেন। চণ্ডীদাসের পদগুলির মতই ইঁহার পদাবলী অতিশয় প্রাঞ্জল ও মনোমুগ্ধকর।

আক্ষেপানুরাগ [৫]—এই পদটীতে প্রেমের দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে। আশাহতার উক্তিটী পড়িয়া অমর কবি Shakespeare-এর একটি কথা মনে পড়িবে—"The Course of true love never did run smooth."

Mid Summer Night's Dream.

অমিয়া—অমৃত। মূল শব্দের 'ঋ' কারের 'ই' কারে পরিণতি লক্ষ্য করিবে। সিনান—স্নান। গরল—বিষ। উচল—উচ্চ। উচ্চস্থান বলিয়া আচলে উঠিলাম, কিন্তু দেখি বস্তু নিম্নে অগাধ জলে পড়িয়া গিয়াছি। অচল—পর্ব্বত। ভেল—হইল। লছমী—লক্ষ্মী, সুতরাং সম্পদ্, শ্রী, সমৃদ্ধি। 'ক্ষ' এর 'ছ' উচ্চারণ লক্ষ্য কর। বেঢ়ল—বাড়িল। মূল 'বৃদ্ধি' কথাটার 'দ্ধ' 'ড্ঢ' হইয়া ঢ বা ঢ় হইয়াছে। ইহাই আধুনিক ভাষায় হইবে ড়। যেমন বৃদ্ধ—বুড্ঢ—বুঢা—বুড়া। পিয়াস—তৃষ্ণা;—হিন্দী পিয়াস। জলদ—জলদান করে যে অর্থাৎ মেঘ। বজর—বজ্র।

বলরাম দাস—পদাবলীসাহিত্যে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের পর যদি পঞ্চম স্থান কাহারও জন্য নির্দ্দেশ করিতে হয়, তবে তাহা বলরাম দাসের। এই সমস্ত বৈষ্ণব-কবিকে কবি আখ্যা না দিয়া মহাজন আখ্যা দেওয়া হয়। প্রকৃতই ইঁহারা মহাজন। ঋষিদের বেদগাথা শ্রবণে যেমন মনে হয় তাঁহারা তাঁহাদের দেবতাদিগকে প্রত্যক্ষ করিয়া মন্ত্র-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, ঠিক তেমনই এই সমস্ত মহাজন পদাবলী পড়িয়া কেবলই মনে হয়, তাঁহারা তাঁহাদের আরাধ্য দেবতার লীলারসের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াই যেন তাঁহারা গাহিতেছেন।

মাতৃস্নেহ [৬]—বাৎসল্যরসের নির্মাণ-কৌশল বিশেষভাবে আছে এই কবি বলরামদাসের। পদাবলী সাহিত্যকে দুইটী যুগ-বিভাগে বিভক্ত করা যায় (ক) প্রাক্-চৈতন্য যুগ ও (খ) পর-চৈতন্য যুগ। এই দুইটী যুগের মধ্যে ভাষা ও ভাববস্তুর বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম কথা এই যে, ব্রজবুলি নামক এক প্রকার কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা পরচৈতন্য যুগের সামগ্রী; তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ। (৭নং কবিতা দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় কথা হইতেছে, মধুররসাত্মক পদাবলীর প্রাচুর্য্য প্রাক্-চৈতন্য যুগে থাকিলেও তথায় সখ্য ও বাৎসল্য রসের অভাব পরিলক্ষিত হয়। পরচৈতন্য যুগের সাহিত্যে এই সখ্য ও বাৎসল্য রসের উচ্ছল প্রকাশ রহিয়াছে। আলোচ্য কবিতাটীতে মাতা যশোদার স্নেহ-কাতর হৃদয়ের ছবি বড় সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

(৩—৪) শঙ্কার দুইটী কারণ; প্রথম, তোমাদের গোচারণবন অতি দূরবর্ত্তী; দ্বিতীয়, তাহাতে যে নবতৃণ ও কুশাঙ্কুর রহিয়াছে তাহাতে চরণ বিদ্ধ হইতে পারে।

(৭—৮) বিপদের সম্ভাবনা বাস্তবিক না থাকিলেও মায়ের শঙ্কাকুল মন সেই বিপদ্ সেখানে আবিষ্কার করিয়া লইতেছে। কালিদাসের কথায় "স্নেহঃ পাপশঙ্কী"।

(১১—১২) বিধাতা গোপজাতি করিয়া আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; জীবিকার জন্যই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ঘরের ছেলেকে গোচারণভূমিতে পাঠাইতে হয়।

বিধি—বিহি। স্বরমধ্যস্থ মহাপ্রাণ বর্ণের (এখানে 'ধ' এর) 'হ' ধ্বনিতে পরিণতি লক্ষণীয়।

(১৩—১৬) কোমল রাঙা চরণের বাধা অপসারিত করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন হয় তাহার ব্যবস্থা আমরাই করিব। বলরাম দাস ভাবতন্ময়

দৃষ্টিতে নন্দরাণীকে যেন চোখে দেখিতেছেন ; সেইজন্য নন্দরাণীকে সম্বোধন করিয়াই কথাগুলি বলা হইয়াছে।

গোবিন্দ দাস—জ্ঞান দাসের সমসাময়িক কবি। উপাধি কবিরাজ। চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ইনিই বিবেচিত হইয়া থাকেন। ব্রজবুলি নামক একপ্রকার মিশ্র সাহিত্যিক ভাষায় পদরচনা করিয়া ইনি অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পদরচনায় জ্ঞানদাস যেমন চণ্ডীদাসের অনুকরণ করিয়াছেন, গোবিন্দ দাস তেমনই বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। ইনি চৈতন্য সহচর চিরঞ্জীব সেনের পুত্র। শ্রীনিবাস আচার্য্যদ্বারা ইনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। জন্মকাল ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ ও মৃত্যুকাল ১৬১২ খৃষ্টাব্দ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।

ঝর ঝর জলধর-ধার [৭]—উদ্ধৃত পদটী একটী শব্দচিত্র। ধ্বনি-গৌরবে সমস্ত বর্ষার বর্ষণ-মুখর রূপ অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে বাহিরের চাক্ষুষ রূপ অন্তরের অনুভূতির কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বহিঃপ্রকৃতির দুর্য্যোগের সহিত অন্তপ্রকৃতির যে যোগ রহিয়াছে তাহাও কবিতাটীতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

বিথার—বিস্তার। ঝামরি— কাল বা মলিন। ঝুট—মিথ্যা।
ঝুরত—অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। বজর নিশান—বজ্রনিঃস্বন।
ঝাঁপি রহত—বন্ধ করিয়া আছে ঝিঙ্গি-ঝঙ্কর—ঝিঁ ঝিঁ ঝঙ্কার-ঝঙ্কৃত।
ঝঙ্ক—ঝঞ্ঝাট।

সৈয়দ মর্ত্তুজা—সৈয়দ মর্ত্তুজার জন্মকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইঁহার রচিত অনেক পদ বৈষ্ণব পদসংগ্রহ-পুস্তকগুলিতে পাওয়া যায়। ইঁহার সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, ইনি মুর্শিদাবাদ শহরের অনতিদূরে জঙ্গীপুর বালিঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। বৈষ্ণবসঙ্গীতে বাঙ্‌লা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত

হইয়াছে। বৈষ্ণবগীতি-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বহু মুসলমান কবি ঐরূপ সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিরপেক্ষ বিচারকের নিকট তাঁহাদের রচনার সাহিত্যিক মূল্য সামান্ত নহে। তাঁহাদের কবিতা ভাবসমৃদ্ধিতে ও ভাষা-সৌষ্ঠবে আজিও রমণীয় হইয়া আছে।

আত্মবিলোপ [৮]—উচ্চতম প্রেমতন্ময়তা কবিতাটীকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। যে প্রেমসাধনায় প্রেমসাধক ও প্রেমোদ্দিষ্টের মধ্যে ভেদ-বুদ্ধি লুপ্ত হইয়া যায়, সেই প্রেমসাধনার মর্ম্ম-কথা এই কবিতাটীতে ব্যক্ত হইয়াছে।

*

কৃত্তিবাস—কবির উপাধি ওঝা। ওঝা শব্দটী উপাধ্যায় শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃত্তিবাস ওঝা নরসিংহ ওঝার বংশধর। এই নরসিংহ ওঝা নদীয়া জেলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্ত্তী ফুলিয়াগ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। কৃত্তিবাসের জন্ম-তারিখ লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। প্রচলিত মত এই যে, কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'দনুজমর্দ্দন' উপাধিধারী গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের রাজ সভায় সমাদৃত হইয়া তাঁহারই নির্দ্দেশে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত রামায়ণই এক্ষণে 'কৃত্তিবাসী-রামায়ণ' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কৃত্তিবাসের মূল রচনা বহু বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাষার ত কথাই নাই, কথা-বস্তুও নানা বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডক্‌টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বহু হস্তলিখিত পুঁথি মিলাইয়া কৃত্তিবাসী রাময়ণের আদিকাণ্ডের একখানা প্রামাণিক সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। উহাতে বুঝা গিয়াছে, যুগে যুগে কত কবি তাঁহাদের নিজেদের রচনা কৃত্তিবাসের রচনার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছেন।

ভ্রাতৃভক্তি [৯]—হিতে বিপরীত হইল ভাবিয়া কৈকেয়ী শঙ্কাকুলা। তাঁহার বিমূঢ় অবস্থা উপভোগ্য। কৃত্তিবাসের সমস্ত রচনার অন্তরালে তাঁহার বাঙ্গালী প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। তিনি যে চিত্র বা যে চরিত্র সম্মুখে আনেন তাহাই বাঙ্গালীবেশে আবির্ভূত হয় দেখিয়া আমরা একপ্রকার কৌতুক অনুভব করি।

আঘাত লাগিলে ঘায়ে—(১৫—১৬) উপমাটী কেমন সহজ ও স্বাভাবিক তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। বাগাড়ম্বর নাই, অথচ বর্ণনা কেমন স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ।

বাখানে—ব্যাখ্যা করে, বর্ণনা করে। ব্যাখান—বাখান। ভকত—ভক্ত। ইহার পূর্ব্বেও এইরূপ একটা আগন্তুক স্বরদ্বারা ভগ্ন শব্দ কয়েকটী পাওয়া গিয়াছে। যথা—করম, পরসঙ্গ (কবিতা ১) ; বজর (কবিতা ৫)। এইরূপ পদগুলি শুধু কবিতার ভাষারূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। গদ্যে ইহারা অচল। ঘটাইলে বন—বন এখানে বনবাস। তিনকুল—পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং শ্বশুরকুল।

ভরত-মিলন [১০]—ভ্রাতৃপ্রীতির একখানা পবিত্র আলেখ্য। কৃত্তিবাসের চরিত্রগুলির প্রত্যেকটির একটা স্বকীয় মহিমা আছে। কবিতাটিতে লক্ষ্য করিতে হইবে বশিষ্ঠ, রাম ও ভরত যেমন পৃথক্ পৃথক্ চরিত্র, ঠিক তেমনই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ তাঁহাদের মুখের কথাগুলি। ভরতের ও রামের চরিত্র-মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য কেমন কয়েকটি কথায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

বামাজাতি—স্ত্রীজাতি। নারীজাতি বা ঐরূপ কোন শব্দ প্রয়োগ না করিয়া বামা শব্দপ্রয়োগের বিশেষ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। বামা কথায় কৈকেয়ীর কপটহৃদয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বামা—বক্রস্বভাবা ; ইহাই এই শব্দের ব্যঞ্জনা।

পাট—সিংহাসন। রাজপাট, পাটরাণী প্রভৃতিতে এই পাট শব্দ রহিয়াছে।

নন্দীগ্রাম—রামায়ণ-প্রসিদ্ধ এই স্থানেই, রামের বনবাসকালে, ভরত রামের পাদুকা প্রতিনিধি করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করেন।

শ্রীরামের বিলাপ [১১]—সীতাহারা রামের অসহায় অবস্থার চিত্র এই কবিতাটী। ইহার মধ্যে দুই চারিটী পংক্তির ভাষা গুরুতররূপে আলঙ্কারিক হইয়া উঠিয়াছে ; যথা—পদ্মালয়া পদ্মামুখী···দুহিতা (১১—১৪) পুনশ্চ, সৌদামিনী······তিমির আমার (১৯—২৫)। এই কয়েকটী স্থানে রামের মুখে কবি যে কথাগুলি দিয়াছেন তাহা তাঁহার মানসিক অবস্থার অনুরূপ হয় নাই। কবিতার অবশিষ্টাংশ কেমন সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। এই সহজ স্বাভাবিকতার গুণেই কৃত্তিবাস অমর কবির আসন পাইয়াছেন।

দিবাকর নিশাকর····· তিমির আমার (২৩—২৫) ইহারা তমোহর হইলেও শোকান্ধকার দূর করিবার সামর্থ্য ইহাদের নাই। নৈশ অন্ধকার হইতে শোকান্ধকার বড়—ইহাই কবি দেখাইতেছেন।

চিন্তামণি—বাঞ্ছিত ফলপ্রদ মণি। যাহা চিন্তা করা যায় তাহাই এই মণিদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। চিন্তামণির মতই শ্রেষ্ঠরত্নস্বরূপা জানকী। সীতাকে পাইয়া রামের সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ হইয়াছিল তাই সীতা 'চিন্তামণি'।

পঞ্চবটী—অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক, আমলকী—এই পঞ্চবটের সমাহার। দক্ষিণ ভারতের বিশাল দণ্ডকারণ্যভাগের অংশবিশেষ পঞ্চবটী।

মৃত্যু-বাণ [১২]—কবিতাশেষে ত্রিভুবন-বিজয়ী রাবণের মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে। রাবণ দুর্দ্ধর্ষ ও অপরাজেয়, তাই তিনি দেব-নর-ত্রাস। একটী মাত্র বাণ মন্দোদরীর নিকট সুরক্ষিত ছিল, তাহাই রাবণের মৃত্যুবাণ। হনুমান্ কৌশলে সেই বাণ আনিয়া রামকে প্রদান করে। ভয়ঙ্কর রাবণের মৃত্যু বাণও ভীষণদর্শন।

মহাকোপে……অস্থির (৬—৭)—রাবণের বীরত্ব বর্ণনায় রাবণ-নিহন্তা রামের বীরত্বই অধিক ফুটিয়াছে। প্রতিনায়কের বীরত্ব ও গুণাবলী বর্ণনা করিয়া নায়কহস্তে সেই প্রতিনায়কের পরাজয় দেখাইবে এবং তাহাতে নায়কের ঐশ্বর্য্যই সমধিক ফুটিয়া উঠিবে। ইহাই ছিল প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দ্দেশ। সমস্ত প্রাচীন কাব্যই এই আদর্শ রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। যে শক্তি কিছুই মানে নাই, সেই দুর্জ্জয়শক্তির পতনে যে একটা বিরাট্ বিষয়-গৌরব আছে তাহার মহিমায় মুগ্ধ কবির হৃদয়োচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা এ যুগে ছিল না। বর্ণনাটী চিরাচরিত-পন্থায় সম্পূর্ণ গতানুগতিকভাবে করা হইয়াছে। Classical সাহিত্যের ইহা একটী লক্ষণ।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী—মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বর্দ্ধমানের অন্তর্গত দামুন্যাগ্রামে (রত্নানু নদের তীরে) জন্মগ্রহণ করেন। কবি রত্নানু নদের কথা বলিয়াছেন "গঙ্গাসমস্নানস্থল, তোমার চরণজল পান কৈনু শিশুকাল হৈতে"। কবির পিতার নাম হৃদয়মিশ্র। তদানীন্তন ডিহিদারের অত্যাচারে মুকুন্দরাম নিজবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলায় আড়রা গ্রামের রাজার আশ্রয়ে গমন করেন এবং রাজপুত্র রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত হন। রঘুনাথের অনুরোধে কবি চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনা করেন। মুকুন্দরাম যখন নিজ আবাস পরিত্যাগ করেন তখন মানসিংহ ছিলেন সুবা বাঙ্গালার সুবাদার; গ্রন্থ-মধ্যে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিক প্রমাণবলে বলা চলে মুকুন্দরাম ষোড়শ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন; যেহেতু মানসিংহ ১৫৮৯—১৬০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ সুবাদার পদে নিযুক্ত ছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আখ্যান-কাব্যের কবি হিসাবে মুকুন্দের সমকক্ষ কোন কবি বাঙ্গালাদেশে জন্মগ্রহণ করে নাই—ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ এবং রচনা অত্যন্ত বাস্তবধর্ম্মী। এই কাব্যে আর একটী বিশেষত্ব আছে। কবি যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্বর্গের হউক অথবা পৃথিবীর হউক, সমস্ত কিছুই বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব বলিয়া

মনে হয়। বাঙ্গালা দেশের পল্লীগুলি তাঁহার অঙ্কন-কৌশলে প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। শব্দসম্ভারে, ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার লীলাময় সহজতায় এবং সর্ব্বোপরি চরিত্রের নিপুণচিত্রণে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য মধ্যবঙ্গসাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যখানি বাঙ্গালা ভাষার এক অজস্র শব্দ ভাণ্ডার হইয়া রহিয়াছে। প্রচলিত, অপ্রচলিত যে কোন শব্দ হউক—কবি নির্ব্বিচারে তাহাদিগকে আপন কাব্য-মালায় গাঁথিয়া গিয়াছেন। এমনও হইতে পারে ঐ সমস্ত শব্দের সকলগুলিই তৎকালে প্রচলিত ছিল; মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অধিকাংশ অংশ কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ E. B. Cowell সাহেব ইংরেজীতে অনুবাদ করেন।

কালকেতুর শৈশব [১৩]—চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক অলঙ্কার-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট কুলীন, ত্যাগী, সুশ্রী, মহাগুণোপেত নায়ক নহে; একেবারে নিম্নশ্রেণীর—ব্যাধের সন্তান। কিন্তু অলঙ্কারের দুর্লঙ্ঘ্য শাসন-লঙ্ঘনে মুকুন্দরাম কোন প্রকার রোমান্টিক মনোভাবের পরিচয় দেন নাই; ব্যাধ তাঁহার কাব্যের নায়ক, যেহেতু মুকুন্দরাম প্রচলিত পল্লীকাহিনী (তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা সত্ত্বেও) অতিক্রম করিয়া যান নাই। তিনি ব্যাধকে ব্যাধই রাখিয়াছেন। তাহার "গলায় জালের কাঁঠি" এবং "দুই বাহু লোহার শাবল" মল্লযুদ্ধে "অঙ্গে রাঙ্গা ধুলি মাথে" এবং "যার সঙ্গে করে খেলা তার হয় জীবন সংশয়।" মুকুন্দ তাঁহার চরিত্রগুলিকে জীবন্ত মানুষরূপে গড়িয়াছেন।

সভার—সবার। উচ্চারণের মহাপ্রাণতার জন্য অল্পপ্রাণ 'ব' মহাপ্রাণ 'ভ' হইয়াছে, অথবা সভা—জন-সমষ্টি। ত্রিবলী—উদরের তিনটী ভাঁজ। ইহা ঐস্থানের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। দীঘল—দীর্‌ঘ—দীঘর হইয়া দীঘল হইয়াছে। বর্ণ-বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিবে। পাঁতি—পংক্তি। মূলশব্দে অনুনাসিকবর্ণ (nasal sound ম, ন, ণ, ঙ, ঞ, এবং) থাকিলে তাহা

হইতে নিষ্পন্ন শব্দে (৺) চন্দ্রবিন্দু দিতে হইবে; যথা—হাঁস, বাঁশ, চাঁপা, চাঁদ ইত্যাদি। এই কবিতায় এবং পরবর্ত্তী দুইটী কবিতায় বহু বিচিত্র শব্দের সঙ্গে পরিচয় হইবে। এইরূপ শব্দ-সংগ্রহের কারণ কবিপরিচয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ফুল্লরার দুঃখ [১৪]—মুকুন্দরামের কবি-মানসের যে বাস্তব অনুরাগের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি তাহার নিদর্শন মিলিবে বিশেষ করিয়া এই কবিতায়। ফুল্লরার সংসার তাহার সমস্ত দীনতা লইয়া অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। কথাগুলি বলিতেছে ফুল্লরা, কালকেতু ব্যাধের স্ত্রী; যাহাকে বলা হইতেছে তিনি এক রূপসী রমণী। ইনি ছদ্মরূপিণী চণ্ডী—প্রসন্ন হইয়া কালকেতুর কুটীরে আসিয়াছেন। ফুল্লরা কিন্তু চিন্তিতা—পাছে এই রূপ দেখিয়া, স্বামী এই রমণীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাহার প্রতি বিমুখ হয়। তাই সংসারের দুঃখদারিদ্র্যের কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় করিবার এত আয়োজন। সমস্ত বৃত্তান্ত যাহার অবগত, সেই পাঠকের কাছে মুকুন্দরাম এই করুণকাহিনীর অন্তরালে একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুকোজ্জ্বল হাস্যরসের ফল্গুধারা বহাইয়াছেন।

মুকুন্দরামের সূক্ষ্ম কবিদৃষ্টিতে খুঁটিনাটি বিষয়গুলির নানারূপ সৌন্দর্য্য ধরা পড়িয়াছে। সামাজিক এবং গার্হস্থ্যজীবনের কাহিনী বর্ণনায় কবির অসামান্য শক্তি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পসরা—দোকান। খুঞার বসন—কর্কশ অল্পসূতার কাপড়। বেঙ্চের ফল—বৈচি ফল। সিতাসিতপক্ষ—শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ। উধার—উদ্ধার, ঋণ। ধার—কর্জ্জ। হরিণের ছড়—হরিণের চামড়া। তুলি, পাড়ি, পাছুড়ি—তুলার লেপ, পাতিয়া শয়ন করিবার তোষক এবং গায়ের আবরণ। উড়িতে—গায়ে দিতে। এই প্রসঙ্গে ‘ওড়না শব্দটী মনে করিবে। আখেটী—মৃগয়াকারী, ব্যাধ।

চালু সেরে বান্ধা দিনু·····বিদ্যমান (৫২—৫৪)—এক সের চা'লের জন্য মাটিয়া পাথরা খানা বাঁধা দিয়াছি, আমার দুঃখের কথা শোন ; এমন-কোন পাত্র নাই যাহাতে করিয়া পান্তাভাতের জল খাওয়া চলে। সেই জন্য মাটিতে গর্ত্ত করিয়া রাখিয়াছি, তাহা হইতে খাইতে হয়। অন্নাভাবে আমানি খাই ; তাহা রাখিবার কোন মাটির পাত্রও নাই। ফুল্লরা এই চরম দুর্দ্দশার ইঙ্গিত করিতেছে।

মাটিয়া পাথরা—পাথরের পাত্র মৃত্তিকানির্ম্মিত হইতে পারে না। পাথরা শব্দটার এখানে অর্থপ্রসার ঘটিয়াছে। পাথরা পাথরের পাত্র না বুঝাইয়া সাধারণ পাত্র বুঝাইতেছে। কাজেই 'মাটিয়ার' সহিত অন্বয়ে আর কোন বাধা থাকিতেছে না। অর্থ হইতেছে মেটে পাত্র। শব্দের এইরূপ অর্থপ্রসার ও অর্থসংকোচ লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমি একটা মাত্র উদাহরণ দিব। গাঙ্ শব্দটা গঙ্গা হইতে নিষ্পন্ন হইলেও ইহা বিশেষ নদী না বুঝাইয়া সাধারণ নদী বুঝাইয়া থাকে।

কমলে কামিনী | ১৫ |—চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের মধ্যে দুইটী কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। প্রথম কালকেতু ব্যাধের কাহিনী, দ্বিতীয় ধনপতি বণিকের কাহিনী। নির্ব্বাচিত অংশে ধনপতি সাধুর সিংহল যাত্রা এবং পথিমধ্যে কমলে কামিনী দর্শনের বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। মুকুন্দরামের রচনায় যে একটা লীলাময় অনায়াসশ্রী ফুটিয়া উঠে তাহারই দৃষ্টান্ত মিলিবে এই স্থানে। কবিতাটীর কুত্রাপি কবির শ্রমবিন্দুও পরিলক্ষিত হয় না। সমস্ত বর্ণনাটী প্রাচীনকালের জলপথের একটা স্পষ্ট ছবি তুলিয়া ধরিতেছে এবং আমাদের মনে একটা ভৌগোলিক কৌতূহল উদ্রিক্ত করিতেছে।

ইন্দ্রাণীর ঘাট—ইন্দ্রাণী পরগণা বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশে। ইহা তৎকাল প্রসিদ্ধ স্থান। কাশীরাম দাস আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"বারোঘাট, তেরো হাট, তিনচণ্ডী, তিনেশ্বর।
যে জন বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর।"

অজয়—রাঢ়দেশস্থ নদ।

ধৌত-হরিপদদ্বন্দ্বা অলকানন্দা—বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা।

গীতনাট—গীত এবং নৃত্য। ত্রিবেণী—গঙ্গার দক্ষিণ তটে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর মুক্তবেণীর স্থান। মগরা—মকরালয় সমুদ্র।

সেই কালীদহ······খঞ্জনলোচনা (২৫—২৮)—ইনিই কমলে কামিনী, চণ্ডীদেবীর মায়া। আমরা ধীরে ধীরে কৌতূহলের পথ বাহিয়া এক মহাবিস্ময়ের রাজ্যে উপনীত হইলাম। কবি এই বিস্ময়ের মধ্যেই কবিতা শেষ করিয়াছেন। এখানে অদ্ভুত রসের ব্যঞ্জনা রহিয়াছে।

সৈয়দ আলাওল—সৈয়দ আলাওল সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত জালালপুর কবির স্বগ্রাম। কবি স্বয়ং এবং তাঁহার পিতা পর্তুগীজ জলদস্যুকর্তৃক একদা আক্রান্ত হন। পিতা নিহত হইলেন, কবি কোন ক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া আরাকান রাজ্যের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের শরণাপন্ন হন। মাগন ঠাকুর মুসলমান ছিলেন। কবি এই প্রধান অমাত্যের নির্দেশে মহম্মদ জয়সী প্রণীত হিন্দী কাব্য 'পদ্মাবৎ' এর বাঙ্গালা অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ গ্রন্থের নাম পদ্মাবতী। আলাওলের শুধু কবিত্ব-রচনায় নৈসর্গিক প্রতিভা ছিল তাহা নয়, তাঁহার ছিল বহুদর্শিতা, গভীর পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের ঔদার্য্য। কবিরচিত বহু বৈষ্ণবপদ আছে। কবি যেভাবে ষড় ঋতুর বর্ণনা ও বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সামাজিক রীতিনীতির নিখুঁৎ চিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তাঁহার পাণ্ডিত্য, কবিত্ব এবং অভিজ্ঞতা সমস্তই অনন্যসাধারণ ছিল। তাঁহার শব্দচয়ন-সৌষ্ঠব ও বর্ণনামাধুর্য্য তাঁহাকে সেই যুগের কবিদের মধ্যে একটী বিশিষ্ট স্থান প্রদান করিয়াছে।

প্রণাম [১৬]—ঈশ্বর-প্রণাম প্রসঙ্গে কথাগুলি বলা হইয়াছে। যিনি বন্দিত হইয়াছেন তিনি মুসলমানের অদ্বিতীয় ভগবান্ হইলেও

তাঁহার মহিমা—মহিম্নঃ স্তোত্রের ঈশ্বর-মহিমার মতই মনে হয়। যতবিন্ধ নবগ্রহ........নাহি হয় (২৭—৩২)। তুলনীয়—

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুঃ পাত্রম্
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তবগুণানামীশ পারং ন যাতি ॥"

আলাওলের কবি-মানসে এইরূপ কল্পনাই বোধ হয় স্বাভাবিক।

এতেক সৃজিতে···(১১) সৃষ্টি কার্য্যে ভাগবতী ইচ্ছাই কারণ। তুলনীয়—
"In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void ; and darkness was upon the face of the deep. And God said—Let there be light and there was light.

—*The Bible Genesis.*

স্থানে স্থানে আলাওল জয়সীর কাব্যের আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন যথা—

সেই এক ধনপতি (১৩—১৪)······ধনপতি বহী জেহক সংসারু
সব দেত ভুনিত ঘটত ভণ্ডারু—পদ্মাবৎ।

পুনশ্চ,

প্রথমে প্রণাম (১—২)........সুমিরৌ আদি এক করতারু।
জেঁ জীব দীহ্ন কীহ্ন সংসারু ॥

—পদ্মাবৎ।

অন্তরীক্ষ—শূন্য-লোক। অকথ্য—অনির্ব্বনীয়।

নবগৃহ—নবদ্বার বিশিষ্ট মানবদেহ। স্তুতিএ—স্তুতিদ্বারা।

কাশীরাম দাস—খৃষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর কবি। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে কাশীরামের জন্ম হয়। ইঁহার অমরকীর্ত্তি মহাভারতের

অনুবাদ। কৃত্তিবাসের প্রতিভা-সূর্য্যের প্রখর কিরণে যেমন অন্যান্য রামায়ণ-রচয়িতার গ্রন্থগুলি নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে, তেমনই কাশীরাম দাসের মহাভারতও অপরাপর মহাভারত-রচয়িতাদের যশঃ হরণ করিয়াছে। ইনিই ধারাবাহিকভাবে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। এই অনুবাদ দ্বারা ব্যাস-রচিত মহাভারতের ছায়ানুবাদ বুঝিতে হইবে, আক্ষরিক অনুবাদ নহে। প্রয়োজনমত বহু পুরাণ ও উপপুরাণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া কবি তাঁহার মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই গ্রন্থ কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতই বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পঠিত হইয়া থাকে। প্রকৃতই এই দুইখানা গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে কালবিজয়ী হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে।

একলব্যের গুরুদক্ষিণা [১৭]—কাশীরাম দাসের মহাভারতে একলব্যের গুরুদক্ষিণাবৃত্তান্ত পরম ঔদার্য্য ও ত্যাগে মহীয়ান্। সমাজ ব্যবস্থায় নীচজাতির উচ্চতর বিদ্যায় অধিকার না থাকিলেও সেই নীচজাতি আত্মশক্তিতে ও মনের একাগ্রতায় সময় সময় যে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, তাহা উচ্চজাতিরও শক্তির বাহিরে। অধ্যবসায়, চরিত্রের অদম্য শক্তি ও উদ্যমদ্বারা মানুষ সব কিছুই আয়ত্ত করিতে পারে,—গুরু উপলক্ষ্য মাত্র। ইহাই এই কবিতার মর্ম্মকথার এক দিক্। অন্যদিকে অর্জ্জুনের ভীতি এবং দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য-স্নেহ দেখান হইয়াছে। সে স্নেহে যতই নীচতা থাক্ তথাপি তাহা স্নেহ। সর্ব্বোপরি একলব্যের চরিত্রের ঔদার্য্য এই কবিতাটিকে মহিমোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

কোঙর—কুমার। স্বরমধ্যস্থিত 'ম' ধ্বনির 'ঙ' ধ্বনিতে পরিণতি মধ্যবাঙ্গালার বিশেষত্ব। রা—রাব, শব্দ।

পরার্থ [১৮]—জতুগৃহ-দাহের পর পাণ্ডবগণ বারণাবত হইতে প্রচ্ছন্নভাবে পলায়ন করিয়া, অবশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া, অবশেষে একচক্রা নগরীতে উপস্থিত হন। তথায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। পাণ্ডবগণ তথায় ছদ্মবেশে বাস করিতেছিলেন। সেই

সময়ে এই ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হয়। কবিতাটীর মধ্যে ভীম সামান্য একটু স্থান অধিকার করিয়া আছে; কুন্তীদেবী "বৃকোদরে জানাইল সব বিবরণ" আর অমনি মায়ের বচন শুনি "ভীম কৈল অঙ্গীকার।" অক্ষর-মাত্রায় তাহার স্থান সামান্য হইলেও আমাদের হৃদয়রাজ্যে তাহার স্থান অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে। দেহের শৌর্য্যবীর্য্যই যে কেবল পাণ্ডব-দিগকে বড় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা নহে, তাঁহাদের চরিত্রের মাহাত্ম্যেও তাঁহারা সবার উপরে ছিলেন। নিজের জীবন-বিসর্জ্জনে যে অকুণ্ঠিত ব্যবহার তাহার মধ্যে একটা কঠিন চরিত্রশক্তি ও নৈতিক সাহস আছে।

লোকের বেদনা……সহিব কেমন (৩৫—৩৬) কুন্তীর মত জননীর সন্তান বলিয়াই পাণ্ডবগণ এইরূপ চরিত্রশক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।

রাক্ষস সংহার··(৪২) রাক্ষসের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষা আমার পুত্রের হইয়া গিয়াছে। ভীমের সহিত হিড়িম্ব রাক্ষসের যুদ্ধ এবং ভীমহস্তে তাহার নিধন—এই পূর্ব্বতন ঘটনার উল্লেখ কুন্তীদেবী এইস্থানে করিতেছেন।

ভীষ্ম [১৯]—ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করার জন্যই দেবব্রত 'ভীষ্ম' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' বাঙ্গালা ভাষার প্রবাদ বাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেবব্রতের পিতা শান্তনু ধীবর রাজকন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করিবার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন। দেবব্রত ধীবর-রাজের নিকট পিতার জন্য সত্যবতীকে যাচ্ঞা করিতে যান। ধীবররাজের ভয় হইল—নিজ কন্যার পুত্র হইলে তাহার সিংহাসনের আশা নাই, যেহেতু ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র দেবব্রতই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। দেবব্রত প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি সিংহাসনের দাবী করিবেন না। তাহাতে ধীবর-রাজের শঙ্কা দূর হইল না: যেহেতু দেবব্রতের বংশধর কেহ সিংহাসন দাবী করিতে পারে। দেবব্রত তখন কঠিন প্রতিজ্ঞা করিলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি জীবনে বিবাহ করিবেন না।

অবতরণিকা

রামপ্রসাদ সেন—ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সমকালবর্ত্তী কবি। কবির জন্ম হয় চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে আনুমানিক ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে। বর্ত্তমান সময়ে ঐ স্থানের নাম হালিসহর। রামপ্রসাদ তান্ত্রিক শক্তি উপাসক ছিলেন। এ সাধনায় তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সাধকটীর ধ্যাননয়নে করালবদনা, মুক্তকেশী, ভয়ঙ্করী দেবী শুধু বরাভয়মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ যেন কঠোর শাক্তধর্ম্মকে একটা কোমলমধুর শ্রী প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার শাক্তধর্ম্মের এখন তাহাই বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর কাব্য, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, শিবকীর্ত্তন প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বহু সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি সুপ্রচারিত হয় নাই। কবি নিজেই একদিন বলিয়াছিলেন "গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব মত্ত।" সত্যই তাঁহার সঙ্গীত তাঁহাকে অমর করিয়াছে। গানগুলি তাঁহার প্রাণের অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়া ভাবরসে অতুলনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই গানগুলি একটা বিশিষ্টসুরে গাওয়া হয়, সে সুরের নাম "রামপ্রসাদী সুর"। এই রামপ্রসাদী সুর ভিন্ন রামপ্রসাদের গানের মাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায় না। সমস্ত বাংলা দেশ একদা এই সঙ্গীতে সাড়া দিয়াছিল।

দুঃখের বড়াই | ২০ —রামপ্রসাদের একটি শ্যামাসঙ্গীত। প্রত্যেকটি সঙ্গীত কবির অন্তরের নিগূঢ় ভক্তিরসে সিক্ত বলিয়া অতি সহজেই প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠে। কবির নিজের ব্যক্তিগতজীবনের অনুভূতি যদিও তিনি এই সব সঙ্গীতগুলিতে প্রকাশ করিয়াছেন তথাপি তাঁহার মর্ম্মবাণীর সহিত কোন ধর্ম্মের, কোন সম্প্রদায়ের বিরোধ হইতে পারে না। এইদিকে বিচার করিলে ইহা একপ্রকার Universal Prayer। মহাপুরুষগণ দুঃখেরই পূজা করিয়া আসিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে মানুষের পরমপূজ্যগণ দুঃখেরই অবতার, আরামে লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে"—এই কথা স্মরণ রাখিলেই কবিতাটির মর্ম্মকথা বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে না। দুঃখের নিকষ-পাষাণেই হয় খাঁটি মনুষ্যত্বের পরীক্ষা। মানুষ মহাসম্পদ্ যাহা কিছু লাভ করে তাহা দুঃখদ্বারাই লাভ করে।

সুতরাং দুঃখের একটা গৌরব আছে। ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেই দুঃখের বড়াই করিতেছেন।

বোঝা নামাও···(৮) দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য উৎকণ্ঠা নহে, অনন্ত জন্মস্রোত হইতে মুক্ত হইবার জন্য আকুল ক্রন্দন।

ব্রহ্মময়ী—ব্রহ্মন্+ময়ট্ (স্ত্রী) ব্রহ্মময়ী। অর্থ ব্রহ্মস্বরূপিণী; স্বরূপ অর্থে ময় (ট্) প্রত্যয়। উপনিষদে যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, মাতৃভাবতন্ময় কবির নিকট তিনিই ব্রহ্মময়ী। উভয়ের কোন ভেদ নাই। তুলনীয়—

"তারা আমার নিরাকারা—
শ্রীরামপ্রসাদ রটে—মা বিরাজে সর্ব্বঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ! দেখ মাকে, তিমিরে তিমিরহরা!

উমার বাল্যলীলা [২১]—উমার শৈশবের একখানা চারু চিত্র। শিশুমনের বাসনার অন্ত নাই, সেখানে সাধ্যাসাধ্যের বিচার নিষ্ফল। শিশু *"গগনের চাঁদ চায়—না পেলে রোদন।"* ব্যাহত অভিমানের ছবিটি কি সুন্দর ও স্বাভাবিক "ভুষণ ফেলিয়া মোরে মারে"। এই বর্ণনার মধ্যে একটা মনোহর স্বাভাবিকতা এবং কৌতুকাবহ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে যে রসব্যঞ্জনা রহিয়াছে তাহা বাৎসল্য।

মুকুরে হেরিয়া মুখ···(১৭—১৮) উমার মুখে চাঁদের সৌন্দর্য্য হইতেও অধিক সৌন্দর্য্য আছে। সৌন্দর্য্যবিষয়ে জগতে যাহা উপমান হইয়া আছে উমার মুখের কাছে তাহার কি শোচনীয় পরাজয়।

মানসপূজা [২২]—কবি বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ, মহা সমারোহের পূজা হইতে প্রকৃত ভক্তের নীরব ধ্যানকে শ্রেয় বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। ধ্যাননয়নে দেবতার যে মানসপ্রত্যক্ষ হয় উহাই শ্রেষ্ঠ প্রতিমা। ভক্তি সেখানে নৈবেদ্য। মনের ছয়টি অসৎ প্রবৃত্তি (কামাদি) ত্যাগ করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিদান।

ভারতচন্দ্র রায়—হাবড়া আমতার সন্নিকটে পেঁড়োবসন্তপুর গ্রামে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ জমিদার বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ভারতচন্দ্র নিজগৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং নানা স্থান ঘুরিয়া অবশেষে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় লাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ব্বেই ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। মহারাজের আদেশে কবি তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য অন্নদামঙ্গল রচনা করেন। তাঁহার ৪০ বৎসর বয়সে ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। কবি ইহার পর আর দীর্ঘ দিন বাঁচিয়া থাকেন নাই। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশে যে তুমুল ঝড় উঠিয়াছিল, তাহার ঠিক তিনবৎসর পর, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কবি তাঁহার ইহলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যের মুকুটমণি। মঙ্গলকাব্যের তিনি এক রমণীয় আদর্শ পথের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু এ পথে আর যাত্রী চলিল না। বাঙ্গালার রাষ্ট্র-বিক্ষোভ সমস্ত কিছু ওলট পালট্ করিয়া ফেলিল। কাব্যসাহিত্যে ভারতচন্দ্র একজন স্বয়ং-সিদ্ধ শিল্পী। তাঁহার অসাধারণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও ছন্দোবৈচিত্র্য তাঁহাকে বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। শব্দার্থের যে মণিকাঞ্চন-সংযোগের অধিকার ভারত কবির ছিল তাহা সেই যুগের বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যুগের কোন কবির মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। ভারতচন্দ্রের অধিকাংশ উক্তি একটা অমর বাণীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তাঁহার বিশেষ করিয়া সেই গুণ ছিল যাহাকে ইংরেজীতে বলে "*Gift of phrasemaking !*"

শিবের ভিক্ষাযাত্রা [২৩]—কবি নিপুণ চিত্রকরের মত একখানি চমৎকার ছবি আঁকিয়াছেন। পৌরাণিক শিব-চরিত্রের আদর্শ ভারতচন্দ্রের শিবে রক্ষিত হয় নাই। এই শিব একেবারে বাঙ্গালীর ঘরের দেবতা, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর—"ওদিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই।" বাঙ্গালীর উৎসব ও আনন্দের দিনে যে শিবের গীত প্রসিদ্ধ ছিল, সেই লৌকিক শিবের মূর্ত্তিই যেন আমরা এই কবিতাটিতে দেখিতে পাইতেছি। বাঙ্গালীর মানসলোকে যে চিরকালের শিবটি আসন পাতিয়া আছেন এ তাঁহারই মূর্ত্তি। শিব দারিদ্র্য-দুঃখে গৃহস্থের কাছে কৃষিকার্য্য শিখিতে যান,

ভাঙ্‌পোস্ত আফিং খান এবং ভবানীর কোন্দলে অস্থির হইয়া, মনের দুঃখে—নন্দীরে ডাকিয়া কন—"বৃষ আন, যাইব ভিক্ষায়"।

বিশেষণে সবিশেষ [২৪]—অন্নপূর্ণা যাত্রা করিয়াছেন ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে। এই ভবানন্দ মজুমদার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদিপুরুষ। দেবী ভবানন্দের ভক্তিতে প্রীতা হইয়া তাঁহার গৃহে প্রতিষ্ঠিতা হইতে চান। যাত্রাপথে পড়িল এক নদী—গাঙ্গনী নদী; "সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।"

অন্নপূর্ণার রহস্যপ্রিয়তা ও ঈশ্বরী পাটনীর সরল মধুর ভাব দৃশ্যটিকে মনোহর করিয়া তুলিয়াছে, অন্নপূর্ণা পাটনীর নিকট একটা বিশেষণে সবিশেষ পরিচয় দিলেন তাহাতে একদিকে কার্য্যসিদ্ধি অন্যদিকে আত্মগুপ্তি হইল। যাহা কিছু তিনি বলিলেন তাহাতে নিন্দাচ্ছলে হইল পতির স্তুতি। সেই জন্য বিশেষণ এবং বাক্যগুলি সমস্তই দুইটি করিয়া অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ইহাই এই কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কৈলাসভূধর [২৫]—কবিতাটি সুন্দর এক স্বভাব-বর্ণনা। তবে ইহাতে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কৈলাসভূধরের যে রূপ আমরা দেখিতেছি তাহাতে ভারতচন্দ্রের বস্তুনিষ্ঠা ও কবিকল্পনা মিশিয়া গিয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-লোকের সৃষ্টি করিয়াছে। কৈলাসের অবস্থিতি আমাদেরই বাস্তব লোকে সেখানকার ভূচর-খেচরও আমাদের পরিচিত। তথাপি কবিকল্পনা আমাদিগকে আমাদের পরিচিত পৃথিবী হইতে বহুদূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। আমরা গিয়াছি এমন এক কল্পলোকে যেখানে জরা মৃত্যু নাই অপরূপ ঠাঁই, কেবল সুখের মূল।

(২৮—৩২) কবির রোমান্টিক কল্পনা কতদূর গিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। এ যেন এক সৌন্দর্য্যের কল্প-লোক, "কামনার মোক্ষধাম"।

শিবের রুদ্ররূপ [২৬]—পূর্ব্ববর্ত্তী (২৩) কবিতায় যাঁহাকে দেখিয়াছি তিনি শিব; অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোথাও যেন উত্তাপ বা জ্বালা নাই। সেই শিবের এক মহাভয়ঙ্কর রূপ এই কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি ভীষণ-মধুর। মধুর বলিয়াই তিনি শিব—**মঙ্গলময়**। আবার ভীষণ বলিয়াই তিনি রুদ্র—ভয়ঙ্কর। দক্ষযজ্ঞে সতী পতিনিন্দা সহিতে না পারিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। সেই সংবাদে শিব ক্রোধে দীপ্ত বহ্নির মত জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। মাথায় গঙ্গা উচ্ছল প্রবাহে টলমল করিয়া উঠিয়াছে, দেবভূষণ সর্প গর্জ্জন করিতেছে, ললাটবহ্নি ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্রমথগণ সহ রুদ্রমহেশ্বর চলিয়াছেন দক্ষযজ্ঞনাশ করিতে।

ভারতচন্দ্র যে কতবড় শব্দশিল্পী তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে এই কবিতায়। সংস্কৃত ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দের প্রবাহে কবি তাঁহার শব্দগুলিকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহাতে মনে হয় যেন একটা শব্দের উত্তাল তরঙ্গ হেলিয়া, দুলিয়া, নাচিয়া, ছুটিয়া চলিয়াছে। কবিতার দীর্ঘ বর্ণগুলিকে (আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, প্রভৃতি এবং সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্ব অক্ষর) টানিয়া টানিয়া দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হইবে; তাহা হইলেই সমস্ত কবিতাটির অপূর্ব্ব সঙ্গীত-শ্রী উপলব্ধি করা যাইবে।

ছলচ্ছল······(৪) তিনটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ—ছলচ্ছল টলট্টল ও কলকল। এই তিনটি শব্দে গঙ্গা-প্রবাহের স্পষ্ট তিনটি গুণ বা অবস্থার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ছলচ্ছল দ্বারা প্রবাহের উচ্ছল গতি, টলট্টল দ্বারা তাহার নির্ম্মলতা ও কলকল দ্বারা প্রবাহধ্বনি সূচিত হইতেছে। ভারতচন্দ্রের শব্দগুলির এইরূপ একটা যাদুশক্তি আছে।

দ্বিতীয় প্রবাহ

রামনিধি গুপ্ত—নিধুবাবু নামেই ইনি সমধিক পরিচিত। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার চাপতা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। নিধুবাবু ছোটকাল হইতেই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। যখন তিনি ছাপরায় প্রবাসী ছিলেন তখন বড় ওস্তাদের নিকট ওস্তাদিগান শিক্ষা করেন। ইহাই তাঁহাকে সঙ্গীত রচনায় প্ররোচিত করে।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরের প্রকাশ পর্য্যন্ত যে কাল, তাহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের 'গীতি-যুগ' বলা যায়। কবি, যাত্রা, পাঁচালী, খেউড়, হাপআখড়াই—এইসব গানের যুগেই নিধুবাবু তাঁহার টপ্পাগান বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে দান করিয়াছেন। সহজ সরলভাবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেমগীতি বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম দেখা দিল। নিধুবাবুর পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে (ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ) কেহই তাঁহার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্রের প্রেমের নামে পঙ্কিলতা ও রামপ্রসাদের ভক্তিনিষ্ঠা, উভয় হইতেই দূরে সরিয়া, তিনি একটী সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবরাজ্যে বিচরণ করিলেন। বৈষ্ণব-পদাবলীও প্রেমগীতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু বৈষ্ণবপদাবলীর মত নিধুবাবুর সঙ্গীতে কোথাও কোন প্রকার রূপক-কল্পনা নাই। নিধুবাবু উপলব্ধি করিলেন যে, মর্ত্তবাসী নরনারীর প্রেমও সাহিত্যের বিষয়বস্তু হইতে পারে। তাই তিনি সাধারণ মানব-মানবীর মিলন-বিরহ, অনুরাগ সোহাগ লইয়া তাঁহার গান রচনা করিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে গীতিকবিতার একটা স্পষ্ট প্রাণ লক্ষণ স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

স্বদেশী ভাষা [২৭]—প্রেমসঙ্গীত ছাড়াও নিধুবাবু বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির একনিষ্ঠ সেবক। তাঁহার স্বদেশ ও স্বভাষা-প্রীতি প্রকাশিত হইয়াছে এই ক্ষুদ্র গানটির মধ্যে। মাতৃভাষার জন্য তৃষ্ণা চাতকের জলধারা-পিপাসার মত। কবি তাঁহার কবিতা একটি দৃষ্টান্ত অলঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তটি আবার কবিপ্রসিদ্ধিমাত্র। ধরাপৃষ্ঠের জল চাতক-চাতকীর অপেয়;

তাহারা পান করিবে শুধু বৃষ্টিধারার জল তাহাও মাটিতে পড়ার পূর্ব্বে। তাহাদের এই জলপান-কৌশল উল্লেখ করিয়া কবি কালিদাস তাহাদিগকে বলিয়াছেন "অম্ভোবিন্দু-গ্রহণনিপুণাঃ"।

মনের অনল [২৮]—কবিতাটী নিধুবাবুর একটী উৎকৃষ্ট প্রেম-সঙ্গীত। প্রেমাস্পদের প্রাপ্তিতেই প্রেমানল নির্ব্বাপিত হয়—নয়নের জল বা সাগরের জল তাহাকে নিভাইতে পারে না; ইহাই গানটীর মর্ম্মার্থ। আবার সেই চাতকীর দৃষ্টান্ত। দ্রষ্টব্য (২৭) কবিতা।

হরু ঠাকুর—নিধুবাবুর পরিচয়-প্রসঙ্গে আমরা যে গীতিযুগের উল্লেখ করিয়াছি সেই গীতিযুগের একজন কবিওয়ালা। কবিওয়ালারা ছিলেন দাঁড়াকবি। সভায় দাঁড়াইয়া প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য ইঁহাদের গানগুলি রচিত হইত। ইঁহাদের রচনা পাঠকের উদ্দেশ্যে নয়, শ্রোতার উদ্দেশ্যে হইত। সুতরাং এই গানগুলি রক্ষা করার কোন উপায় ছিল না। তাহা ছাড়া, এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি, বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় এই কবি গানগুলিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। কাজেই গানগুলিকে রক্ষা করিবার কোন বিশেষ আয়োজনই হয় নাই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কতকগুলি গান সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাই আমরা কবিগানের কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছি।

হরু ঠাকুরের প্রকৃত নাম ছিল হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া লোকে সম্মান করিয়া তাহাকে হরু ঠাকুর বলিত। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সিমলা পাড়ায় তাহার জন্ম হয়। শৈশবেই তিনি সঙ্গীতপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং ক্রমশঃ তাঁহার এই গুণের উন্মেষ হইতে থাকে। দীর্ঘদিন বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালা বলিয়া বিখ্যাত থাকিয়া ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বহু কবিশিষ্য ছিল; তন্মধ্যে ভোলা ময়রার নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রতীক্ষা [২৯]—...কবিগানমাত্রই ঘৃণার বস্তু ছিল না। আমরা শুধু ইহাই বলিতে পারি যে, সৃষ্টি-নিয়মের ব্যতিক্রম কবিগানে হয় নাই।

গানগুলি ভালমন্দ উভয় প্রকারেরই ছিল। এই গানটীতে কবির একটা আবেগময় তীব্র অনুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে; সেই অনুভূতি নিতান্ত ঐন্দ্রিয়ক (sensuous)। অতুলীয়—

"But I am tied to very thee
By every thought I have;
Thy face I only care to see
Thy heart I only crave."

Sir C. Sedley

রাম বসু—গীতিযুগের আর একজন কবি। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে হাওড়ার নিকট শালিখা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। রামবসু বাল্যকালেই পাঠশালায় বসিয়া বসিয়া কলাপাতায় গান লিখিয়া ফেলিতেন। এই বয়সেই তাঁহার কবি-প্রতিভা দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। উত্তরকালে ইনি একজন শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। বিরহবর্ণনাতেই এই কবির কৃতিত্ব বেশি ফুটিয়াছে। তাঁহার ভাষা সরল, আবার কখনও কখনও আড়ম্বরপূর্ণ—কিন্তু সর্ব্বদাই তাহা প্রাণস্পর্শী। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছেন, "যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গালা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রামবসু।"

ভিখারীর পরিবর্ত্তন [৩০]—রামবসু শুধু রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গান রচনা করেন নাই। তিনি কতকগুলি উমা সঙ্গীতও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার একটী উমাসঙ্গীত আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। এই উমাসঙ্গীত-গুলি স্নেহরসে উদ্বেলিত। বিবাহের পর স্বামীর ঘর হইতে নবপ্রত্যাগত কন্যার কাছে শঙ্কাকুলা জননীর ইহাই চিরন্তন ব্যাকুল প্রশ্ন—

"কও দেখি, উমা, কেমন ছিলে মা?"

কিন্তু এখানে প্রশ্নটী আরও ভয়াবহরূপ ধারণ করিয়াছে। তাহার কারণও আছে যথেষ্ট। আমরা এই কবিতার অবতরণিকারূপে রামবসুর আর একটী গান তুলিয়া দিতেছি—

"তুমি যে ক'য়েছো আমায় গিরিরাজ, কতদিন কত কথা। সে কথা আছে শেলসম হৃদয়ে গাঁথা। আমার লম্বোদর নাকি, উদরের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে বেড়াতো। হ'য়ে অতি ক্ষুধার্ত্তিক, সোণার কার্ত্তিক ধূলায় প'ড়ে লুটাত।"

সুতরাং জননীর প্রশ্নের সঙ্গত কারণ আছে। উমার উত্তর কুল লক্ষ্মীর উপযুক্ত বটে।

গোবিন্দ অধিকারী—কবিওয়ালার পরিচয় শেষ করিয়া আমরা সেই যুগের একজন শ্রেষ্ঠ যাত্রাওয়ালার নাম উল্লেখ করিতেছি। তিনি গোবিন্দ অধিকারী। যাত্রার দলের অধিকারী বলিয়া তাঁহার উপাধি অধিকারী হইয়া গিয়াছে। হুগলী জেলার জঙ্গিপাড়া গ্রামে বৈরাগী বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার লেখা-পড়া ছিল অতি সামান্য; কিন্তু তাঁহার নৈসর্গিক প্রতিভা ছিল। এই প্রতিভাবলেই তিনি শ্রেষ্ঠ গায়ক ও পদ-রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে সমস্ত বাঙ্গালা দেশে তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং বিশেষ পরিণত বয়সে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

শুক-সারী-সংবাদ [৩১]—শুক—টিয়াপাখী। সংবাদ—কথোপকথন।

শুক এবং সারিকার অস্পষ্টাক্ষরে মানুষের মত কথা বলিবার ক্ষমতা আছে এবং এই সত্য-প্রসঙ্গেই উহারা নানাভাবে প্রাচীনসংস্কৃত সাহিত্যে কবি কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়াছে। এখানে কল্পনার একটু মৌলিকত্ব আছে। শুকসারী শুধু কথা বলিতেছে না, তাহাদের মধ্যে রীতিমত বাগ্‌যুদ্ধ চলিতেছে; বিষয় হইতেছে রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে কে বড়। বিষয়ের এই অভিনবত্বের জন্য একদা এই সঙ্গীত সমস্ত বাঙ্গলার পথে ঘাটে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। গানটি পড়িয়া শেষ করিলে মনে হয় তর্কযুদ্ধে সারীরই জয় হইয়াছে, সুতরাং রাধিকাই বিজয়িনী। কিন্তু শুকসারী জানে না, উচ্চতম

প্রেমের রাজ্যে বড় ছোটর প্রশ্ন উঠে না, দুই সত্তা এক হইয়া প্রেম সার্থক হয়; সেখানে অহং-চেতনার অবকাশ নাই।—তুলনীয়—

"Love took up the harp of life; and smote on
All the chords with might;
Smote the chord of Self, that, trembling,
Passed in music out of sight."

—*Tennyson, Locksley Hall* 1. 33.

দাশরথি রায়—খ্রীষ্টাব্দে দাশরথি রায়ের জন্ম হয়। বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় বাঁদমুড়া নামে গ্রাম আছে, তাহাই কবির জন্মস্থান। কবি মাতুলাশ্রয়ে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হন। নীলকুঠীতে তিনি কিছুদিন কেরাণীর কাজ করেন। এই কর্ম্ম শীঘ্রই পরিত্যাগ করিয়া তিনি ওস্তাদীকবির দলে গান বাঁধিয়া দিতে আরম্ভ করেন তারপর তিনি নিজেই একটী পাঁচালীর দল গঠন করিয়া ফেলিলেন। দাশুরায়ের পাঁচালী একদা সমস্ত বঙ্গদেশময় বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। পালা গান ছাড়াও তিনি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত গানও তাঁহাকে সেই যুগে যশের মুকুট পরাইয়া দিয়াছিল। রসিকতাপূর্ণ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গকবিতা রচনাতেও কবি নিপুণ ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই কবির মৃত্যু হয়।

হৃদয় বৃন্দাবন [৩২]—কবি-পরিচয়ে বলিয়াছি দাশরথি রায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত রচনা করেন। হৃদয়-বৃন্দাবন তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব সঙ্গীত।

কামাদি ছয় কংসচরে······(১১—১২) কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—মনের এই ছয়টি কু-প্রবৃত্তিই কংসচর। ষড়্‌রিপুই ছয় শত্রু। এবং তাহারাই বিনাশযোগ্য।

তিষ্ঠসদা······(১৫—১৬) সদয়ভাবে······বসতি (১৯—২০) দাশরথি রায়ের শব্দালঙ্কারপ্রিয়তা লক্ষণীয়। ষ্ঠ এবং ষ্ঠ তথা (১৯—২০) 'স' এর বহুবার আবৃত্তিতে অনুপ্রাসের সৃষ্টি হইয়াছে।

সমস্ত কবিতার মধ্যে সাঙ্গ্ ঘটিকভাবে একটি ভাবমাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সেই ভাব-মাধুর্য্য প্রয়াসলব্ধ শব্দঝঙ্কারে অনেকাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই আড়ম্বর দাশরথি রায়ের প্রিয় এবং তৎকালীন জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিল।

ভুষণে ভুষণ [৩৩]—কবিতাটীর মধ্যে শুধু শব্দচাতুর্য্য এবং বন্ধন-কৌশল লক্ষ্য করিতে হইবে। তথাপি ইহাতে একটা অনায়াসশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবিতার সমস্ত কথাগুলি কৌশলে বাঁধিয়া একটী সুন্দর 'একাবলী, অলঙ্কার গাঁথিবার প্রয়াস করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ১—২ এবং ৬—৭ চরণ ছাড়া কোথাও সম্ভবপর হয় নাই।

দাশরথির লেখনী যে অবিশ্রান্ত ও অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি তাহার পরিচয়ও এখানে পাওয়া যাইবে। বাহিরের জগতের বিভিন্নপ্রকারের দৃশ্যগুলি যেন কবির মানসলোকে একটা গতিবেগের সৃষ্টি করিয়াছে; কবি অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছেন, ইহার যেন শেষ নাই।

দাশরথির প্রার্থনা [৩৪]—(৩২) ও (৩৩) হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির একটী সঙ্গীত। এখানে শব্দাড়ম্বর-প্রিয় চঞ্চল কবিটী সহসা যেন ভাব-গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছেন। সেইজন্য এই গান আছে আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম আবেগ। (৩৩) কবিতার মত এখানে কোন প্রকার কৃত্রিম গতিবেগ নাই।

মানবদেহ পঞ্চভূতনির্ম্মিত। মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ ইহারাই পঞ্চভূত। কবির আরাধ্যা দেবীরও এই পঞ্চভূত প্রিয় সামগ্রী। সেইজন্য খণ্ডাকাশস্থলেই (যেখানে দেবীর মন্দির উহা অনন্ত শূন্যস্থানের এক অংশ তো বটে) দেবীর মন্দির, মৃত্তিকাই দেবীপ্রতিমার উপাদান, চামরব্যজন দেবীর প্রিয়, হোমাগ্নিতে তাঁহার প্রীতি এবং পাদজলে তাঁহার আনন্দ। কবির মরণান্তে তাঁহার দেহের উপাদান পঞ্চভূত যেন এই পঞ্চস্থলে

মিলাইয়া যায়—ইহাই দাশরথির প্রার্থনা। প্রকৃত ভক্তের মৃত্যু-চিন্তায় ভীতি নাই, আছে পরম শান্তি।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী—কৃষ্ণকমল গোস্বামীর জন্মস্থান নদীয়া জেলার ভাজন ঘাট; জন্মকাল ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ। কবির জন্মস্থান নদীয়া হইলেও কর্ম্মস্থান ছিল ঢাকানগরী। এই ভক্তকবিরচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে স্বপ্নবিলাস ও দিব্যোন্মাদ বা রাই উন্মাদিনী গ্রন্থ দুইটী সমধিক প্রসিদ্ধ। সমস্ত চৈতন্যচরিতামৃতখানি এবং পদাবলী সাহিত্যের রস নিংড়াইয়া কবি তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। কবি স্বয়ং যাত্রার অভিনয় করিতেন। তাঁহার অভিনয় প্রণালী অনেকটা প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারীর আদর্শে হইত। কবির অভিনয়ে রাধার উন্মাদনা, চৈতন্যদেবের ভাবোচ্ছ্বাস এবং দিব্যোন্মাদের কথা শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্মরণ করাইয়া দিত। কবি ছিলেন স্বয়ং ভাববিহ্বল বৈষ্ণব ভক্ত; তাই তাঁহার অভিনয় এত চিত্তাকর্ষক হইত। সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গে তিনি বড় গোঁসাই নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭৭ বৎসর বয়সে চুঁচুড়ার গঙ্গাতীরে এই ভক্ত কবির জীবনান্ত হয়।

শ্যামসুন্দর [৩৮]—খণ্ড সঙ্গীতটীর মধ্যে ভাষার দুইটী রূপ রহিয়াছে। কৃষ্ণকমল ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত। আবার এই পণ্ডিতই, বাঙ্গালার চলিত ভাষার খনির মধ্যে যে ঐশ্বর্য্য লুকাইয়া আছে—তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঁহার অন্তর্দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর ছিল। গানটী ৮ চরণে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রথম চারিটী চরণে কবি অনুপ্রাসবহুল সংস্কৃতানুগ ভাষায় শ্যামসুন্দরের যে মধুর মূর্ত্তিতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন অবশিষ্টাংশে খাটী চলিত ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। গানটী যেন একাধারে সূত্র ও ভাষ্য।

দলিত কাজলের মত উজ্জ্বল শ্যামের রূপ বর্ষার জল-ভরা কালো মেঘের মত সুন্দর। কালো মেঘে বলাকার মত শুভ্র তাহার কণ্ঠের মুক্তামালা; সেই মেঘের মধ্যে ইন্দ্রধনুর মত চিত্রিত তাহার চূড়ার শিখণ্ড; পরিধানে তাঁহার পীতবসন, যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী।

বাউল—দেহতত্ত্বের উপাসক এক সম্প্রদায় বাঙ্লা ভাষার প্রথম উন্মেষকাল হইতেই তাঁহাদের সাধন-কথা বাঙ্লা গানের ভিতর দিয়া শুনাইয়া আসিতেছিলেন। বাউলগণও ঐরূপ এক সম্প্রদায়, যাঁহারা দেহতত্ত্বের উপাসক ও সহজ সাধনের পক্ষপাতী। বাউলেরা সত্যের পূজারী ; সেই সত্যকে লাভ করিতে তাঁহাদের দৃষ্টি বহির্মুখীন না হইয়া অন্তর্মুখীন হয়। তাঁহারা মনে করেন সত্যস্বরূপ যিনি, তিনি মানুষের অন্তর্যামী। মানবদেহই তাঁহার মন্দির এবং এই মন্দিরেই আছে মানবের "মনের মানুষ"। বাউল শব্দের এক অর্থ পাগল। যাঁহাদের আচরণ জগতের কোন মানুষের আচরণের তুল্য নহে, লোকে তাহাদিগকে পাগল বলে। বাউল সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহারও ঐরূপ, তাঁহারা বাউল বা ক্ষেপা।

আকর্ষণ [৩৬]—ভক্ত বাউল কবি এখানে অজ্ঞাত অন্তর্যামীর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন। সেই অন্তর্যামী পুরুষ অন্তহীন ক্ষমার আধার ; সুতরাং তিনি দরদী বা ব্যথার ব্যথী। কবি তাঁহার সমস্ত মনপ্রাণ লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন তাঁহার দুবার আকর্ষণে। এ যেন ঠিক সাগরের আকর্ষণে ভাঁটিসোতে ভাটারি গড়ানের মত উদ্দাম ছুটিয় চলা। নদীর স্রোতের সে চলার মধ্যে কোন আনন্দ আছে কিনা বলা যায় না, কিন্তু বাউলের এ মানস-যাত্রা আনন্দে অনুপ্রাণিত। তাহাতে "মনের গরল অমৃত হইয়ে যায়।"

সেখ মদন বাউল—অনুমান করা হয়, ইনি পূর্ববঙ্গবাসী একজন বাউল। এই সম্প্রদায়ের কথা "বাউল" শীর্ষক পূর্ববর্তী আলোচনায় দ্রষ্টব্য। পাঠ-সৌকর্য্যের জন্য আমরা ইঁহার গানটির ভাষা স্থানে স্থানে একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছি।

সাধন বিঘ্ন [৩৭]—বাউলদের মত এই যে, অন্তরের সহজ ধর্ম্মকেই উপাসনা করিবে ; দেব-প্রতিমা, ঠাকুর-মন্দির, খোদার মস্‌জিদ প্রভৃতি কোন প্রকার প্রতীক বা বাহ্যাচারের কোন প্রয়োজন নাই। যত মত তত পথ। নানা গুরুর নানা উপদেশ। আমি কোন্ পথে যাইব ? কাহার উপদেশ শুনিব ? বাহিরে তাকাইলেই সম্মুখে দেখি পথের বাধা,

সাধন-বিঘ্ন। পুরাণ, কোরাণ, তস্‌বী, মালা—সব কিছুতেই সাধন-পথের বিঘ্ন দেখিতেছি। বাউলের এই বিলাপের সঙ্গে তুলনীয়—

"Our little systems have their day
They have their day and cease to be,
They are but broken lights of Thee
And Thou, O Lord. art more than they.

Tennyson In Memoriam.

সাঁই—বাউল কবি তাঁহার গুরুকে উদ্দেশ্য করিয়া কথাগুলি বলিতেছেন। সহজিয়াদের চারিটী সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ (১) আউল (২) বাউল (৩) সাঞ্চী ও (৪) দরবেশ। বিখ্যাত লালন ফকিরের গুরুও ছিলেন এইরূপ একজন সাঁই—তাঁহার নাম "সেরাজ সাঁই।"

ডুবে যাতে—(৪—৬) বাউল পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত স্থানেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন। রূপজগতেই অরূপের প্রকাশ রহিয়াছে; ইহার উপলব্ধিকেই বলে অভেদ-সাধন। সেই রূপসাগরে ডুবিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "রূপসাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপ রতন আশা করি।" কিন্তু মানুষ রূপজগৎকে রূপাতীত হইতে পৃথক দেখে। তাহারাই রূপপিপাসা দিয়া জগৎ পোড়ায়। তাহাদের রূপতৃষ্ণা হয় কাম, জগৎ তাতে দগ্ধ হয়; স্বয়ং তাহারাও পুড়িয়া মরে। অন্য আর একটী বাউলের গান আছে— "ডুব্‌তে কি গো সবাই পারে?"
রূপ-সাগরের তরঙ্গেতে যায় রে ভেসে!"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—আমরা রামনিধি গুপ্তের পরিচয়প্রসঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে একটী বিশেষ গীতি-যুগের নির্দ্দেশ করিয়াছি, সেই গীতিযুগের শেষ করিতেছি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের

সঙ্গে। তিনিও কবির দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। এই যেমন তাঁহার পরিচয়ের এক দিক্, তেমনই তাঁহার পরিচয়ের আর একটী দিক আছে, তাহা তাঁহার রচনায় নবযুগের শুভসূচনার লক্ষণের মধ্যে। এইভাবে বিচার করিলে তাঁহাকে যুগসন্ধির কবি বলিতে হয়। তাঁহার রচনামধ্যে অশ্লীলতা ভারতচন্দ্রের যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; আবার নানা বিষয় অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা-রচনার মধ্যে তাঁহার আধুনিক ভাব লক্ষ্য করা যায়। কবির জন্ম হয় নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে। শৈশব হইতেই তাঁহার অযত্নলব্ধ কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "সংবাদ প্রভাকর" সংবাদপত্র বাঙ্গালাদেশে যুগান্তর আনিয়াছিল। এই পত্রিকাতেই পরবর্ত্তীকালের বিখ্যাত সাহিত্যিক দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যের প্রাথমিক সেবা আরম্ভ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার মধ্যে কোথাও কোন জটিল বা উচ্চ ভাব নাই। কল্পনার কল্পলোকেও তিনি বিচরণ করেন নাই। তাঁহার নিকট শুধু জগতের অস্তিত্ব ছিল, তাহা তাঁহার চারিপাশের স্থূল প্রত্যক্ষ জগৎ। তিনি তাহাই দেখিয়াছেন এবং আপন ইচ্ছামত কখনও ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছেন, কখনও বা কঠিন ব্যঙ্গবিদ্রূপের জ্বালায় সমাজকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কবিতাবলীতে আছে হাস্যরসের অবিশ্রান্ত দান। তাহাতে কোথাও বা তিনি নিস্পৃহ উদাসীন ভাবে হাস্যরস বিতরণ করিতেছেন, আবার কোথাও বা মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপের কশাঘাত করিতেছেন। এই সমস্ত লইয়াই ঈশ্বরচন্দ্র সেই যুগে বাঙ্গালী-সমাজে প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাঙ্গালী পাঠক তাঁহার সংবাদ প্রভাকরের জন্য তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের মত চাহিয়া থাকিত।

ম [৩৮]—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন প্রকৃত স্বদেশ-ভক্ত। স্বদেশের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার তাঁহার ভাল লাগিত। দেশের যাহাতে কল্যাণ হয়, তাঁহার নিয়ত ছিল সেই চিন্তা। যে তীব্র স্বদেশ-প্রেম তাঁহাকে "বিদেশের ঠাকুরকে" ঠেলিয়া ফেলিয়া 'স্বদেশের কুকুরকে' ভালবাসিতে শিখাইয়াছিল তাহা যে কত বড় স্বদেশ-প্রেম সেই কথা ভাবিয়া বর্ত্তমানযুগে বিস্মিত হইতে হয়। এখানে কবির মাতৃভূমির প্রতি প্রেম ও মাতৃভাষা-নিষ্ঠা ব্যক্ত হইয়াছে।

সুপ্তোত্থিত [৩৯]—পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতা দ্রষ্টব্য। সমস্ত ভারতবর্ষ লইয়া কবির জাতীয়তা-বোধ জাগিয়াছে। দেশবাসীর নিশ্চেষ্টতায় কবি ক্ষুণ্ণ হইয়া তাহাদের জাগরণী গাহিতেছেন।

পৌষ পার্ব্বণ [৪০]—ঈশ্বরচন্দ্র যে খাঁটি বাঙ্গালা কথায় বাঙ্গালীর মনের ভাব প্রকাশ করিতেন তাহারই পরিচয় আছে এই কবিতায়। বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটা কথা মনে হয়—"আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময় বোধ হয়—হোক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না।... বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্ব্বণে যে একটা সুখ আছে, বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠাপুলিতে যে একটা সুখ আছে শচীর বিম্বাধর প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই।"

পৌষ পার্ব্বণ কবিতার মধ্যে চমৎকার এক উৎসবানন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্রগুলি কেমন realistic তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। এই বাস্তব চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে কবির পরিহাসপ্রিয় মনোভাব। এই দুই মিলিয়া কবিতাটীকে চমৎকারভাবে আস্বাদযোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। এই গুণেই ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুলনীয়।

তৃতীয় প্রবাহ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে এক প্রসিদ্ধ, সম্পন্ন ও অভিজাত বংশে কবির জন্ম হয়। শৈশবে তিনি মাতার নিকট রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-পাঠ শ্রবণ করিতেন এবং এই সময়েই তিনি আবৃত্তির কণ্ঠ ও সঙ্গীতের অনুরাগ লাভ করিয়াছিলেন। কৈশোরে মধুসূদন হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। প্রথম-ইংরেজী-শিক্ষার রূঢ় আলোকে তখন নব্য শিক্ষার্থীদের চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছে। স্বদেশের সমাজ ও আচার-সংস্কারে কিছুমাত্র সত্য নাই, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যেও গৌরবের কিছু নাই—নবীন শিক্ষিত বাঙ্গালী তাহাই বুঝিয়াছিল—মধুসূদনও তাহাই বুঝিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর তিনি বিশপস্ কলেজে যোগদান করেন। এই সময় তিনি যত্নসহকারে গ্রীক্ লাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি বহু ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন। বিশ্বসাহিত্যের মধু আহরণ করিয়া গৌড়জনের জন্য তিনি যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া যাইবেন ভাষাশিক্ষার এই ঐকান্তিকনিষ্ঠার মধ্যে অলক্ষিতভাবে যেন তাহার আয়োজন চলিতেছিল। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা মধুসূদনের মাদ্রাজ প্রবাস ও তথা হইতে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাগমন। এই সময় হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্ত্তিগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নাটক—শর্ম্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী কাব্য—তিলোত্তমা সম্ভব, প্রহসন—একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ, মহাকাব্য—মেঘনাদবধ, গীতিকাব্য—ব্রজাঙ্গনা, বিয়োগান্ত নাটক—কৃষ্ণকুমারী, পত্রকাব্য—বীরাঙ্গনা এই সময়কার রচনা। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতযাত্রা করেন এবং বহু দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্য দিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরেন। এই ব্যবসায় তাঁহার কোন উন্নতি হয় নাই। পৈতৃক রিক্থরূপে প্রাপ্ত অমিতব্যয়িতা ও বিলাসিতার ফলে ক্রত তিনি ঋণসাগরে ডুবিয়া গেলেন এবং অচিরেই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া আলিপুর দাতব্যচিকিৎসালয়ে দেহত্যাগ করিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যসাহিত্যের ভাবপ্রবাহ আসিয়া যখন আমাদের দেশের গতানুগতিক সাহিত্যরূপের জীর্ণতটে আঘাত করিতেছিল তখন মধুসূদন এক অগস্ত্য-

পিপাসা লইয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের যেখানে যে অভাব তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে—তিনি তাহাই মোচন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বাঙ্গালা নাটককে সংস্কৃত নাটকের অন্ধ অনুকরণ হইতে তিনি মুক্ত করিয়াছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর অভাব মোচন করিয়াছেন, বিয়োগান্ত নাটকের পথপ্রদর্শন করিয়াছেন। ১৮৫৬—১৮৬২ খৃষ্টাব্দ—এই ক্ষুদ্র পরিসর সময়টুকুর মধ্যে, যিনি মাতৃভাষা বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, সেই মধুসূদনের হাত হইতে আমরা পাইয়াছি বঙ্গবাণীর পরিপূর্ণ অর্ঘ্যপাত্র। এই অসম্ভব সম্ভব হইবার একমাত্র কারণ এই কবির ছিল নৈসর্গিক প্রতিভা, বিপুল অধ্যবসায় এবং ভাষা আয়ত্ত করিবার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য।

সমুদ্রের প্রতি রাবণ [৪১]—মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্য হইতে গৃহীত। সীতা উদ্ধারের জন্য রাম সমুদ্রের উপর শিলার সেতু নির্ম্মাণ করিয়া লঙ্কায় আসিয়াছেন। মহাবল সমুদ্র কেন এই তুচ্ছ শৃঙ্খল পড়িয়া আছে, রাবণ তাহা বুঝিতে পারে না। তাই তাহার এই তিরস্কার। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে সমুদ্রকে সজীব কল্পনা করিয়া তিরস্কার করার মধ্যে রাবণের দুঃখবোধ ও ছন্দে ও হৃদয়াবেগের সূচনা রহিয়াছে।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাবসমাপ্তির সঙ্গে যতি বা বিরাম পড়িবে—তাহা বুঝিয়া কবিতাটি পড়িতে হইবে। কবি এখানে যে শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন তাহার ব্যঞ্জনাশক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে নতুবা কবিতাপাঠ নিষ্ফল হইবে।

কি সুন্দর (১) সুন্দর নয়, অত্যন্ত কুৎসিৎ। সুন্দর কথাটীর মধ্যে যে ব্যঞ্জনা রহিয়াছে তাহাতে এই প্রকার বিপরীতার্থের আতিশয্য বুঝাইতেছে।

জলদলপতি (২) ক্ষুদ্র জলাশয়ের উপর সেতু নির্ম্মিত হইতে পারে কিন্তু জলাধিপতির উপরে নয়।

রত্নাকর (৫) এখানে সাগর বা সমুদ্র বলিলে চলিত না। রত্নের আকর যে, তাহার কালো কুৎসিত শিলার মালা শোভা পায় না।

কলঙ্করেখা (১৯) প্রশস্ত ললাটে সামান্য এই আঙ্গাল কলঙ্কের রেখামাত্র; কিন্তু তথাপি সে তোমার অনাবৃত ললাটে আছে স্মরণ করিও; দৃষ্টি মাত্র তাহা চোখে পড়ে।

বঙ্গভূমির প্রতি [৪২]—বিলাত যাত্রার প্রাক্‌কালে কবির বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানা পত্রের অংশ হইতেছে এই কবিতাটী। ইংরেজ কবি Byron এর Childe Harold's Pilgrimage গ্রন্থের একটি পংক্তি "My native Land—Good Night" উদ্ধার করিয়া কবি এই কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। Childe Harold এর যাত্রাকালে— 'fast the white rocks faded from his view কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন দুঃখ ছিল না "without a sigh he left, to cross the brine." মধুসূদনের কবি-হৃদয় এই অবস্থায় বেদনাবিধুর হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাই কল্পনা দুইটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য।

পরমাদ (৩) মূল শব্দ প্রমাদ। আগন্তুক একটি স্বরদ্বারা এইরূপ ভগ্নশব্দের উদাহরণ তোমরা আরও কয়েকটি মনে রাখিবে—হরষ, দরশন, ভকতি ইত্যাদি।

(৪—১০) মনোরূপ কোকনদ, জীবরূপ তারা। এই প্রকার দেহ-আকাশ, জীবন-নদ প্রভৃতি পদেও রূপক-প্রতিপাদিত অর্থগুলি বুঝিয়া লইবে এবং ইহাদের সহিত মধুহীন, খসে, চিরস্থির এই পদগুলির উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করিবে। তামরস (২৫)—পদ্ম।

বনবাসে সীতা [৪৩]—বাংলা সাহিত্যে সর্ব্ব প্রথম চতুর্দ্দশপদী কবিতা প্রবর্ত্তিত হইল। ইংরেজীতে এই শ্রেণীর রচনার নাম Sonnet এই প্রকার কবিতায় চৌদ্দটি করিয়া চরণ থাকিবে এবং তাহার ৮ চরণ ও ৬ চরণ লইয়া কবিতার দুইটি ভাগ থাকিবে। কবিতার মিলেরও একটি সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকিবে।

তিতি (২)—ভিজিয়া। ইহা এক প্রকার নামধাতু। স্যন্দন—রথ। বারিদ (১০)—বারিদান করে যে এই অর্থে, মেঘ।

ধীরে যথা……(১৩—১৪) দুঃখাহত সীতার মূর্ত্তিটি কি চমৎকার ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। এই অভাবনীয় অবস্থায় সীতা যেন সকল প্রকার অনুভূতিশূন্য পাষাণমূর্ত্তির মত হইয়া গিয়াছেন।

নূতন বৎসর [৪৪]—আসিছে রজনী……(১০—১৪) মৃত্যুকে অন্ধকারময়ী মহানিশারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সে রহস্য-রাত্রি পৃথিবীর রাত্রি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও বিলক্ষণ। তাহার বায়ুর কণ্ঠে কথা নাই, কালো কেশপাশে তাহার মণি নাই, ঊষা তাহার রুদ্ধ দুয়ার কখনও মুক্ত করিয়া দেয় না। (চিররুদ্ধ) বিশেষণে কবির দুঃখবাদের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

এই অংশে মরণ-মহানিশার ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কালো মেঘের পাশে রূপালী রেখার মত পৃথিবীর রাত্রির কি সুন্দর মূর্ত্তিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে! স্ফুট-তারকা বিভাবরীর রূপ কবি Byron এর একটি romantic কল্পনা স্মরণ করাইয়া দিতেছে—

—"She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that's best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes."

নীলধ্বজের প্রতি জনা [৪৫]—কাশীরামদাস-প্রণীত মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের একটি ঘটনা। নীলধ্বজপুত্র প্রবীর যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব ধরিলে অর্জ্জুন তাহাকে রণে নিহত করেন। মহারাজ নীলধ্বজ পুত্র-

হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া অর্জ্জুনের সহিত সন্ধি করেন। ইহাতে বীরাঙ্গনা প্রবীর-জননী ক্ষিপ্ত হইয়া এই কথাগুলি বলিতেছেন।

মর্ম্মভেদী বিলাপ, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও জ্বালাময় তিরস্কার সব কিছু মিলিয়া যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা এক অপূর্ব্ব রসচিত্র, যেখানে বীর ও করুণ— এই দুইটি রস অবিরোধে পাশাপাশি রহিয়াছে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮২৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার বাকুলিয়া গ্রামে কবির জন্ম হয়। বাল্যকালেই কবিতা-রচনার অনুরাগ তাঁহার মধ্যে লক্ষিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাকরে তাঁহার কবিতা একদা প্রকাশিত হইত। ঈশ্বরচন্দ্রকে আদর্শ করিয়া কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া রঙ্গলাল সুপ্তোত্থিতের মত হঠাৎ এক নূতন আদর্শের সন্ধান পাইলেন এবং বাঙ্গালা কাব্যের এক বিশুদ্ধ ও অভিনব রূপের জন্মদান করিলেন। এই নবীন রূপ-নির্ম্মাণে পাশ্চাত্য প্রভাব বিশেষ উপাদানের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিল। পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য—"উপস্থিত কাব্যের স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার আকর্ষণ আছে। ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যতই বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতা-কলাপ অন্তর্দ্ধান করিতে থাকিবে।"………… কবির রচনাবলী—পদ্মিনী-উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী, শূরসুন্দরী, কুমার সম্ভবের পদ্যানুবাদ প্রভৃতি।

মহাকাল [৪৬]—পদ্মিনী উপাখ্যানের উপসংহারে লিখিত অংশ হইতে গৃহীত হইয়াছে। কবি এখানে মহাকালের নির্ব্বিচার ধ্বংসলীলার এক নিষ্ঠুর কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। সংহারের অধীশ্বর মহাকালকে তিনি নানারূপে দেখিয়াছেন—কখনও দানবরূপে কখনও নিষাদরূপে, কখনও বা কৃষকরূপে।

কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র—(৪—১২) কবি একটি ইংরেজী সূক্তিরত্নকে কেমন কৌশলে বাঙ্গালীর কণ্ঠের উপযুক্ত করিয়াছেন তাহা লক্ষণীয়—

Sceptre and crown
Must tumble down,
And in the dust be equal made
With the poor crooked scy the and spade.

স্বদেশগীতি [৪৭]—এই অংশও পদ্মিনী উপাখ্যানের অন্তর্গত। পাঠানরাজ আলাউদ্দীন্ চিতোরাধিপতি রাণা ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার জন্য চিতোর আক্রমণ করেন। রাজপুত ও পাঠানে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়; কিন্তু রাজপুতগণ পরাজিত হন। পদ্মিনী নিজের সতীধর্ম্ম রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। ইহাই পদ্মিনী-উপাখ্যান কাব্যের বৃত্তান্ত। উদ্ধৃত অংশে আছে ক্ষত্রিয়গণের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য। মূলকাহিনী কবি টডের রাজস্থান হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পুরাতন কাহিনী-বিবৃতির উপর একটি সুন্দর কবি-মানস পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকার স্বদেশগীতি গাহিয়া কবি অভিশাপগ্রস্ত দেশবাসীর মনে জাতীয়ভাব উদ্রিক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। পদ্মিনীর কাহিনী সেখানে উপলক্ষ্যমাত্র।

গোবিন্দচন্দ্র রায়—বরিশাল জেলার মীরপুর গ্রামে এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশে গোবিন্দচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করায় পিতৃ-পরিত্যক্ত হইয়া নানাদেশ পর্যটন করেন। অবশেষে কিছুদিন কাশীতে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া পরে আগ্রায় ডাক্তারি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সেখানেই তিনি কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে অগ্রাপ্রবাসী এই বাঙ্গালী কবির কবিখ্যাতি সমস্ত বাঙ্গালাদেশের শিক্ষিত সমাজে ছড়াইয়া পড়ে। মাত্র দুইটী কবিতাই তাঁহার মাথায় যশের মুকুট পরাইয়া দিয়াছিল। একটী আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। অপরটী তাঁহার প্রসিদ্ধ সঙ্গত 'কতকাল পরে, বলো ভারতে রে। দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে?"

যমুনা-লহরী [৪৮]—কবিতাটীর মধ্যে যে যমুনার তরল কল্লোল হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে। ইহাকেই বলে কবিতার সঙ্গীত-ধর্ম্ম। এই সঙ্গীত-ধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে কবিতাটী ভাল করিয়া

পড়িতে হইবে। দীর্ঘবর্ণগুলি (প্রায় সমস্ত) টানিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে।

কবিতাটির সহিত আর একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত তুলনীয় "যমুনে! এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী?" যমুনালহরী কবিকে বিগত দিনের গৌরবের কাহিনীগুলি আজ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ভারতের সে সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উদ্ধৃত অংশে প্রাচীন ভারতের তিনটি দিকের গৌরব কবির স্মৃতি-পথে জাগরূক হইয়াছে, প্রথম শৌর্য্য, দ্বিতীয় ধর্ম্ম, তৃতীয় প্রেম। কবিতাশেষে (৩৯—৪২) কবির একটি দীর্ঘশ্বাসের স্পর্শ যেন অনুভব করা যায়। জগতের সমস্ত কিছুই শেষ হইয়া যাইবে। কীর্ত্তি ক্ষণস্থায়ী, সৌন্দর্য্য নশ্বর; সুতরাং ভারতের মহিমাও কাল কবলিত। এই বিষাদ-ভাবনাতেই কবিতা সমাপ্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কবি খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা তিনি বিশেষ ভাবে শিক্ষা করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ সদ্ভাব-শতকের ছত্রে ছত্রে পারস্য কবি হাফিজ ও সাদীর ভাবগুলি অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। সদ্ভাবশতকের কবি বলিয়া এই কবির যশ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইনি ঢাকা প্রকাশ প্রভৃতি কতকগুলি সংবাদ-পত্রের সম্পাদকতা করেন।

ব্যথিত-বেদনা [৪৯]—সদ্ভাবশতকের একটি কবিতা। কবিতাটির ভাব-মাধুর্য্যের জন্য ইহা অদ্যাপি জনপ্রিয় হইয়া রহিয়াছে। ইহা নীতি-কবিতা; কিন্তু নীতি উপদেশের শুষ্ক নীরসরূপ পরিহার করিয়া রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

আশীবিষ—আশীতে (দন্তে) বিষ যাহার এই অর্থে সর্প বুঝাইতেছে।

ঊষা [৫০]—ঊষার মানবীয়রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। ইংরেজীতে ইহাকে বলে personification ঊষার ললাটে তরুণার্করাগের সিন্দুর-বিন্দু।

পাখীর কূজন তাহার কণ্ঠের গান, বিকশিত কমল তাহার বিকচ নয়ন, কমলদলে শিশিরবিন্দু—তাহার চক্ষের প্রেমাশ্রু। কল্পনাটি সুন্দর সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্ত কল্পনার ঈশ্বরমহিমায় কেন্দ্রিত হইয়াছে। ঊষার কোন স্বকীয়তা ফুটিয়া উঠে নাই। কবির এই পুরাতন কল্পনাভঙ্গি লক্ষ্য করিতে হইবে।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী—১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কবি কলিকাতার নিমতলা পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের ইনি ছিলেন বন্ধু। এই সূত্রে ঠাকুরবাড়ীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকেই তাঁহার কাব্য-গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বিহারীলাল ছিলেন অন্তরে বাহিরে কবি। তাঁহার ভাব-বিহ্বল তন্ময় মূর্ত্তির কথা স্মরণ করিয়াই দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "বিহারী বাবু সদাই কবিত্বে মশগুল থাকিতেন।" বিহারীলাল যখন বাঙ্গালার কাব্যনিকুঞ্জে গান ধরিয়াছিলেন তখন অধিক লোক জাগে নাই। তখনও তাঁহার কাব্যের সুর সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই ; সেই সুর তাঁহার গীতি-কবিতার অভিনব সুর। মধু-হেম-রঙ্গলালের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও কবি যাহা রচনা করিলেন তাহা কোন প্রকার বীরগাথা বা মহাকাব্য নয়, একেবারে খাঁটি গীতিসুরে ঝঙ্কৃত কবির অন্তরের কথা। তিনি এই অভিনব সাধনায় স্বয়ং সিদ্ধিলাভ করিয়া যে পথনির্দ্দেশ করিয়া গেলেন, সেই পথেই আধুনিক কাব্যসাহিত্যের যাত্রী চলিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং তিনি একজন যুগ-প্রবর্ত্তক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়া গিয়াছেন—'এদেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে আনীত নব গীতিকবিতার আদিকবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। মহাকাব্যের উচ্চশিখর হইতে অবতরণ করিয়া গীতিকবিতার স্বর্ণসিংহদ্বার তিনিই বিশেষভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইনি প্রকৃতিকে এক নবভাবে দেখিয়া গিয়াছেন ইঁহার কবিতার মূলতত্ত্ব সৌন্দর্য্য-পিপাসা।"

হিমাচল [৫১]—"ইঁহার কবিতার মূলতত্ত্ব সৌন্দর্য্য-পিপাসা।" এই উক্তির সার্থকতা এই কবিতাতেই উপলব্ধি করা যাইবে। কবির গভীর নিসর্গ-প্রীতি লক্ষ্য করিতে হইবে। ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে……

(১৩—১৬) হিমাচল-শৃঙ্গ মেঘলোক অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং মেঘ ও ঝটিকার উদ্দাম খেলা তাহার বক্ষে, তাহার উপরে নয়। কণ্ঠে তাহার রবি-কিরণ সহস্র-লহর মালার মত রহিয়াছে। ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে—এই অংশ, হিমালয়ের পাষাণ-কঠিন দেহের মধ্যে যে একটি স্নেহ-কোমল প্রাণ রহিয়াছে তাহারই পরিচয় বহন করিয়া আনিতেছে।

সমগ্র কবিতাটির মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে—কবি কেমন করিয়া সহজ সরল নিসর্গ বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে অযত্নলব্ধ কল্পনা-ছবি গাঁথিয়া দিয়াছেন এবং তাহাতে কি অপূর্ব্ব মণিকাঞ্চন-সংযোগ হইয়াছে। কবির ভাষায় ও কল্পনায় যেন কোথাও প্রয়াসের চিহ্নমাত্র নাই। তাহারা যেন স্বতঃ উৎসারিত। (৩৩—৪০) এই অংশ পড়িলেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

ত্রিতাপ জ্বালা—মানুষের জন্মাবধি তিন প্রকার দুঃখ সহ্য করিতে হয় (১) আধিভৌতিক দুঃখ—যেমন সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি প্রাণী হইতে (২) আধিদৈবিক দুঃখ—যেমন শীতোষ্ণবাতবর্ষা হইতে (৩) আধ্যাত্মিক দুঃখ—যেমন ইষ্টনাশ ও অনিষ্ট-সম্পাত হইতে। এই ত্রিতাপ হইতে চিরকালের জন্য মুক্তিই মানুষের মোক্ষলাভ। পতিত-পাবনী গঙ্গা ত্রিতাপের জ্বালা জুড়াইয়া মুক্তি বিধান করিতে পারে—ইহাই কবির বিশ্বাস।

নিদ্রামগ্ন জগৎ [৫২]—পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতা (৪৮) যমুনালহরীর সঙ্গে তুলনীয়। ঐ কবিতায় যমুনা যেমন প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করিয়া আনিয়াছে—এই কবিতাতেও তেমন আকাশের চাঁদ কত শত প্রাচীন ঘটনার সাক্ষী হইয়া আছে। সমস্ত বর্ণনাটির মধ্যে একটি রোমান্টিক ভাবনা বিস্তার লাভ করিয়াছে। আকাশের চন্দ্র এখানে কোন এক বিশেষ রজনীর চন্দ্র। তাহার সঙ্গে দর্শকের যে দূরত্ব তাহা স্থানের, কিন্তু কালের নহে। একই কালে কবি ও চন্দ্র উভয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কিন্তু

এখানে একটি সুন্দর দূরত্ব প্রক্ষিপ্ত হইল। আজিকার চন্দ্রের রূপই ত চন্দ্রের সম্পূর্ণরূপ নহে। চন্দ্র কত যুগযুগান্তরের মধ্য দিয়া, কত হারানো দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছে। সে দেখিয়াছে অশোকবনে সীতাকে, পুত্রশোকে বিহ্বল দশরথকে, কবি বাল্মীকি ও ব্যাসদেবকে।

(৫১—৬৬) কবি চন্দ্রিকার সঞ্জীবনী শক্তির কথা বলিয়াছেন। যাহা শুষ্কতরুর পক্ষে সঞ্জীবনী শক্তি তাহাই কবির নিকট উদ্দীপন বিভাব।

(৭৯) এখানে অমৃতপিয়াসী চকোরের কথা বলা হইয়াছে।

কামনা [৫৩]—ইহা কবির কামনা। কবিতাটীতে বিহারীলালের কবি-মানস সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতৃপ্তি ও অসন্তোষ মানুষের মনের আদিম বৃত্তি। কাহারো নিজের অবস্থায় আনন্দ ও তৃপ্তি নাই; মানুষ যাহা পায় তাহা চায় না। তথাপি স্মরণ রাখিতে হইবে, "অসন্তোষ মানুষকে কাজ করাইতেছে, আকাঙ্ক্ষা কবিকে গান গাওয়াইতেছে। সন্তোষ এবং পরিতৃপ্তি যতই প্রার্থনীয় হোক তাহাতে কার্য্য এবং কাব্য— উভয়েরই ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। —রবীন্দ্রনাথ

নাগরিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে যিনি মানুষ হইয়াছেন, সেই কবির পক্ষে ঝরণার ধারে পুরু পুরু নধর শাদ্বলে অঙ্গ ডুবাইয়া থাকিবার স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—ইনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে যশোহর জেলায় জগন্নাথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে পাঠ-কালেই তাঁহার কবি-শক্তির প্রথম উন্মেষ হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনার পর তিনি মুঙ্গের প্রবাসকালে তাঁহার অমরকাব্য "মহিলা" রচনা আরম্ভ করেন। কবি নারীর মধ্যে চারিটী মুর্ত্তি দেখিয়াছেন মাতা, জায়া, ভগিনী ও দুহিতা। এই চারি মুর্ত্তিতে ধ্যান করিয়া মহিলা স্তুতিতেই কবির অভিপ্রেত ছিল। এই কাব্য রচনার সময় কবি ভগ্নস্বাস্থ্য ছিলেন। তিনি তাঁহার কাব্যের মাতা ও জায়া পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিয়াছিলেন এবং ভগিনী অংশের সামান্য কিছু রচনা করিয়াছিলেন। এমন সময় মৃত্যু আসিয়া কবিকে সরাইয়া লইয়া গেল। অসমাপ্ত গানেই কবিকে থামিতে হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪০ বৎসর হইয়াছিল।

মাতৃস্তুতি [৫৪]—মহিলাকাব্যের মহিলাস্তুতি মাতৃরূপে। কবিতাটির মধ্যে কোন প্রকার ভাবাবেগ নাই বা স্বপ্নজাল বুনিবার প্রয়াস নাই। অত্যন্ত সুস্থ এবং সবল মনোভাব লইয়া কবি মাতৃমহিমা অনুভব করিতেছেন এবং সংসারী মানুষকে নীতিবোধ সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তুলিতেছেন। ইহাই এই কবিতার বিশেষত্ব।

(২২) স্বার্থপরের আমোঘ অস্ত্র কাপট্য, কাঠিন্য, চাটু ও কটুকুবচন। এইজন্য কবি এইগুলিকে স্বার্থপরতার নিজদল বলিতেছেন।

নিজ অঙ্গ অংশ……(২৭—২৯) মাতার দেহ সন্তানের দেহ। মাতার চৈতন্য সন্তানে সংক্রমিত হয়। এই চৈতন্য-সংক্রমণ-ব্যাপার যেন একটি দীপ হইতে অন্য আর একটি দীপ জ্বালানোর মত। "প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ।"

—কালিদাস

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুলিটি গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং পরে ঐ কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিবর্ত্তিত হইলে সেই কলেজে অধ্যয়ন করেন। বি, এ, এবং ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ইনি ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। কবির শেষ জীবন অত্যন্ত দুঃখে কাটিয়াছিল। তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন এবং নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে তাঁহাকে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর পর তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া বিবেচিত হন। হেমচন্দ্র ছিলেন মধুসূদনের ভক্তশিষ্য। মেঘনাদ-বধ কাব্যের সমালোচনায় তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কবি বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের কোন আদর্শের পূজারী। মধুসূদন কাব্যসাহিত্যে যে ভাব-বিপ্লব এবং ভাষা ও ছন্দের যে বন্ধনহীন বেগময় স্পন্দন আনিয়াছিলেন হেমচন্দ্র তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বৈদেশিক ভাব ও কল্পনাভঙ্গিকে বাঙ্গালার পাঠক-সমাজে বাঙ্গালীর রুচিসহ করিয়া পরিবেশন করিয়াছিলেন এবং তাহা সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। চিন্তাতরঙ্গিনী, বৃত্রসংহার, ছায়াময়ী দশমহ বিদ্যা, আশাকানন, কবিতাবলী নামক খণ্ড কবিতার সমষ্টিগ্রন্থ প্রভৃতি হেমচন্দ্র রচনা করিয়াছেন। কতকগুলি খণ্ড কবিতার মধ্যে হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের প্রেরণা সকার লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই দিকে রঙ্গলালের ভাবাদর্শই কবিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, মনে হয়।

শিশুরহাসি [৫৫]—কবিতার বিষয় শিশুর হাসি। কবিতার আদ্যন্ত কবি যে ভাষা ও ভাব পরিবেশন করিয়াছেন তাহার প্রসাদগুণ লক্ষ্য করিতে হইবে। শিশুর হাসির মধ্যে যেমন একটি সহজ সৌন্দর্য্য আছে কবির ভাষার মধ্যেও তেমনই একটি অনায়াসশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিশুর হাসিতে ফুটিয়া উঠে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য। উহার সৃষ্টির মূলে আছে চিরদুঃখী মানবের প্রতি বিধাতার করুণা।

ফুলের লাবণ্যবাস (১৬—১৭) উভয়ই মনোমুগ্ধকর এবং উভয়ই বিধাতার ভাব-তন্ময়ক্ষণে সৃষ্ট হইয়াছে।

তথাপি কবির মনে একটা সন্দেহ জাগিয়াছে (১৩—১৫) শিশুর হাসি ও ফুলের লাবণ্যবাস এ দুইটির মধ্যে বিধাতা কাহাকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন? মনে রাখিতে হইবে প্রথম সৃষ্টিতেই স্রষ্টার সর্ব্বাধিক আবেগ ও অনুরাগ প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই জন্যই প্রথম সৃষ্টি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। কবি কালিদাস অনুত্তম সৃষ্টি বুঝাইতে বলিয়াছেন "সৃষ্টি-রাদ্যা" অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টি।

অমৃত পিপাসু—দেবতারা নির্লোভ নহে। হয়ত এ সৌন্দর্য্যেও তাঁহারা লুব্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তুমি ইহা তাহাদিগকে দাও নাই।

জীবন-সঙ্গীত [৫৬]—কবি Longfellow'র Psalm of life নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ কবিতা আছে। জীবন-সঙ্গীত সেই কবিতার ভাবানুসরণ; শুধু ভাব নয়, মাঝে মাঝে কবি মূলকবিতার ভাষানুবাদ করিতেছেন বলিয়া মনে হইবে, যেমন আরম্ভেই দেখা যাইবে—

ব'লো না কাতর স্বরে······

> "Tell me not in mournful numbers
> Life is but an empty dream

সময় সাগর তীরে······অমর—(৩৩—৩৪) মূলে আছে :—

> "And departing leave behind us
> Foot prints on the sands of time."

কবিতার নামকরণও হইয়াছে জীবন-সঙ্গীত, মূলের—Psalm of Lifeএর ভাষানুবাদ।

দেশবাসীর সর্ব্বপ্রকার নিশ্চেষ্টতার বিরুদ্ধে কবি অভিযান করিয়াছিলেন; এই কথা স্মরণ রাখিলেই এই কবিতায় কবির যে বিশিষ্ট মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা যাইবে।

দিন যায়, ক্ষণ যায়—(১৩—১৬) কোন প্রকার বৈরাগ্যের কথা নয়; অথবা প্রাচীন শাস্ত্রীয় আদর্শে মানুষকে সংসার-উদাসীন করিয়া তুলিবার মত কোন কথাও বলা হয় নাই। বরঞ্চ বুঝান হইতেছে, সময় চঞ্চল, জীবনও চিরস্থায়ী নহে; সুতরাং মানুষের এই স্বল্প-পরিসর কাল-রণাঙ্গনে নিশ্চেষ্ট হইয়া না থাকিয়া কর্ম্ম করা উচিত। তাহাতেই জীবন-মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মনোহর মূর্ত্তি······কাতর (২১—২৪) অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতে মুক্ত করিয়া কবি শুধু বর্ত্তমানকেই গ্রহণ করিতেছেন। অতীতের অনুতাপ বা ভবিষ্যতের ভাবনার মধ্যে কোন সার্থকতা নাই। তাহাতে বর্ত্তমান সময়ের অপব্যবহার হয় মাত্র।

যমুনাতটে [৫৭]—এই শ্রেণীর কবিতা-রচনা হেমচন্দ্রের একটি বিশেষত্ব। ইহার সাহিত্যিক মূল্য সামান্য নহে। প্রকৃতি সম্বন্ধে কবিতা শুধু প্রকৃতিতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া মানুষের ভাবনারাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। প্রকৃতির স্থূল লক্ষণগুলির তালিকা মাত্র দিয়া একদা বাঙ্গালা সাহিত্যে যেরূপ কবিতা রচিত হইত ইহা সেরূপ নয়; আবার এখানে প্রকৃতির স্বরূপতা অস্বীকার করিয়া তাহাকে মানব-প্রাধান্যের কাছে গুণীভূত করা হয় নাই—জনৈক সমালোচক যাহাকে বলিয়াছেন Subordinating Nature to human interest ইহার সহিত (৫০) সংখ্যক কবিতাটীও তুলনা করিলে দুইয়ের রসরূপের বিভিন্নতা উপলব্ধি করা যাইবে। ইহাতে প্রকৃতির কোন প্রকার মানবীয়রূপ-

কল্পনা নাই। এই কবিতায় বুঝিতে পারা যায় The landscape has a sentiment of its own.

হায়রে প্রকৃতিসনে……(৩১—৩৫) প্রকৃতি-পূজারী ইংরেজ কবি Wordsworth-এর চিন্তাপ্রণালী হেমচন্দ্রের ভাবকল্পনায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। (৪১—৪৫) ইহাও হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব। নিসর্গের প্রতি চাহিয়া কবির মনে পড়ে ব্যক্তিজীবনের সুখদুঃখ, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন প্রভৃতি অনেক কথা।

লজ্জাবতী লতা [৫৮]—ইহাও হেমচন্দ্রের একটি খণ্ড কবিতা। এখানেও কবির প্রকৃতি-নিরীক্ষণ একই দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে হইয়াছে। প্রকৃতিরাজ্যের সামান্য ঐ লজ্জাবতী লতা দেখিয়া কবির মানবসমাজের কথা মনে পড়িয়া গেল। এই শ্রেণীর কবিতাই তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিসর্গ-কবিতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপের সন্ধান এই প্রকারের রচনায় পাওয়া যাইবে না। এ যেন কবি প্রকৃতির ঘটনা বা দৃশ্যের সাহায্যে আপন মনের কতকগুলি চিন্তা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। নিসর্গের সঙ্গে নিজেকে মিশাইয়া ফেলিয়া মন্ময়ভাব-প্রকাশ এই শ্রেণীর কবিতায় নাই।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—১৮২৯ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার কোন্নগর নামক স্থানে এই কবি জন্মগ্রহণ করেন। "পদ্যপাঠ" প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ রচনা করিয়া এক সময়ে তিনি বিদ্যার্থি-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। স্বকীয় রচনা এবং কবিতা-চয়নের মধ্যে তাঁহার ছাত্রহিতৈষণায় প্রবুদ্ধ-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় Oscar Wilde বলিয়াছেন "To reveal art and to conceal the artist is Art's aim" এই লক্ষণাক্রান্ত art-এর সন্ধান তাহার কবিতার অনেক স্থলেই পাওয়া যাইবে না। প্রায়শঃই কবি উপদেষ্টারূপে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাতে তিনি তাঁহার উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্যই করিয়াছেন। কবির ভাষা সুসংস্কৃত ও সুমার্জ্জিত। ভাষার এই সংস্কৃত ও মার্জ্জিতরূপ তরুণ বিদ্যার্থীদিগকে ভাষাশিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছিল মনে হয়।

জন্মভূমি [৫৯]—ভাষার দুর্গম (আধুনিক ছাত্রদের পক্ষে) প্রাচীর অতিক্রম করিয়া গেলেই কবির ভাবকক্ষের (সে কক্ষ যেমনই হোক) সন্ধান মিলিবে। কবিতাটীর আদ্যন্ত কবির অনুপ্রাস-প্রীতি লক্ষ্য করিতে হইবে।

বহিত্র—তরী বা বৃহৎ জলযান। এই শব্দের অন্য অর্থ দাঁড়। কর্ণধার—মাঝি।

সুকেশিনী শিরঃ শোভা·····(২৭—২৮) রোমের ইতিহাসে Punic যুদ্ধে এইরূপ একটি ঘটনার বিবরণ আছে। রমণীগণ ধনুকের ছিলার জন্য তাহাদের কেশ কাটিয়া উপহার দিয়াছিল।

স্বর্গাদপি গরীয়সী······(৩১) জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও বড়। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

যমুনা [৬০]—এই কবিতার স্তবকে স্তবকে পৌরাণিক কাহিনী রহিয়াছে। সেই পুরাবৃত্তগুলি জানিলেই কবিতার কথা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। এখানেও অনুপ্রাস দ্বারা একপ্রকার ধ্বনিমাধুর্য্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে। কবিতার প্রত্যেকটী পংক্তি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেই তাহা ধরা পড়িবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ; সুতরাং রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কবি বিহারীলালের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা পরস্পরের প্রভাবে কবিতা রচনায় ব্রতী হন। দ্বিজেন্দ্রনাথ শুধু যে কবি ছিলেন, তাহা নয় ; তিনি ছিলেন সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। অপরিণত বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি লিখিতেন বহু, কিন্তু সেগুলি সকলকে পড়িয়া শুনাইয়া আবার হাসিতে হাসিতে ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। তাঁহার স্বপ্নপ্রয়াণ নামক রূপক-কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নানা বিষয়ে গভীরপাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু প্রবন্ধ এবং রসোজ্জ্বল কবিতা মাসিক পত্রগুলিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার রঙ্গ-কবিতার সমষ্টি 'কাব্যমালা' নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

যক্ষের আলয় [৬১]—কোন এক যক্ষ কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলার জন্য যক্ষপতিকর্ত্তৃক নিজবাসভূমি অলকা হইতে রামগিরি এক বৎসরের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। নির্ব্বাসিত যক্ষ দারুণ মনস্তাপে আট মাস কাটাইয়াছে এমন সময় আষাঢ়স্য প্রথমো দিবসঃ (১লা আষাঢ়) আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন যক্ষ জলভরা কালো মেঘগুলিকে বাতাসের বেগে উত্তরদিকে যাইতে দেখিতে পাইল। এই উত্তরদিকেই, কৈলাসের নিকট অলকায় তাহার বাড়ী। যক্ষ ভাবিল, এই মেঘের কাছে সংবাদ দিলে সে অবশ্যই তাহা অলকায় তাহার পত্নীর নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে। এই ভাবিয়া যক্ষ মেঘকে স্বাগতসম্ভাষণ জানাইয়া কুচিফুলের উপহার দিল। নির্ব্বাচিত অংশে যক্ষ মেঘকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছে অলকায় কোন্‌টা তাহার গৃহ। ইহা কবি কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূতের বিষয়-বস্তুর অংশমাত্র। দ্বিজেন্দ্রনাথ এখানে মেঘদূত কাব্যের সেই অংশের চমৎকার ভাবানুবাদ করিয়াছেন। আদ্যন্ত ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ কবিতাটীকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

উহার একটীধারে···৭—১২ মূলে আছে—

“বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধবৈদূর্য্যনালৈঃ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ॥”—উত্তর মেঘ ১৫

তাহার মাঝেতে আর······২৫—৩০ মূলে আছে—

“তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টিঃ
মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ॥”—উত্তরমেঘ ১৮

নিশীথ [৬২]—দ্বিপ্রহর রাত্রির অতি চমৎকার বর্ণনা। স্তব্ধ রজনীর মূক মূর্ত্তিটী কেমন সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে! নিশীথের প্রকৃতি যেন জীবনহারা। কোথাও জীবনের কোন লক্ষণ নাই; শুধু জোনাকির আলোতে, শীতল বাতাসে এবং জীবের নিঃশ্বাস-পতন-ধ্বনিতে একটুখানি জীবন-লক্ষণ উপলব্ধি করা যায়। এ যেন মুমূর্ষুর ক্ষীণ নাড়ীস্পন্দন। এই প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাতেও সেই সত্য-দর্শন নাই, যে সত্য-দর্শনে কবিগণ বলেন—

"প্রকৃতির সাথে হয় কবি-চিত্ত-বিনিময়
সংসার বোঝে না সেই জীবন্ত স্বপন—।"

নবীনচন্দ্র সেন—১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়াগ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থগুলি—অবকাশরঞ্জিনী, পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, অমিতাভ ও অমৃতাভ। পলাশীর যুদ্ধ প্রকাশিত হইবার পরই তাঁহার কবি-খ্যাতি দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। তিনি 'আমার জীবন' নামে সুদীর্ঘ আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কবি যশোমণ্ডিত হইয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

কবির সমস্ত কাব্য-সাধনার মধ্যে একটী মাত্র উদ্দেশ্যের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মনুষ্যত্বের বিরাট্ মহিমা-কীর্ত্তন। অমিতাভ কাব্যের ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন—"সকলেই বুদ্ধদেবকে অল্পাধিক অতি-মানুষিকভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য তাহাকে মানুষিক ভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ অবতারদিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতিলাভ করে, তাঁহাদিগকে অধিক আপনার বলিয়া বোধ হয়।" এই যে মনুষ্যত্বের জয়ঘোষণা ইহাই তাঁহার সমস্ত ভাবকল্পনার সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে এবং এই মানবত্বে শ্রদ্ধাবোধ তাঁহার কাব্যকে একটা বিশিষ্ট গৌরবদান করিয়াছে। অমিতাভ কাব্যের বুদ্ধ রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের কৃষ্ণ মহামানব, অতিমানব নহে। কবি তাঁহার ধ্যানাদর্শের অনুরোধে মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক তথ্যকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আপন মতে গড়িয়া লইয়াছেন। এই কথা স্মরণ রাখিলেই নবীনচন্দ্রের কাব্যের রসগ্রহণ সার্থক হইবে।

বুদ্ধদেবের অনুত্যাগ [৬৩]—বুদ্ধং মে·········(৭-৮) বৌদ্ধদিগের "শরণগমন" বাক্য। তিনটী প্রতিজ্ঞা তাঁহারা করিয়া থাকেন—

"বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং সরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি।"

শিষ্যগণ এককণ্ঠে·········(২৪) কথিত আছে বুদ্ধদেব মহাপ্রয়াণক্ষণে শিষ্যগণকে চারিদিকে পাইয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। (২৪—২৭) এইস্থানে কবির গভীর ভাবাবেগ কেমন উচ্ছ্বাসময় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে, এই উচ্ছ্বাসময় ভাব-বিহ্বলতাই নবীনচন্দ্রের বিশেষত্ব। ভাবাবেগ কবিচিত্তকে মাঝে মাঝে ভাসাইয়া একটা সঙ্গতিহীন দূরত্বে নিক্ষেপ করিত। সেই জন্য উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভার অধিকারী হইলেও নবীনচন্দ্রের বাণী সংযম-বলয়িত হইয়া কাব্য-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে পারে নাই।

৩৮—৪০ মিতাভ ও অমিতাভ কথা দুইটীর মধ্যে ব্যতিরেক-ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়।

৪৯—৬১ কবিতার শেষাংশে কবি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কবি-মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাপুরুষ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। যুগ-প্রয়োজনই তাঁহাকে ধরণীবক্ষে টানিয়া আনে। সেই প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন নাম-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিভিন্ন যুগে মহাপুরুষ আবির্ভূত হন। কৃষ্ণ-বুদ্ধ-খৃষ্ট-মহম্মদ-চৈতন্য এই বিভিন্ন ব্যক্তি-পুরুষের মধ্যে একটী অভিন্ন ভাব-মূর্ত্তি আছে। সেইজন্য কবি তাঁহাদিগকে অভিন্ন বলিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই দুঃখের পূজারী এবং প্রেমাবতার। প্রত্যেকেই পথহারা আদর্শভ্রষ্ট মানুষকে পথের সন্ধান দিয়াছেন।

সমুদ্র [৬৪]—সুনীল আকাশ দূরে······(৯—১০) কবি এখানে সম-রূপের মিলনে যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন অন্যত্র শুধু রূপের নয়, ভাব-রূপের মিলনে সেই বিস্ময় প্রকটিত হইয়াছে! যথা—

"নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়
মিশাইয়া পরস্পরে, মহা আলিঙ্গন;
মহাদৃশ্য, অনন্তের অনন্ত মিলন।

অর্জ্জুনের শোক [৬৫] কবিতাটীর আরম্ভে শোক, অবসানে রণোৎসাহ। এখানে করুণ ও বীর এই দুইটী রসের একত্র সংস্থান হইয়াছে। অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর মৃত্যু, অর্জ্জুনের শোক এবং কৃষ্ণের বীরোচিত উদ্দীপনার কথা এখানে বলা হইয়াছে।

সুলোচনা—কবির কল্পিত চরিত্র; স্বজনহীনা সুলোচনা সত্যভামার সখী হইয়াছিলেন এবং সুভদ্রাকে ভগিনীনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। অভিমন্যু ছিল তাঁহার পুত্রাধিক।

শিবনাথ শাস্ত্রী—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে শিবনাথের মাতুলালয়ে জন্ম হয়। তাঁহার মাতুল ছিলেন সোমপ্রকাশ পত্রের সম্পাদক স্বনামখ্যাত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। শিবনাথ তাঁহার চরিত্রের তেজস্বিতা পৈতৃক অধিকাররূপেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ নবপ্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া সেই ধর্ম্মগ্রহণ করেন। তখন তিনি মাত্র এফ-এ-পাশ করিয়াছেন। পরে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যে এম্-এ পাশ করিয়া শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। দেশের হিতৈষণা ও সমাজের সংস্কারব্রতে সম্পূর্ণ নিজেকে লিপ্ত রাখিয়াও তিনি সাহিত্য সেবা করিয়াছেন এবং কবিতা রচনা করিয়াছেন। যে বিরাট্ কবি-প্রতিভা লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার অনুরূপ সাহিত্য সৃষ্টি তাহা হইতে হয় নাই। রাষ্ট্র-ধর্ম্ম-সমাজসংস্কারে প্রবুদ্ধ বুদ্ধি তাঁহার ভাবকল্পনাকে মুক্ত-পক্ষ হইয়া স্বচ্ছন্দ স্বাধীনভাবে বিহার করিতে দেয় নাই। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—শাস্ত্রী মহাশয় অতুল ভাবসম্পদের অধিকারী হইয়াও সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ কিছু দান করিলেন না। শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত গ্রন্থগুলি—নির্ব্বাসিতের বিলাপ, পুষ্পমালা, হিমাদ্রিকুসুম, পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি।

বাসন্তী পূর্ণিমা [৬৬]—প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা। [৬২] কবিতার সঙ্গে ইহার ঐক্য ও [৫২] এবং [৫৭] সংখ্যক কবিতার সহিত ইহার পার্থক্য বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

শোভা ফুটিছে (১) কানায় কানায় (৫) উছলিয়া যায় (৬) এই শব্দগুলির প্রয়োগরীতি লক্ষ্য কর। অঙ্গে লাগে জ্যোৎস্নারস—একটী প্রবল ঐন্দ্রিয়ক অনুভূতির ইঙ্গিত। পরাণ……(২৪) এখানে পারস্পরিক ভাব রহিয়াছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে।

গিরীশচন্দ্র ঘোষ—প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্রের ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বাগ্‌বাজারে জন্ম হয়। স্কুলের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্তই তাঁহার প্রথাবী শিক্ষা। আপন অধ্যবসায় ও বিদ্যানুরাগের অনুপ্রেরণায় তিনি পরবর্ত্তী জীবনে ইংরেজী ও বাঙ্গালা-সাহিত্যে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নাট্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া গিরীশচন্দ্র বহু নাটক ও অসংখ্য গান রচনা করেন। তাঁহার গানগুলি বাঙ্গালার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

লক্ষ্মণবর্জ্জনে রাম [৬৭]—গিরীশচন্দ্র ঘোষের লক্ষ্মণবর্জ্জন নামক নাটকের একটী দৃশ্য। নাটক বস্তুধর্ম্মী সৃষ্টি। আধুনিক নাটকগুলিতে বস্তুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে মন্ময় কল্পনা বড় বেশি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। গিরীশচন্দ্রের নাটকগুলিকে ঐরূপ কল্পনা ভারাক্রান্ত করে নাই। তাঁহার নাটকে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি তাহাদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নির্ব্বাচিত অংশে যে ছন্দের পরিচয় রহিয়াছে তাহা অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এই বিশেষ অমিত্রাক্ষর ছন্দোরূপ গিরীশচন্দ্র ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া ইহার নাম গৈরীশছন্দ। এই কবিতার অমিত্রাক্ষর ছন্দের সহিত [৪১] কবিতায় মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও [৬৫] কবিতায় নবীনচন্দ্রের অমিত্রাক্ষর ছন্দের তুলনা করিয়া পড়িলে পার্থক্য উপলব্ধি করা যাইবে।

গোবিন্দচন্দ্র দাস—ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল পরগণার জয়দেবপুর গ্রামে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কবি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "ভাওয়ালের কবি" বলিয়াই প্রসিদ্ধ। গোবিন্দ দাস উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। লক্ষ্মী তাঁহার উপর কখনও কৃপা কটাক্ষ করেন নাই, কিন্তু বাণীর তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সেবক। পারিবারিক দুঃখ-কষ্ট এবং নানাপ্রকার উৎপীড়ন-নির্যাতন সহ্য করিয়াও তিনি কেমন করিয়া দিব্য কল্পনায় ভাবতন্ময় হইয়া থাকিতেন তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার সমকালীন নবীন কবিদিগের মত তিনি শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু গীতিকবির যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ সেই fine frenzy ও sincerity of expressionএ দুইয়ের উপর তাঁহার প্রভূত অধিকার ছিল। মগের মুলুক, প্রেম ও ফুল, কুঙ্কুম, কস্তুরী, চন্দন, ফুলরেণু, বৈজয়ন্তী প্রভৃতি' কবিতাগ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন।

বরষার বিল [২৮]—এই কবিতাটী বস্তু-সর্ব্বস্ব নয়। বাহিরের বাস্তব বর্ণনার ভিতরে কবি কতখানি নিজেকে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এ বর্ণনায় গতানুগতিকতা নাই। জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যে মানুষ নিজেকে দেখিতে পায়, বিশ্বকে সে গ্রহণ করে আপন বিশিষ্টরূপে। আবার তাহার প্রকাশের মধ্যে হয় তাঁহারই আত্মপ্রকাশ। এই লক্ষণ আধুনিক কবিতার একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। গোবিন্দদাসের কবিতাতেও এই লক্ষণটী প্রায়শই ফুটিয়া উঠে।

মা-মরা মেয়ে [৬৯]—কবি গোবিন্দদাসের অনুভূতির প্রগাঢ়তা এই কবিতাটীকে রসোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। অত্যন্ত সহজ সরল ভাষার মধ্যে ভাব (sentiment) কতটা আবেগ-গভীর হইয়া উঠিতে পারে তাহার পরিচয় আছে এই কবিতায়।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—কলিকাতা অন্তঃপাতী ভবানীপুরে মাতুলালয়ে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে গিরীন্দ্রমোহিনীর জন্ম হয়। পিতৃ-নিবাস কলিকাতার সন্নিকটে পানিহাটী গ্রাম। বিবাহান্তে গিরীন্দ্রমোহিনী এমন শ্বশুরালয়ে স্থান লাভ করিলেন (বহুবাজারের সম্ভ্রান্ত দত্ত

পরিবার) সেখানে স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ দেওয়া হইত এবং এই শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা ছিল। তিনি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সেই যুগের সাহিত্য-কর্ণধার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা অর্জ্জন করেন। পরে কিছুদিনের জন্ম 'জাহ্নবী' মাসিকপত্র পরিচালনা করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বৈধব্যের পর তিনি "অশ্রুকণা" নামে একখানা কাব্য রচনা করেন। তাঁহার রচিত আরও দুইখানা কাব্য আছে, শিখা ও অর্ঘ্য।

শেষ-বিশ্রাম [৭০]—মৃত্যুবিষয়ক কবিতা। মানুষের শেষ-বিশ্রাম কবর বা শ্মশানের তুচ্ছ ধূলিশয্যায়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কবি যে প্রশ্নগুলি তুলিয়াছেন তাহাতে কবিতার প্রথম অংশ বেদনা-বিধুর হইয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে কবিতাটীর আগুন্ত একটা সমাধানহীন প্রশ্ন-প্রবাহ।

দারাসুত (৩) ও বীজনী-বাজন (৬) কথা দুইটীর প্রয়োগ-নৈপুণ্য লক্ষ্য কর। উহাদের অর্থ জানিয়া রাখিবে।

সন্তান ও জননী [৭১]—অতিশয় তুচ্ছ ও সাধারণ বস্তু অথবা দৃশ্যগুলি সাহিত্যে আরোপিত হইয়া কেমন করিয়া তুচ্ছতা পরিহার করে এবং সাধারণ হইয়া উঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে এই কবিতায়। প্রথম ১৬টী লাইনে শুধু একটা যথাদৃষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। তারপর হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেই স্বভাববর্ণনা কল্পনা-রঞ্জিত হইয়াছে।

প্রয়োগরীতি লক্ষ্য কর—কুটুসুটে জোছনা (১) ধবধবে আঙ্গিনায় (২) ঝুরুঝুরু বায় (৯) আঁখি ঢুল ঢুল (১২) মেশামেশি (১৩)

ঘুমপাড়ানি গান কাহাকে বলে? পিউ পিউ তান কেন বলা হইল তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে।

ধূলা [৭২]—আধুনিক গীতি-কবিতা ধরার ধূলিকণা হইতে নন্দনের পরিজাত পর্য্যন্ত যে কোন বিষয় বস্তু অবলম্বন করিতে পারে। এখানে

বস্তুর সহিত মন্ময় কল্পনা মিশিয়া কেমন উৎকৃষ্ট একটি কবিতা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য।

মোরা বিজ্ঞ......জগৎজননীরূপা (১৪—১৫) কবি এখানে একটি গভীর দার্শনিক তত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন। অণু হইতেই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি হইয়াছে। অণুতে অণুতে মিলিয়া দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক হইতে ত্রসরেণু এমনি করিয়াই তো পৃথিবীর উদ্ভব হইয়াছে। আমরা সেই পার্থিব ক্ষুদ্র ধূলিকণাকে—সৃষ্টির মূল উপাদানকে—ঘৃণা করি। আমরা আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া প্রচার করি; কিন্তু বুঝিতে পারি না, আমাদের বিজ্ঞতা কত বড় অজ্ঞতায় সমাচ্ছন্ন।

কায়কোবাদ—১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানার অধীন আগলা পূর্ব্বপাড়া গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। বিশেষ পরিণত বয়সের এই কবি অদ্যাপি জীবিত আছেন। তিনি যখন প্রধান বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন এই ক্ষেত্রে মুসলিম সাহিত্যিকগণ সমবেত হন নাই। তখনকার সেই যুগে মাত্র চারিজন মুসলিম সাহিত্যিক বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় ঐকান্তিকনিষ্ঠার সহিত আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন; শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক, কুষ্টিয়ার মীর মোশাররফ হোসেন, ময়মনসিংহের রেয়াজ উদ্দিন ও ঢাকার কবি কায়কোবাদ। কবির রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অমিয়ধারা, শ্মশানভস্ম, অশ্রুমালা এবং মহাশ্মশান বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ভুল-ভাঙ্গা [৭৩]—ভাব অত্যন্ত সরল। ভাষা সুসংস্কৃত।

দশজন—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়।

ছয়টি দস্যু—কামাদি ষড় রিপু।

কামিনী রায়—ইনি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেখক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বরিশাল জেলার বাসণ্ডা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। কামিনী রায় সেই যুগের একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। তিনি বহু কাব্য ও নাটক রচনা করেন। তন্মধ্যে আলো ও ছায়া, দীপ ও ধূপ, অশোক-সঙ্গীত, জীবন-পথে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

সুখ [৭৪]—কামিনী রায়ের রচনায় আত্মভাব-প্রাধান্য আছে, কিন্তু সেই আত্মভাব সম্পূর্ণ আত্মমুখী না হইয়া সমাজমুখী হইয়াছে। কবির সজ্ঞান-চিন্তা কেবলমাত্র ভাব-বিলাসে নিঃশেষ না হইয়া বিষাদমূর্চ্ছিত দুর্ব্বল সমাজের প্রেরণা-সঞ্চারে নিয়োজিত হইয়াছে। সেই জন্য তাঁহার রচনায় কুত্রাপি নৈরাশ্যবাদ প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। আশাবাদই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কবিতাটির মধ্যে একটী জীবনাদর্শেরও সন্ধান দেওয়া হইয়াছে।

মধুর স্বপন [৭৫]—ইহা একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত। হৃতসর্ব্বস্ব ভারতের সমস্ত গৌরব আজ লুপ্ত। কবি সেই লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারের মোহন ছবি যেন স্বপ্নে দেখিলেন। কবির আশাবাদ লক্ষণীয়।

ঘুচেছে ব্যথা (৪) প্রয়োগরীতি লক্ষ্য কর; আঁধার (৫) শব্দটির মধ্যে সানুনাসিকতা কোথা হইতে আসিল? (১৩) কবিতায় পাঁতি শব্দের টীকা দেখ। মোহনবল কথাটির শব্দ-সঙ্গীত বুঝিতে পারিয়াছ কি? ক্ষণেক শব্দের সন্ধির বিশেষত্ব লক্ষ্য কর।

পথভোলা [৭৬]—মানুষ দুর্ব্বল; তাহার জীবনে স্খলন-পতন-ত্রুটি আছে। পতিত বা পথভ্রষ্টকে ক্ষমা করিতে হইবে। পাপীকে ঘৃণা করা সেই পাপীর পাপের চেয়েও বড় পাপ। কবির কথায়, "উপেক্ষা যে বিষ-বাণ!" সমস্ত কবিতাটির মধ্যে একটি নীতি-প্রাধান্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ সেন—পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম। কবির পিতা কর্ম্মোপলক্ষে বিহারের অন্তর্গত গাজীপুরে বাস করেন। এই স্থানেই কবির জন্ম হয়। দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মস্থল এলাহাবাদ। এই স্থানেই তিনি ওকালতী করিতেন। কবি ছিলেন সেই যুগের একজন উচ্চতম উপাধি-ধারী (এম্ এ) শিক্ষিত ব্যক্তি। নৈসর্গিক কবি-প্রতিভা ও উচ্চশিক্ষার সম্মেলনে দেবেন্দ্রনাথের কবি-মানস গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেই মানসে আর কাহারো ছায়া নাই; কবি সেখানে একক। ইহাই তাঁহার মৌলিকতার মূলে। দেবেন্দ্রনাথ যখন ভাবতন্ময়-হইয়া নিজের কবিতা আবৃত্তি করিতেন, তখন তাহা

হইতে পরম উপাদেয় 'কিমপি দ্রব্যম্'। অশোকগুচ্ছ, সেফালীগুচ্ছ প্রভৃতি কাব্য-কবি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সুনীল সাগরে সোনার কমল [৭৭]—জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের কবি-হৃদয়ের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সেই সৌন্দর্য্য-ভোগের ভোক্তা কবির বুদ্ধি ও কল্পনা নহে, তাঁহার হৃদয়। সেই জন্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হইতে তাঁহার কবিতায় ভাব-তন্ময়তাই বেশি ফুটিয়াছে। এই কথা স্মরণ রাখিলেই দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-আরাধনা বুঝা যাইবে।

১৯—২২ দৃষ্টান্তটি কি চমৎকার! কালিদাসের ভাবনিমীলিত নয়নে এমনই একটি চিত্র ভাসিয়া উঠিয়াছিল—

"হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ"

২৫—৩০ এই উচ্ছ্বাসময় ভাবাবেগ দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব।

বর্ষা সুন্দরী [৭৮]—সেই একই সৌন্দর্য্য-আরতি; [৭৭] কবিতা দেখ। এই আরতিতে প্রীতি ছাড়া অন্য মন্ত্র নাই; এই কবিতায় প্রকৃতির মানবীয় রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। তাহাতে বর্ষার স্বাতন্ত্র্য কেমন সুন্দর-ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে! ইহার সহিত (৫০) কবিতার প্রকৃতির-রূপের তুলনা করিয়া, দুইটি কবি-কল্পনার মধ্যে কোথায় মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে। এই কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে এক রমণীয় চিত্র এবং ইহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত রহিয়াছে একটি মধুর সঙ্গীত। সেই সঙ্গীতশ্রী বিশেষ করিয়া এই কয়েকটি বাক্যাংশে লক্ষ্য করিবে—মুক্তমেঘবাতায়ন (৩) "রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ করি" (৫) পড়িছে ঝর্ঝরি (৬) সতত সরসা (৯) ভুবনমোহিনী ধনী রূপসী বরষা (১০)

রাজা রামমোহন রায় [৭৯]—একটি sonnet. আলোচনা [৪৩] কবিতায় দ্রষ্টব্য। ইহাতেও একটি বিশেষ মিলের রীতি রহিয়াছে।

ত্রিধারা

অক্ষয় কুমার বড়াল—১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এক সুবর্ণ বণিক্-পরিবারে কবির জন্ম হয়। কবির রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, ভুল, শঙ্খ ও এষা প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে আবার এষা কাব্যখানি সমধিক প্রসিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের ইনি সমসাময়িক এবং তাঁহারই মত কবি বিহারীলালের কবি-শিষ্য। কাব্য-সাধনায় অক্ষয়কুমার ভাবে ও ভাষায় একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সংস্কৃত ও সুমার্জ্জিত। যাহাকে ভাষার classical রূপ বলে তিনি সেই রূপকেই তাঁহার কাব্যে স্থান দিয়াছেন। ভাষার সংহতরূপের জন্যই তাঁহার ভাব অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাব-ঘন সুমার্জ্জিত ভাষাই অক্ষয়কুমারের কাব্য-ভাষা।

বঙ্গ-জননী [৮০]—বঙ্গভূমির মানবীয় রূপকল্পনা। [৭৮] কবিতার কবি-প্রেরণার মূলে প্রীতি আর এই কবিতার কবি-প্রেরণামূলে ভক্তি। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয়টি ঋতুর বিভিন্ন বিভিন্ন সৌন্দর্য্য রহিয়াছে। এই সৌন্দর্য্যই জননীর ষড় ঐশ্বর্য্য। কবিতাটির স্তবক-বিভাগে সেই ঐশ্বর্য্যের রূপ-বিভাগ রহিয়াছে।

বদনচন্দ্রমা, নয়নসোহাগে, শ্যামলসুষমা, চরণ-অলক্তরাগ (২৫—২৮) মদির মধূর্ক-বন (৩৯)—স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিয়া পড়। দেখ, এই ভাষা খাঁটি কবিতারই ভাষা।

চণ্ডীদাস—বাংলা সাহিত্যের আদি যুগের শ্রেষ্ঠ গীতি কবি।

চৈতন্য—প্রেম ও ভক্তির অবতার চৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রঘুনাথ শিরোমণি—নবদ্বীপের একজন প্রখ্যাত নৈয়ায়িক (১৫—১৬শ শতাব্দী)।

কবি জয়দেব—১২শ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি। সংস্কৃত ভাষায় গীত-গোবিন্দ নামক একখানা "কোমলকান্ত" কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, রাজা গণেশ প্রত্যেকেই বাঙ্গালার কৃতী সন্তান ও স্বাধীন নরপতি ছিলেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, রামপ্রসাদ সেন, মাইকেল মধুসূদন—গ্রন্থমধ্যে ইহাদের পরিচয় দেখ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়.উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নিবন্ধকার।

মানব বন্দনা [৮১]—কবিতাটী অক্ষয়কুমারের মানব বন্দনা নামক বৃহৎ কবিতার খণ্ড-অংশ। পুরাতন যুগের কবিতার মত ঈশ্বর বা দেবতা বন্দনায় কবিকল্পনা নিয়োজিত না হইয়া মানব বন্দনায় নিয়োজিত হইয়াছে। ইহা আধুনিক যুগের বিশেষত্ব এবং স্পষ্ট একটী যুগ-লক্ষণ। (১৬) কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই কবিতার মানব-বন্দনার সহিত নবীনচন্দ্রের মনুষ্যত্বের জয়-ঘোষণা তুলনা করিয়া পার্থক্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে। নবীনচন্দ্র যাঁহার বন্দনা করিয়াছেন তিনি মানব হইলেও বিলক্ষণ মানব বা যুগাবতার মহাপুরুষ। অক্ষয়কুমারের বন্দনার বিষয় হইতেছে সমস্ত মানব সমাজ। দ্বিজ, চণ্ডাল, প্রভু, ক্রীতদাস প্রত্যেকের দ্বারাই তো এই বিরাট মানব সমাজ গঠিত হইয়াছে। সুতরাং কৃষিজীবী, তন্তুজীবী, স্থপতি, তক্ষণ প্রত্যেকেই বন্দনীয়।

প্রকৃতি জননী [৮২]—এই কবিতায় আকাশ, বাতাস, পৃথিবী লইয়া প্রকৃতির রূপ-প্রকাশ হইয়াছে। সুতরাং, তিনি দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ ও ভূলোক-বিহারিণী। কবিতাটী পড়িয়া মনে হয়, নদ-নদী, গিরি-নির্ঝর, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ছাড়িয়া প্রকৃতির যেন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা আছে। কবি সেই সত্তা আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাঁহাকে স্পর্শ-লাভের নৈকট্যে পাইয়া বলিতেছেন—

"—দেছ যবে ধরা,
আর ছাড়িব না, জননী!"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষালাভ না করিয়াও মানুষ কত বৃহৎ জ্ঞান-সম্পদের অধিকারী হইতে পারে রবীন্দ্রনাথের জীবন সেই প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছে। সমগ্র রবীন্দ্র-জীবনী নিঃশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান-গবেষণা হইতে তাঁহার সত্যদর্শন বড়, যেহেতু তাঁহার বুদ্ধি হইতে বোধি অধিক

জাগরূক ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের অন্যতম এবং বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। কবি প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের যাহা কিছু রমণীয় ও বরণীয় তাহাকে তাঁহার অন্তরের জারকরসে জীর্ণ করিয়া আপন ধ্যান-কল্পনায় এক নূতন রূপ দান করিয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যের সমস্ত বিভাগ রবীন্দ্র-প্রতিভায় দীপ্ত শ্রী ধারণ করিয়াছে। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগে রবীন্দ্র-সৃষ্টি অনবদ্য ও অসাধারণ।

দুরন্ত আশা [৮৩]—দেশবাসীর আলস্য ও নিশ্চেষ্টতায় কবির দুঃখ। দুর্ব্বল অথচ দম্ভভরা বাঙ্গালী জীবন হইতে বেদুইনের বন্ধনহীন বর্ব্বর জীবনেও একটা মহনীয়তা আছে।

মলিনতাস (৪) ইহার মধ্যে দারিদ্র্যের ব্যঞ্জনা আছে। অন্নপায়ী (৫) জঠরের জারকরস ও চর্ব্বণশক্তি উভয়েরই অল্পতা ঘটিয়াছে। তাই কোন প্রকারে অন্ন পান করাইয়া দিতে হয়। অন্ন আহারের ক্ষমতা নাই। কথাগুলির মধ্যে তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপের মর্ম্মান্তিক কশাঘাত রহিয়াছে। কবিতায় অন্যত্রও এই প্রকার বিচার করিয়া পড়িবে।

বেদুইন—আরবদেশের এক দুর্দ্ধর্ষ ও মহাভয়ঙ্কর যাযাবর জাতি।

বধূ [৮৪]—"বেলা যে পড়ে এল' জলকে চল্!"—সখীর আহ্বান এখানে অলীক কল্পনামাত্র। কিন্তু তাহাই উদ্দীপনা হইয়া কত ছবির পর ছবি দেখাইতেছে। এই ছবিগুলির রূপ-নির্ম্মাণে কেমন একটি উৎকৃষ্ট কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরেজী সাহিত্যে এই শ্রেণীর কবিতাকে বলে "Poem of imagination"; সমগ্র কবিতাটী বধূর কল্পনায় কেন্দ্রিত রহিয়াছে। ইহার সহিত ইংরেজ কবি Wordsworthএর "The Reverie of Poor Susan" কবিতাটী পড়িলে এই শ্রেণীর রচনার রস-মাধুর্য্য বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করা যাইবে।

... .'Tis a note of enchantment ; what ails her ?
She sees a mountain ascending, a vision of trees ;

Green pastures she views in the midst of the dale,
Down which she so often has tripped with her pail ;
And a single small cottage, a nest like a dove's,
The one only dwelling on earth that she loves.
She looks, and her heart is in heaven ; but they fade,
The mist and the river, the hill and the shade.
The stream will not flow, and the hill will not rise,
And the colours have all passed away from her eyes !

পদ্মা [৮৫]—আমাদের অতিপরিচিত দৃশ্যগুলির অপরূপ একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহাই কবিতাটীর সর্ব্বস্ব নয়। ইহার মধ্যে যে কবি-মানস আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার সহযোগেই কবিতার রস উপলব্ধি করিতে হইবে। এই কবিতায় আধুনিক যুগের প্রকৃতি-কবিতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। এই যুগের কবিতায় প্রকৃতি যথাস্থিতরূপ পরিহার করিয়া কবির মনোভাবের অনুরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাক্ষসী পদ্মা 'প্রশান্ত পদ্মা' হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ, সমস্ত কল্পনার মূলে রহিয়াছে কবির একটি প্রশান্ত মনোভাব।

বক্রশীর্ণ....জিহ্বার মতো (১১—১৩) কল্পনাটী কি চমৎকার হইয়াছে! তরল কল্লোল (৭) ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু (১০) স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্ম্মলবিস্তার (২৪) আতপ্তপবনে (২৬) এই বাক্যাংশগুলির সঙ্গীত-সৌন্দর্য্য বুঝিবে।

নীলাভ্র—এখানে অভ্র শব্দ কবি আকাশ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার অন্য অর্থ মেঘ।

বঙ্গমাতা [৮৬]—এই কবিতার সহিত [৮৩] কবিতা তুলনীয়। কবি একই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। কিন্তু কবিতা দুইটীর রসরূপে কত বিভিন্নতা রহিয়াছে। পূর্ব্বের কবিতায় মর্ম্মজ্বালা, এবং সেই সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাত রহিয়াছে। এই কবিতায় কবির হৃদয় বেদনাবোধ ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ।

পূজারিণী [৮৭]—'কথা ও কাহিনীর' একটি কবিতা। এই শ্রেণীর কবিতা-রচনায় দেখা যায় কবি প্রকৃতি-সৌন্দর্য্য হইতে ফিরিয়া মানবের জীবন-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীমতীর ধর্ম্ম-নিষ্ঠা বাহিরের নয়, অন্তরের সামগ্রী। সেই জন্য তাহার কোমল-মধুর কথাগুলির মধ্যেও সেই নিষ্ঠার দৃঢ়রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—"আমি বুদ্ধের দাসী"। এই জীবন-মহিমার চিত্রাঙ্কনই কবির অভিপ্রেত।

ভারত-তীর্থ [৮৮]—ইহাই রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-কল্পনার বিশিষ্ট রূপ; জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বহু ঊর্দ্ধে তাঁহার আসন ছিল; সেই ঊর্দ্ধ আসন হইতে তিনি মহামানবের সাগরতীর, এই ভারত-তীর্থ প্রত্যক্ষ করিলেন।

হেথায় আর্য্য........হ'ল লীন (১--২২) আর্য্য, অনার্য্য, শক, হুন, মোগল, পাঠান—প্রত্যেক সভ্যতার নিকট হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াই ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে।

দুঃসহ ব্যথা....জাগিছে জননী (৬৫—৬৭)—কবির আশাবাদ লক্ষণীয়। ভারতের দুঃখের রাত্রি কাটিয়া যাইবে, এ বিষয়ে কবির সন্দেহ নাই।

বিদায় [৮৯]—মৃত্যুতে খোকার স্থূল দেহ-রূপের বিনাশ হইলেও মায়ের স্নেহের কাছে তাহার ভাবরূপের কখনও বিনাশ হইতে পারে না। জননী একাধারে তাহাকে না পাইলেও আকাশে, বাতাসে—প্রকৃতির সমস্ত অংশে তাহার সূক্ষ্ম-স্পর্শ লাভ করিতে পারেন। কল্পনাটী কেমন চমৎকার তাহা লক্ষ্য করিবে। ইহার সহিত তুলনীয়—

He is made one with Nature : there is heard
His voice in all her music from the moan
Of thunder to the song of night's sweet bird ;
He is a presence to be felt and know
In darkness and in light, from herb and stone.

— *Shelley, Adonais*

বিজয়চন্দ্র মজুমদার—১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিজয়চন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার কর্ম্মস্থান ছিল সম্বলপুর। সেখানে তিনি ওকালতী করিতেন। বিজয়চন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার কথা স্মরণ করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তিনি ঐতিহাসিক, ভাষা-তত্ত্ববিৎ, প্রত্নতাত্ত্বিক সমালোচক ও কবি। তাঁহার বিভিন্ন বিষয়ের বহু গ্রন্থ সুধীসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে দৃষ্টি-শক্তি হারাইয়া তিনি কলিকাতা আগমন করেন। এই অবস্থাতেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনা করিতে থাকেন এবং বঙ্গবাণী নামে মাসিকপত্রের সম্পাদকরূপে গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

শারদ প্রভাতে [৯০]—প্রবাসীর মানসনেত্রে বাঙ্গালা দেশ কি রূপ-মাধুরী লইয়া ভাসিয়া উঠে তাহারই একটা আবেগ বর্ণনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—জন্মকাল ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ। তিনি এম্, এ পাশ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন; তারপর দেশে ফিরিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হন। তিনি নিজে বলিয়াছেন, "বিলাত হইতে ফিরিয়া Wordsworrth ও Shakespeare বার বার পড়িতাম ও শেষোক্ত কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যাংশ মুখস্থ করিতাম।" নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্টি-প্রেরণার মূল-উৎসের অনুসন্ধানে এই স্বীকারোক্তি বিশেষ মূল্যবান্। নাট্যকার যে জগৎ ও জীবন দর্শন করিয়াছেন তাহাও কবির চক্ষে। সেইজন্য রচনা গদ্যাত্মক হইলেও ভাবোচ্ছ্বাসে অনেকস্থলেই তাহা কাব্যধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে। স্বদেশ-প্রেমে কবি যখন তন্ময়, তখন তিনি নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়িয় যেন এক অশান্ত তৃষ্ণা লইয়া পাঠকের কাছে উপস্থিত হইয়াছেন। এমন কি মাঝে মাঝে সাহিত্য আদর্শকে গুণীভূত করিয়া এই তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি সাধনই কবির কাছে বরণীয় বলিয়া বোধ হইয়াছে। ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেম। কবির রচনা—হাসির গান, মন্দ্র, আলেখ্য, আষাঢ়ে এবং জনগণ-সমাদৃত নাটকাবলী।

ভারতবর্ষ [৯১]—একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত। জননী ভারতভূমির শুধু বাহিরের রূপ নয়, তাঁহার স্নেহ-কোমল প্রাণ কবিতার শেষে কেমন সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

সন্তঃস্নান............নিখিল বিশ্বে (৭—১৪)—ভারত-জননীর মূর্ত্তি কি সুন্দর ও স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

চিকুর—কেশ। শীকর—বায়ুচালিত জলকণা।

জলদমন্দ্র—মেঘের মত গম্ভীরধ্বনি।

সমুদ্রে [৯২]—ছন্দোবন্ধনের নবীন রূপটী বুঝিতে হইবে। রূপে পয়ার হইলেও, পয়ারের ধর্ম্ম ইহাতে রক্ষিত হয় নাই। চরণ শেষে না থামিয়া ভাবসমাপ্তিতে থামিতে হইতেছে। সেখানে কিন্তু মিল নাই। মিল আছে পয়ারের মতই পংক্তিশেষে।

কাল করে নাই·· ·· (১৬—১৭) তুলনীয়—

Time writes no wrinkle on thine azure brow
Such as creation's dawn beheld, thou rollest now.

—*Byron*

হ'তে পাত্তেম [৯৩]—দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান হইতে উদ্ধৃত। এই হাসির গানের অন্তরালেও তাঁহার স্বদেশপ্রীতি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। দেশের দুর্নীতিকে তিনি বিদ্রূপের কশাঘাত করিয়াছেন। বহ্বারম্ভ ও বাচালতাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়াছেন।

রজনীকান্ত সেন—১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম। জন্মস্থান পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমা; মর্ম্মস্থান রাজসাহী। এই স্থানে ওকালতী করিবার সময় 'উৎসাহ' নামক মাসিকপত্রে তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে এবং বাঙ্গালার বিদ্বজ্জন-সমাজে তিনি 'কান্ত কবি' নামে পরিচিত হইয়া উঠেন। তিনি স্বদেশ-প্রেমিক এবং হাস্যরসিক ছিলেন। বাণী ও কল্যাণী তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। কান্ত কবির গান আজিও বাঙ্গালী গায়কের প্রিয় বস্তু।

সেথা আমি কি গাহিব গান? [৯৪]—কবির বেদনা-বিলাপের মধ্যে পূর্ব্বতন শিল্পীদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের নবযুগের একটি নূতন সামগ্রী।

জাগরণ [৯৫]—দেশবাসীকে জড়তা হইতে মুক্ত করিবার উদ্বোধন সঙ্গীত। ভাষা তৎসম-শব্দ-বহুল। সমাসবন্ধনে তাহা আরও সংহত হইয়া উঠিয়াছে।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ [৯৬]—বাহিরের আখ্যানভাগের অন্তরালে একটী ভাব-ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। সে ব্যঞ্জনা অত্যন্ত স্পষ্ট ও অনায়াসবোধ্য।

মানকুমারী বসু— ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মানকুমারীর জন্ম হয়। তিনি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল - এই উভয়কুলেই স্ত্রীশিক্ষার সুব্যবস্থা থাকায় মানকুমারীর জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা চরিতার্থ হইবার সুযোগ লাভ করে। তাঁহার স্বাভাবিক-প্রতিভা জ্ঞানদীপ্ত হইয়া তাঁহাকে উচ্চশ্রেণীর পরিমার্জ্জিত কবিতা রচনায় প্ররোচিত করে। তাঁহার রচিত বিক্ষিপ্ত কবিতাবলী সংগৃহীত হইয়া "কাব্যকুসুমাঞ্জলি" নামে প্রকাশিত হয় এবং তাঁহাকে কবিযশের অধিকারিণী করে। তাঁহার অন্যান্য রচনা বীরকুমার বধ ও কনকাঞ্জলি।

আমি যাহা চাই [৯৭]—কবিতাটীতে চমৎকার একটি আদর্শ ছবি ভাসিয়া উঠিয়াছে। ইহা কবির কামনা। [৫৩] কবিতার সহিত এই কবিতাটী পাঠ করিয়া দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে হইবে।

চাতক [৯৮]—প্রভাত-চাতকের গানে কবি মুগ্ধ হইয়াছেন।

কাঞ্চনের কৌটা—নবোদিত সূর্য্য দেখিতে কাঞ্চনের কৌটার মত উজ্জ্বল।

চিত্তরঞ্জন দাস—জন্ম ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে; নিবাস ঢাকা জেলার তেলিরবাগ গ্রামে। চিত্তরঞ্জন—সি, আর, দাশ এই সংক্ষিপ্ত নামেই অধিকতর পরিচিত। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া মুক্তহস্তে তাঁহার সর্ব্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া ত্যাগে, বৈরাগ্যে, দেশ-সেবায় তিনি যে-

আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালার জনগণ তাহাদের হৃদয়ে 'দেশবন্ধু' রূপে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 'দেশবন্ধু' তাঁহার একরূপ, অন্যরূপে তিনি নৈষ্ঠিক সাহিত্য-সেবী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। 'নারায়ণ' নামক মাসিক পত্রের তিনি ছিলেন সম্পাদক। 'মালঞ্চ' ও 'সাগর সঙ্গীত' এই দুইটী কাব্যের তিনি ভাব-বিহ্বল কবি।

উষার জাগরণ [৯৯]—উষার রূপ-কল্পনা। ইহাও একপ্রকার Personification। এই শ্রেণীর বহু কবিতা আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি। সুন্দরী উষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহচরী কৃষ্ণা রজনীর রূপটী কেমন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! পার্শ্বে শায়িতা কৃষ্ণা রজনীর কালো বিস্রস্ত কেশপাশ উষাই বাঁধিয়া দিয়াছে। পূর্ব্বাশার রক্তিম আভা উষার রক্তাধর, বিস্ফুরিত আলোক তাহার চঞ্চল অঞ্চল।

ললিত রাগিণী—····(৪) আকাশের গায়ে প্রভাতের বর্ণ-বৈচিত্র্যই উষার নানা রাগিণী। কবির Mystic কল্পনা লক্ষ্য করিতে হইবে।

প্রত্যাবর্ত্তন [১০০]—মানুষের মন শূন্যবিহারী পাখীর মতই অশান্ত চঞ্চল। রূপের জগতে তাহার আনাগোনার শেষ নাই। কিন্তু মনের তো চিরকাল একই অবস্থা থাকে না। জীবনের সন্ধ্যা যখন ঘনাইয়া আসে তখন আকাশের ক্লান্তপক্ষ পাখীর মতই মন কুলায়-প্রত্যাশী হইয়া উঠে। কবি এখানে সেই কুলায়ের সন্ধান দিতেছেন। সে কুলায় বাহিরে নয়—আপনার মাঝে।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—কবির নাম ইতিমধ্যে বাঙ্গালী ভুলিতে বসিয়াছে। কিন্তু কোনকালে বাঙ্গালার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিগ্‌ বিভাগের দুইটী শ্রেষ্ঠ পত্রিকায়—বান্ধব ও বঙ্গদর্শনে—এই কবির রচনা নিয়মিত ভাবে বাহির হইত। তাঁহার রসোজ্জ্বল রচনার স্তাবক সে-যুগে বহু ছিল। কবির ভাব স্বতঃ উৎসারিত; ভাষা মুক্ত-বন্ধন ও সাবলীল। এইজন্য বালক পাঠ্য কবিতা-সংগ্রহ-পুস্তকে আজিও তাঁহার কবিতাবলী সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

নীরস শীতের গৃহে আজি কে গাইল গান [১০১]—শীতের আড়ষ্ট রূপের মধ্যে নব-বসন্তের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছে। কবিতার ভাষা সম্বন্ধে কবি-পরিচয় দ্রষ্টব্য। কবিতার প্রথম পদটী প্রত্যেক স্তবক-শেষে ঘুরিয়া আসিতেছে। ইহাকে ধ্রুবপদ বলে। পদের এই প্রকার পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনে সুন্দর একটী গীতি-মূর্চ্ছনার সৃষ্টি হইতেছে।

প্রিয়ম্বদা দেবী—প্রিয়ম্বদাদেবী সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বীরবল প্রমথনাথ চৌধুরীর ভাগিনেয়ী। তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণা একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। বিবাহের অত্যল্পকাল পরেই বৈধব্যের শোকাবেগে যে কবিতাগুলি তিনি রচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার 'রেণু' নামক কাব্য-গ্রন্থে সংগ্রথিত হইয়াছে। তাঁহার অন্য দুইটী কাব্যগ্রন্থ—পত্রলেখা ও অংশু। তাঁহার অনুভূতি তীব্র, কিন্তু প্রকাশ অত্যন্ত সংযম-বলয়িত। অনেক রচনাতেই তাঁহার যে গভীর শোকাবেগ প্রেরণা রূপে লক্ষ্য করা যায় তাহা কোথাও উদ্দাম বা অশান্ত হইয়া উঠে নাই। করুণরসেরও এই প্রশান্ত কাব্য-শ্রীই তাঁহার রচনার বিশেষত্ব।

ভাব-পতঙ্গ [১০২]—চঞ্চল ভাবরাজি কোন একটী সূত্রকে অবলম্বন করিয়া দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মনের হয় ভাব হইতে ভাবান্তরে অত্যন্ত দ্রুত গতি। নানারূপের নানা ভাব, যেন গবাক্ষ-পথে চঞ্চল-পক্ষ অসংখ্য পতঙ্গের মত। অত্যন্ত চঞ্চল বলিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া রাখা যায় না। সহজ অর্থ হতেছে এই, ভাব দানা বাঁধিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে।

নাহি ভয়······(১৪) ভাব-পতঙ্গের আকর্ষণ-বহ্নি যদি মনোবাতায়ন-তলে প্রকৃতই থাকে তবে, তাহার দীপ্তি থাকিলেও জ্বালা নাই; সুতরাং পতঙ্গের দগ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই—কবি ইহাই বলিতেছেন।

শশাঙ্কমোহন সেন—কবির নিবাস চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামে। জন্ম ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। চট্টগ্রামে ওকালতী ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক-পদে বৃত হইতে হয়;

কারণ, গুণগ্রাহী পুণ্যশ্লোক সার আশুতোষ তাঁহার সমালোচনা-দক্ষতা ও সাহিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদে-প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সমালোচনা-গ্রন্থ 'বঙ্গবাণী', 'বাণীমন্দির' ও 'মধুসূদন' প্রসিদ্ধ। কাব্যগ্রন্থ শৈলসঙ্গীত ও সিন্ধুসঙ্গীত রচনা করিয়া তিনি কবিকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বিশ্বব্যাপ্তি [১০৩]—জীবনের এমন একটী শুভ-মুহূর্ত্ত আসে যখন মানুষের অন্তরের সেই আদিম চিরন্তর 'আমি' সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভাঙ্গিয়া, বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়া, তাহার আত্ম-প্রসারের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে চায়। ইহাই 'আমি'র আপনার সীমালঙ্ঘন। সবিতা—সূর্য্য।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়—নদীয়া জেলার খাস শান্তিপুরে কবির জন্ম হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। বিহারী-রবীন্দ্র-দেবেন্দ্র-ভক্ত কবি করুণানিধান, তাঁহাদেরই ভাব-শিষ্য। তিনি বিহারীলাল ও দেবেন্দ্রনাথের মতই সৌন্দর্য্য-পূজারী। তাঁহার এই সৌন্দর্য্যপূজায় কোনপ্রকার কৃচ্ছ্র সাধনা নাই; ইহা যেন তাঁহার অন্তরের স্বভাবধর্ম্ম। সৌন্দর্য্যপূজায় তাঁহার এই সহজিয়া-প্রেমই তাঁহার কবি-মানসের বিশেষত্ব। খাস-শান্তিপুরের কবি বলিয়া তাঁহার রচনার দুইটী বহিরঙ্গ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়—(১) ভাষারূপের স্নিগ্ধ লালিত্য ও (২) শব্দ-চয়নে একপ্রকার অশিক্ষিত পটুত্ব। কবির রচিত কাব্যগ্রন্থ—প্রসাদী, ঝরাফুল, ধানদুর্ব্বা ও শান্তিজল। 'শতনরী' নামে কবির একটী উপাদেয় কবিতা সংগ্রহ গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে।

জীবন-ভিক্ষা [১০৪]—গোতমী ছিলেন বুদ্ধদেবের ভগিনী, অবশ্য সহোদরা নহেন। তাঁহার তনুদেহের সৌন্দর্য্যের জন্য তাঁহার নাম ছিল কিসা গোতমী (কৃশা গোতমী)। সন্তানের সদ্যোমৃত্যুতে বেদনাহত কিসা গোতমী বুদ্ধের নিকট জীবন-ভিক্ষা করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব কৌশলে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, মৃত্যু জীবনের অনিবার্য্য পরিণাম এবং ইহা হইতে অব্যাহতি লাভের কাহারো কোন উপায় নাই। এই বৃত্তান্তই কবিতাটীতে বিবৃত হইয়াছে।

যাত্রা করেছ……(৩৫—৩৬)—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

ত্রিতাপ—অধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ বা দুঃখ। এই প্রসঙ্গে (৫১) কবিতার টীকা দেখ। কবিতাটীর আদ্যন্ত কবির শব্দচয়ণ-কৌশল লক্ষ্য করিয়া যাইবে। আমি তোমাদিগকে কয়েকটী দেখাইয়া দিতেছি—মরণ-শ্যেনের পক্ষ (৮) রসনা-প্রসূন (১১) অমরা-মাধুরী (১৭) দন্ত-রুচি (১৯)।

আজ্‌কে রে মন ঘোম্‌টা খোল [১০৫]—কবির রূপ-পিপাসা সম্বন্ধে কবি-পরিচয় দ্রষ্টব্য। সমস্ত কবিতাটী একখানি শব্দ-চিত্র, সেই চিত্র আবার সঙ্গীত-ঝঙ্কারে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। রচনার এই সঙ্গীত-প্রাণতার সৃষ্টি করিয়াছে এই কবিতার বিশিষ্ট ছন্দ। এই ছন্দ এখানে কোন প্রকার বহিরঙ্গ বস্তু নয়, ইহা কবির বাণীরই অপরিহার্য্য অংশ। করুণানিধানের কবিতায় ভাব ও ছন্দের এই প্রকার একটা অদ্বৈত-বিগ্রহ দেখা যায়।

অ্যাম্বারেরি রঙ্‌গোলা—Amber—তৃণ-মণি তাহা নির্ম্মল ও পিঙ্গলবর্ণ।

যতীন্দ্রমোহন বাগ চী—নদীয়া জেলার জামসেরপুরের জমিদার বংশে যতীন্দ্র-মোহন বাগ্‌চীর জন্ম হয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অবিশ্রান্ত কবিতা-রচনা চলিয়াছে। বহু কাব্যগ্রন্থের তিনি রচয়িতা: তন্মধ্যে রেখা, লেখা, অপরাজিতা, জাগরণী, নীহারিকা, মহাভারতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। মানসী ও যমুনা নামে দুইখানা পত্রিকার তিনি সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-যুগের রবীন্দ্র-শিষ্যদিগের তিনি অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-কল্পনা অনেক সময় তাঁহার মর্ম্মমূলে বসিয়া প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। কখনও কখনও তিনি রবীন্দ্র-সূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তথাপি যতীন্দ্রমোহনের স্বকীয় প্রকাশ-ভঙ্গিমা আছে, তাঁহার দৃষ্টিরও একটা বিশেষ রসরূপ আছে। যতীন্দ্রমোহনের ভাষা-বন্ধনে কবিজনোচিত দক্ষতা আছে। কবিতার ভাষা যে আটপৌরে ভাষা নয়, একটা বিশিষ্ট ও বিলক্ষণ ভাষা, তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে সে-পরিচয় লাভ করা যায়।

চিরনবীনতা [১০৬]—কালের অধীশ্বর মহাকাল রুদ্ররূপে সমস্ত সংহার করেন। চৈত্রের রিক্তশস্য ধরণীতেই তাঁহার সংহার-লীলা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। সমস্ত বৎসর একটী ফুল্লকুসুমের মত; বার মাস তাহার নানা দল। চৈত্র তাহার জীর্ণ দল; তাহাও খসিয়া ঝরিয়া পড়িল। কবির মানস-মালঞ্চেও কত ফুল ফুটিয়াছিল। তিনি সেই ফুলে কত মালা গাঁথিয়াছিলেন। সেই মালাও আজ জীর্ণ ও ভ্রষ্টকুসুম হইয়া সূত্রাবশেষ হইয়াছে। শুধু স্মৃতিটুকু সেই মালার সূত্র হইয়া রহিয়াছে। কবির মানস-মালঞ্চও রিক্তশস্য ধরণীর মত শূন্য হইয়া উঠিয়াছে তাই বাসনার শূন্যতীরে বসিয়া নয়নজলে অপূর্ণ আশার প্রেত-তর্পণ করিতে হইতেছে। তাহা হইলে, সংসারই কি জগতের চরম সত্য? শূন্যতাই কি পূর্ণতার পরিণাম? না, তাহা নয়। চৈত্রের শেষে নবীন বৈশাখ আসে। শূন্যতা আবার পূর্ণতায় ভরিয়া যায়। সূত্রশেষ মালিকা আবার নূতন বর্ণ গন্ধের ফুলে নয়নাভিরাম হইয়া উঠে। ইহাই বাহিরের জগৎ ও মানস-জগতের চির নবীনতা।

আমার স্বর্গপুরী [১০৭]—যতীন্দ্রমোহনের একপ্রকার সূক্ষ্ম কবিদৃষ্টি আছে। তাঁহার সেই দৃষ্টি বস্তুজগতের তুচ্ছ স্থূলমূর্ত্তি অতিক্রম করিয়া একেবারে তাহার রসরূপ আবিষ্কার করিয়া ফেলে। আমাদের নীরসদৃষ্টি ও বেদনা-হীন হৃদয়ের কাছে যাহা সামান্য এবং প্রায়শঃই দৃষ্টি-অগোচর হইয়া থাকে, কবির দৃষ্টির বিচিত্র রশ্মি-সম্পাতে তাহাই অসামান্য ও অভিরাম হইয়া ধরা দেয়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—জ্ঞান তপস্বী অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। জন্ম হয় কলিকাতার সন্নিকটে মাতুলালয় নিমতা গ্রামে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। কিশোর বয়স হইতেই তিনি কবিতা-রচনা ও কবিতার অনুবাদে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁহার রচিত বহু কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে 'কুহু ও কেকা,' বেণু ও বীণা, হোম শিখা, তীর্থসলিল, অভ্র-আবীর

প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ। সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশ-প্রেম ছিল প্রবল। স্বদেশের সমস্ত ঘটনা তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিত। তাঁহার স্থির-গম্ভীর হৃদয়ে ঘটনার প্রবাহ আসিয়া পড়িলেই একটা মানস-তরঙ্গের সৃষ্টি হইত। তাহারই অভিব্যক্তি জীবনী ও ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার বিবিধ কবিতাবলী। কবির দক্ষতা শুধু মৌলিক রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অনুবাদ-ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই অনুবাদে তাঁহার বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি যে শুধু মুল কবিতার ভাববস্তুকে বাঙ্গালায় রূপ দিয়াছেন তাহা নয়, মূলের ছন্দ-সঙ্গীতটুকু পর্যান্ত অবিকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। এমনই করিয়া সংস্কৃতের কত মালিনী মন্দাক্রান্তা ছন্দ, কত ফার্সী ও ইংরেজীছন্দ, কবি তাঁহার কবিতায় অবতারিত করিয়াছেন। ছন্দের এই যাদুশক্তি লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাটি [১০৮]—আধুনিক বৈজ্ঞানিক-যুগের পূর্ব্বে এই প্রকারের কবিতা-রচনা অসম্ভব ছিল। নীরস বিজ্ঞানের শুষ্ক তথ্য-মাত্রকে কবি তাঁহার প্রতিভার মায়া-শক্তিতে মধুর রস-সত্যে পরিণত করিয়াছেন। এই শ্রেণীর রচনায় ইহাও প্রমাণিত হয়, সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা দুর্ব্বল ভাব-বিলাস মাত্র ছিল না। জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিষ্ঠায় তিনি তাঁহার জ্ঞানতপস্বী পিতামহের যোগ্য বংশধর ছিলেন।

তারার হাটে........(৪) অনন্ত শূন্যে এই পৃথিবী; তাহার চারিদিকে কত অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র। বিরাট্ জ্যোতিষ্কসমাজে এই ক্ষুদ্র মাটির পৃথিবীকে কবি বলিতেছেন "মাটির ভাঁটা"।

তড়িৎ সূতার···(১২) পৃথিবী শূন্যলোকে লাটাইয়ের মত প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছে এবং শূন্য হইতে তড়িৎ আকর্ষণ করিয়া লইতেছে।

গ্রীষ্ম [১০৯]—গ্রীষ্ম-বর্ণনার কেমন উৎকৃষ্ট একটি কবিতা। গ্রীষ্মের বহ্নি-রূপ আশ্রয় করিয়া কবির যে কল্পনা-প্রকাশ হইয়াছে তাহা একটা বিশিষ্ট স্বাদ-গন্ধময়, যাহাকে প্রাচীন স্বাদ-গন্ধ (classical flavour) বলা চলে; ভাষাও তাহারই উপযোগী। কবিতাটির আর একটি বিশেষ রূপ (form) আছে। তাহা এই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের অদ্ভুত

স্তবক-নির্ম্মাণে অভিব্যক্ত হইয়াছে। স্তবক (stanza) যেমন হ্রস্ব হইতে ক্রমশঃ দীর্ঘয়ত হইয়া আবার হ্রস্বতায় মিলাইয়া গিয়াছে সেই খাতে-ঢালা ধ্বনি-প্রবাহও তরঙ্গ তুলিয়া দীর্ঘতর হইয়া আবার নামিয়া আসিতেছে।

একচক্র রথের ঠাকুর (১৭) সপ্ত অশ্বে (২০) সূর্য্যদেব সপ্তাশ্বযুক্ত রথে ভ্রমণ করেন—ইহাই পৌরাণিক কাহিনী। ময়ূরের বর্হসম ময়ূখের মালা (৩০) এই বাক্যাংশটীর সঙ্গীত-সৌন্দর্য্য লক্ষ্য কর।

ফুলশির্ণি [১১০]—মুস্‌লিম্ সাহিত্যিকগণের অভিনন্দন ও অভ্যর্থনার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ একটি সভার আয়োজন করে। কোজাগরী পূর্ণিমায় সেই সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেই মিলন-মহোৎসবে কবি এই কবিতাটী পাঠ, করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশ হিন্দু ও মুস্‌লিম এই দুইটী বিরাট সভ্যতার মিলনক্ষেত্র। দুইটী পৃথক্ সংস্কৃতি মিশিয়া গিয়া বাঙ্গালাদেশে এক হইয়া যাহা হইয়াছে তাহার নাম বাঙ্গালার সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সত্য-পীরই বাঙ্গালার প্রকৃত দেবতা। সেই দেবতার ইঙ্গিতে কবি পাত্র-ভরিয়া শির্ণি আনিয়াছেন—তাহা ফুল-শির্ণি।

ছিন্নমুকুল [১১১]—কবিতাটীর মধ্যে একটি বিষাদকরুণ সুর বাজিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশু জীবদ্দশায় সামান্য একটু স্থান জুড়িয়া থাকিত; কারণ তাহার ছিল ক্ষুদ্র দেহ ক্ষুদ্র খেলনা, ক্ষুদ্র বসন। কিন্তু মৃত্যুর পরে দেখা গেল, তাহার অভাব কত বৃহৎ স্থান শূন্য করিয়া দিয়াছে! ইহাই এই কবিতার মর্ম্মার্থ।

“ছোট্টো যেজন ছিলরে সব চেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য করে!”

কুমুদরঞ্জন মল্লিক—১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার কোগ্রাম উজানিতে কবি জন্মগ্রহণ করেন। মাথরুন হাইস্কুল হইতে প্রধানশিক্ষকরূপে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি অজয়নদের তীরে এই কোগ্রাম উজানিতেই সাধকের মত জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার অবিশ্রান্ত রচনায় একটী বিষয় সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে, তাহা তাঁহার ভাব-সাধনার

প্রীতি বিহ্বল রূপ। বৈষ্ণবভাব ও বৈষ্ণবোচিত বিনয়, এবং খাঁটি বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তি তাঁহার অধিকাংশ রচনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রহিয়াছে। ভগবৎপ্রীতির বীজ বংশাগত শোণিতধারায় বহিয়া আসিয়া তাঁহার মানস-প্রকৃতির মধ্যে নিহিত হইয়া আছে। ইঁহার রচিত কাব্য-নিচয়ের মধ্যে অজয়, উজানি, একতারা, নূপুর, বনতুলসী প্রভৃতিই সাহিত্যসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

দেয়ালী [১১২]—কবিতার আকারে একটি ছোট গল্প। অবসানে একটি আকস্মিক বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পল্লীরাণী [১১৩]—এই কবিতাটিতে কুমুদরঞ্জনের কবি-মানসের একটি বিশিষ্ট দিক্ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বৈষ্ণবভাব-বিভোরতা তাঁহার কাব্যের এক দিক্। কবির রচনায় আর একদিকে দেখা যায় পল্লী-প্রীতি। এই পল্লী-প্রীতি ভক্তিরসে সিক্ত বলিয়া তাহা আবেগ-গভীর হইয়া উঠে, কোনপ্রকার চঞ্চলতা থাকে না।

স্নেহের দাগ [১১৪]—কবিতাটির মধ্যে কবি মানুষের অর্থহীন নামের একটা অর্থপূর্ণ ভাব বিশ্লেষণ করিতেছেন। সুতরাং ইংরেজীতে যাহাকে Paradox বলে, কবিতাটি আগাগোড়া তাহাই। আপাততঃ যে নাম অসম্ভব ও অসদৃশ বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহাতে সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর একটা উৎকট ও অদ্ভুত বিরোধ ভাসিয়া উঠিতেছে তাহার সম্বন্ধে একটু নিবিষ্ট হইয়া ভাবিয়া দেখিলেই তাহার সমস্ত অর্থ ধরা পড়িয়া যায়।

অতুলপ্রসাদ সেন—১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়। তিনি কর্ম্মজীবনে ছিলেন প্রসিদ্ধ একজন ব্যারিষ্টার। তাঁহার দেশহিতৈষিতা তাঁহাকে বরেণ্য করিয়াছে। অতুলপ্রসাদ সঙ্গীত-কেন্দ্র লক্ষ্ণৌ সহরে বাস করিয়া শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজী সঙ্গীত-পরিভাষায় যাহাকে composer বা সুরস্রষ্টা বলে তিনি শুধু তাহাই ছিলেন না; তিনি ছিলেন স্বয়ংসিদ্ধ একজন কবি। তাঁহার প্রতিভা যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সঙ্গীত ও কবিত্বের স্বপ্নলোকে বসিয়া। ইহাই অতুলপ্রসাদের সত্যকারের পরিচয়।

আশা [১১৫]—অতুলপ্রসাদের একটি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত। ইহার সহিত (৭৫) কবিতাটি তুলনা করা যাইতে পারে। ইহা "ত্রিশকোটি ভারতবাসীর" সঞ্জীবন মন্ত্র। অতীত গৌরবের প্রতি কবির ভক্তি-রস অভিনব মহনীয়তায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভারত-ভানু [১১৬]—পূর্ব্বের কবিতাটির সঙ্গে সমশ্রেণী। অতীত গৌরব-বর্ণনা অনেকটা একই ভাষায় হইয়াছে। কিন্তু মূল সুরে বিভিন্নতা রহিয়াছে। পূর্ব্বের কবিতাতে আশায় আনন্দ, এখানে নৈরাশ্যে দুঃখ।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—জন্ম ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। বাসস্থান শান্তিপুরের সন্নিকটে হরিপুর গ্রাম। ইনি বি. ই. পাশ ইঞ্জিনিয়ার। বর্ত্তমানে কাশিমবাজার ষ্টেটে কর্ম্ম-নিযুক্ত আছেন। কবির রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি—মরীচিকা, মরুমায়া, মরুশিখা, সায়ম্ এবং অনুবাদগ্রন্থ কুমারসম্ভব। লোহা ও বিবিধ যন্ত্রপাতি লইয়া যাঁহার কারবার এবং কর্ম্মজীবনে যাঁহার চিন্তা গাণিতিক রেখা অতিক্রম করিতে পারে না, সেই কঠিন-কর্ম্মা মানুষটার মধ্যে কেমন করিয়া এত বড় কবি পুরুষ নির্ব্বিবাদে বাস করিতে পারে তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেক সময় এই প্রকার কঠিন কর্ম্মার যন্ত্রপাতি তাঁহার রস-রচনার আলম্বনবস্তু হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথ আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবিদিগের অন্যতম। কল্পনার মহনীয়তায় তাঁহার স্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এইখানেই যতীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। যাহা তুচ্ছ ও সামান্য তাহাও অনেক সময় কবির কল্পনায় মহিমময় (Sublime) হইয়া উঠে।

চাষীর দুঃখ [১১৭]—এই দুঃখবাদ কবির একটি বিশেষত্ব; কিন্তু কবি স্বয়ং বলিয়াছেন, তাঁহার পারিবারিক জীবনের সঙ্গে এই দুঃখবাদের কোন সম্বন্ধ নাই। এই কবিতায় কবি আগাগোড়া যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা লক্ষণীয়। এ ভাষা—চাষীরই ভাষা বিশেষভাবে এই শব্দ ও বাক্যাংশগুলি লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝিবে—বেগার ধরে'ছে (১) শেষ জোয়ে'তে রুইব (৭) সবুজ যেন টিয়ে পাখীর পাখা (১১) পাটের ডগা লকলকিয়ে উঠে (১২) উপর-ঝরণ (১৯) মোড়লের ঝি (২১) পচা খড়ের গুঁজি (২৯)।

হাট [১১৮]—যতীন্দ্রনাথের সামান্য হইতে অসামান্যে যাত্রার বিশেষত্বটী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি-পরিচয় দ্রষ্টব্য। কবিতাটীর মধ্যে একটা বিষাদ-বৈরাগ্যের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। ইহা শুধু ঐহিক জীবন-ছবি নয়; ইহাতে এমন একটী ভাবের আবেদন আছে যাহাকে বলিতে পারি পারত্রিকভাবে (other worldliness.)

মোহিতলাল মজুমদার—১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে কবির জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে তিনি প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতার নিকটে একটী পল্লীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহের নাম—'স্বপন-পসারী', 'বিস্মরণী', 'স্মর-গরল' ও 'হেমন্ত-গোধূলি'। কবি মোহিতলালের কবিতায় ভাব-তন্ময়তা আছে, কিন্তু দুর্ব্বল ভাবাতিরেক নাই। তাঁহার ভাষা গুরু-গম্ভীর, কিন্তু কোথাও অনাবশ্যকরূপে নয়। ভাব ও ভাষার এক অদ্বৈতমূর্ত্তি তাঁহার কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাষা তাঁহার কবিতার বহিরঙ্গ রূপমাত্র নয়; তাঁহার ভাবেরই প্রাণ-শক্তি। ভাব ও ভাষার এই গুরুগাম্ভীর্য্যের জন্য তাঁহার কাব্যগুলি বিশেষ এক শ্রেণীর রসজ্ঞ-সমাজে সমাদৃত হইয়া থাকে। মোহিতলালের কবিজীবন হেমন্ত গোধূলিতে বিশ্রাম করিতেছে। সমালোচক মোহিতলাল এখনও মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত সূর্য্য। সে সূর্য্যের কিরণমালা বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশের সাধনার রহস্য-বিন্দুতে অধিশ্রয়িত (focused) হইয়াছে। এ সাধনা তন্ত্র-সাধনা। 'মোহমুদ্গরে'র কবির এই অভিনব সমালোচকরূপ কৌতুকাবহ হইলেও বিস্ময়কর নহে।

বঙ্গলক্ষ্মী [১১৯]—সম্পদ্ সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের যিনি অধিষ্ঠাত্রী সেই শক্তিই লক্ষ্মী। সমস্ত বাঙ্গলা দেশে একদা তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পূজা তখন সার্থক ছিল। বর্ত্তমানে লক্ষ্মীহীন বাঙ্গালায় তাঁহার পূজার আয়োজন প্রাণহীন অনুষ্ঠানমাত্র।

কবিতাটীতে দুইটী Sonnet একত্র গ্রথিত হইয়াছে। চরণশেষের মিলগুলি লক্ষ্য করিয়া দেখিবে। উৎকৃষ্ট Sonnetএর লক্ষণগুলি এই দুইটী কবিতাতে আছে। এই প্রসঙ্গে (৪৩) এবং (১৫১) কবিতার টীকা দেখ।

রবীন্দ্রবরণ [১২০]—গীতি-সুরই বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের প্রকৃত সুর। সেই সুরের জাহ্নবী জয়দেব হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার মায়াশক্তিতে সেই প্রবাহিনী কি অভিনব রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারই এক বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি কবি এখানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

এ জীবনে এত শোভা······(৯—১০) সৌন্দর্য্য প্রবাহিণীর রূপমুগ্ধ কবির উচ্ছ্বাস। Johan Bojer এর কয়েকটী কথা মনে পড়ে—"Marvellous art thou! O Spirit of Man! In the midst of thy thraldom thou hast created the beeutiful!"

The great Hunger (translation from the Norwegian)

প্রমথনাথ চৌধুরী—জন্ম-সাল ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ। ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের অন্তর্গত সন্তোষগ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার। জাতীয় সঙ্গীত রচনায় তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া জাতীয় কবির সম্মান ও গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে গীতিকা, গৈরিক, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

বেলা যায় [১২১]—কোথা গেল রবি······৩৪—৪২ 'বেলা যায়' কথা দুইটী লালাবাবুর বিশেষ একটি মনোভাবের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। সেই জন্য তাঁহার চক্ষের সম্মুখে শুধু সেই খণ্ডদৃশ্যগুলি উপস্থিত হইয়াছে যেগুলি তাঁহার বৈরাগ্য ও বিষাদ-ময় মনোভাবের অনুকূল। ইহাকেই বলে মনোময় দর্শন।

কালিদাস রায়—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি ও সাধক লোচন দাসের বংশে কালিদাস রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে, বর্দ্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে। ইঁহার উপাধি "কবিশেখর"। অজস্র কবিতায় কবিশেখরের বহুমুখীন কাব্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবভাবের উপর নব আলোক-পাত করা তাঁহার একটী বিশেষত্ব। পল্লীপ্রীতিসিক্ত কবির পল্লীকবিতাগুলি এক স্বপ্নময় বাস্তবমূর্ত্তি ধারণ করে। পৌরাণিক চরিত্র-সৃষ্টিতে তাঁহার ভাব ব্যক্তি হইতে যাত্রা করিয়া নৈর্ব্যক্তিক ও বিশ্বজনীন তত্ত্ব হইয়া উঠে। তাঁহার রচিত গ্রন্থ বহু; তন্মধ্যে কুন্দ, কিশলয়, পর্ণপুট, বল্লরী, ব্রজবেণু, লাজাঞ্জলি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

অবতরণিকা

লালাবাবুর দীক্ষা—[১২২]—পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতাটীর সঙ্গে পাঠ করিলেই অর্থ সুগম হইবে।

প্রকৃত লক্ষণ [১২৩]—এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র কবিতাতে আমরা আমাদের অভিজ্ঞাত ভাব ও বস্তুগুলিকে রসরূপে আবার ফিরিয়া পাই। তাহাতে রসানুভূতি ও সত্যদর্শন উভয়ই হইয়া থাকে। ইহাতে বিশেষ এক প্রকারের আনন্দ লাভ হয়। ইংরেজীতে যাহাকে Epigram জাতীয় কবিতা বলে ইহা তাহাই। কবিতাটী তাহার ক্ষুদ্র অবয়ব লইয়া ভাব-রসে ঢলমল করিতেছে।

বৈশ্বানর [১২৪]—কবিশেখরের একটী উৎকৃষ্ট কবিতা। ইহা তাঁহার বিশেষত্বের একটী দিগদর্শন করাইতেছে। পূর্ব্বের কবিতা দুইটীর ভাষা হইতে এই ভাষা কত গুরুগম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে তাহা লক্ষ্য কর। এইজন্য কবিতার ভাষা শুধু ভাষামাত্র নয়, তাহা ভাবের বাঙ্ময় রূপ। কবিতাটীর মধ্যে একটী বৈদিক স্বাদ-গন্ধ আছে ; অবশ্য খেয়ালী পাঠকের কাছে তাহা দুষ্পাচ্য।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। 'অগ্নি-বীণার' বিদ্রোহী কবিরূপে নিতান্ত অপরিণত বয়সে তিনি একদা সমগ্র বাঙ্গালায় কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বিগত মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী পল্টনে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। কবি যোদ্ধার দুই একটী কবিতার রূপে রণসজ্জা ও ছন্দ-সঙ্গীতে দামামা নির্ঘোষের ভীমকান্ত ধ্বনি আছে। নজরুলের কাব্য-সাধনার আদর্শ নবীন বঙ্গের কত মুসলিম যুবমনে কবিত্বের প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বিদ্রোহী নজরুলের একটী আকাঙ্ক্ষা তাঁহার কাব্যদেহে বিশেষ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহা সকলপ্রকার অন্ধ-সংস্কার ও আচার হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা। তাঁহার ভাব, সর্ব্বদা আত্মকেন্দ্রিক। কবির 'আমি' বিশ্বব্যাপী, দুর্জ্জয় ও দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া কবি অনুভব করেন। কবি বহু গান রচনা করিয়াছেন এবং নিজে সুকণ্ঠ গায়ক বলিয়া, সেইসব গান

গাহিয়া তিনি এমন বিশিষ্ট সুরের সন্ধান দিয়াছেন যাহাতে তাহাদের প্রাণ মাধুর্য্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। বহু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে তাঁহার অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী দোলনচাঁপা সিন্ধু-হিল্লোল, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

কেয়ামত রাত্রি [১২৫]—কবিতাটীর মধ্যে একটী আশ্চর্য্য ছন্দোনৈপুণ্য আছে।

ধ্বনিল কে বিষাণে…(৩) মহাপ্রলয়দিবসে ইস্রাফিলের বিষাণ-ধ্বনি। কেয়ামত—রোজ কেয়ামত—শেষ বিচারের দিন। কাণ্ডারী আহ্‌মদ—হজরত মোহম্মদ তরীর কর্ণধার। আবুবকর…(২১) খলিফা চতুষ্টয়।

বাদল দিনে [১২৬]—বর্ষাপ্রকৃতিসম্বন্ধে কবিতা ইতিপূর্ব্বেও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই কবিতাটী ভিন্ন প্রকারের। এখানে বর্ষাপ্রকৃতির দেহরূপ হইতে ভাব-রূপই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

যার শীতল হাতের……(৯—১২) একই শীতলস্পর্শে তিনটি বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া হইতেছে। কি তীব্র ঐন্দ্রিয়ক ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে তাহা লক্ষণীয়।

সত্যেন্দ্র-স্মরণে [১২৭]—মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। সেই অকালমরণ স্মরণ করিয়া কবি আবেগময় ভাষায় যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কিন্তু কবিতার বিষাদ-সমাপ্তি হয় নাই; সত্যেন্দ্রাথ অসমাপ্ত গান গাহিয়াই চলিয়া গিয়াছেন কারণ—

> "পুনঃ নব-বীণা করে আসিবে বলিয়া
> এই শ্যাম তরুমূলে।
> ওগো এই গঙ্গার কূলে॥"

গোলাম মোস্তাফা—কবির জন্ম হয় ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে, যশোহর জেলার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রামে। মধ্যে বয়সের এই কবি অদ্যাপি তাঁহার কবিতা-দানে বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্য সমৃদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার কবিতার ভাষা শ্রুতিমধুর ও ভাব আবেগময়। ছন্দোবৈচিত্র্যে তাঁহার কবিতা মোহনমূর্ত্তি ধারণ করে। বাঙ্গালা কবিতায় নূতন নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তিত করা এই কবির একটা সুচারু খেয়াল। তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলী—সাহারা, রক্তরাগ, রূপের নেশা, জয়পরাজয়, ভাঙাবুক, হাস্নাহানা প্রভৃতি।

হাজী মহম্মদ্ মহসীন [১২৮]—মহাপুরুষের আদর্শ যতদিন পৃথিবীতে থাকে ততদিন তাঁহারা বাঁচিয়া থাকেন। দেহ তাঁহাদের নশ্বর; কিন্তু তাঁহাদের ভাবরূপ চিরন্তন।

জসীম উদ্দীন—জন্ম ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরের অন্তর্গত তাম্বুলখানা নামক গ্রামে। একটী বিশিষ্ট ভাবসাধকরূপে বাঙ্গালা-সাহিত্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আধুনিক সভ্যতা ও নাগরিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে বাস করিয়াও কবি আজেশবরের মত তাঁহার ভাবনাকল্পনাকে তাহা হইতে মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। গ্রাম্যভাব, চাষীর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা তাঁহার কবিসৃষ্টির প্রেরণামূলে রহিয়াছে; উহাই তাঁহার প্রতিভার "সঞ্জীবনী অমৃত বল্লরী।" অনেক কবির পল্লী-জীবনের প্রতি প্রীতি আছে, কিন্তু জসীম্ উদ্দীনের আছে উহার প্রতি একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাবোধের গুণেই তাঁহার কল্পনা প্রাণময় হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছে। ইঁহার "নক্সী কাঁথার মাঠ" কাব-খানা ইংরেজীতে"The field of the Embroidered Quilt" নামে অনুবাদিত হইয়াছে। কবি যে কয়খানা কাব্য প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাদের নাম—রাখালী, বালুচর, ধানখেত, রঙিলা নায়ের মাঝি, নক্সী কাঁথার মাঠ, সোজন বাদিয়ার ঘাট।

কবর [১২৯]—মনীষী কবি Wordsworth বলিয়াছেন "Men who do not wear fine clothes can feel deeply", এই মহাসত্যের আলোক ফেলিয়া কবিতাটী পাঠ করিলে ইহার মর্ম্ম বুঝা যাইবে। ভাষা অলঙ্কৃত না হইয়াও যে গভীর ভাব-দ্যোতক হইতে পারে তাহার পরিচয় আছে এই কবিতায়। এই ভাষা নিজেকে প্রকাশ করিতে কোন প্রকার ছলা-কলা আশ্রয় করে নাই। গভীর অনুভূতির কক্ষ হইতে কথাগুলি উৎসারিত হইয়াছে বলিয়াই তাহা এত প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। এই একটীমাত্র কবিতাই তাঁহাকে কবিখ্যাতি দিতে পারিত। এখানে বর্ণনীয় বিষয় মানবজীবনের সেই সনাতন দুঃখ—যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না।

পুত্রস্নেহ [১৩০]—পূর্ব্ববর্ত্তী কবিতার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ঘরের চালাতে (৫৩—৬০) ইহা ছায়া পূর্ব্বগামিনী নয়। শঙ্কাতুরা মাতার কল্পনামাত্র। এই কল্পনার মূলে আছে তাঁহার সেই ক্ষণের বিষাদময় মনোভাব। তাহারই ছায়া ফেলিয়া তিনি সব কিছু দেখিতেছেন। দ্রষ্টব্য (১২১) কবিতার আলোচনা। (৬১—৬২ কবির সাঙ্কেতিক (Symbolic) রচনাভঙ্গী লক্ষণীয়। বাতাসে নিবু নিবু প্রদীপের শূন্যায়মান তৈল বালকের নিঃশেষপ্রায় আয়ু এবং জননীর ক্ষীণ আশার সূচনা করিতেছে।

ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী—ভুজঙ্গধর একজন আধুনিক কালের জনপ্রিয় কবি ছিলেন। মাসিক পত্রিকাগুলির পাঠকের দৃষ্টি-সম্মুখে তিনি নিরন্তর বর্ত্তমান থাকিতেন। ইংরেজী-শিক্ষিত আধুনিক কবির অনেক সময় যাহা দেখা যায় ভুজঙ্গধরের মধ্যেও তাহা দেখা যাইতেছিল। প্রসিদ্ধ বৈদেশিক কবিদিগের কল্পনামিশ্রণে তাঁহার কবি-মানস এক অপূর্ব্ব রস-সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে। উপাদান অনেক সময় বিদেশীয় হইলেও তিনি যাহা পরিবেশন করিয়াছেন সেই রস কখনও বিজাতীয় বলিয়া মনে হয় না। তাহাতে উৎকট বা ক্ষার-কটু স্বাদ নাই, তাহা স্নিগ্ধ-মধুর স্বাদ-গন্ধময়।

কোকিলের প্রতি [১৩১]—কবিতাটী Shelleyর "To a Skylark" এবং Wordsworth এর "To the Cuckoo" এই দুইটী কবিতার একপ্রকার রাসায়নিক নির্য্যাস। কল্পনায় কিছু স্বকীয়তাও আছে। প্রকাশভঙ্গিমা কবির নিজস্ব, শব্দগঠন তাঁহার কবি-প্রতিভা-ব্যঞ্জক।

নবীন অতিথি—'blithe new comer—Wordsworth। সঞ্চারিণী শরীরিণী গীতি—Wordsworth যাহাকে বলিয়াছেন Wandering voice এবং Shelleyর ভাষায় যাহা a rain of melody.

পুষ্প শয্যা 'পরে······Wordsworth এর To the Cuckoo কবিতার অনুরূপ পরিস্থিতি 'while I am lying on the grass'. কল্পনার গতিও একপ্রকার, পৃথিবীকে মনে হয় "অনন্তসৌন্দর্য্যময়ী, কায়াহীন আনন্দ-নিলয় "Wordsworth এর কল্পনায় যাহাকে মনে হইতেছিল An unsubstantial fairy place."

সালেমা খাতুন—বাঙ্গালা সাহিত্যের কাব্য-গীতির আসরে কয়েকজন মুসলিম মহিলাও যোগদান করিয়াছেন। সালেমা খাতুন তাঁহাদের অন্যতমা। বিবিধ মাসিক পত্রিকায় তাঁহার কবিতা দৃষ্টিগোচর হয়।

নববসন্ত [১৩২]—ছন্দের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব সঙ্গীত-প্রাণতা আছে। মনে হয়, কবির ভাব ও চিত্র হইতে সুরই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

শেখ ফজলল্ করিম—ইঁহার কবি-খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দীর্ঘদিন তিনি নানা মাসিকপত্রে কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার রচনাতে সাবলীল ভাষায় একটা অনায়াস ভঙ্গিমা ফুটিয়া উঠে। ইনি প্রকৃতই একজন শক্তিশালী মুস্লিম কবি।

পান্থশালা [১৩৩]—ইহাও কবিতার আকারে ছোট গল্প। [১১২] কবিতার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

স্বর্গ ও নরক [১৩৪]—ক্ষুদ্রাবয়ব হইলেও ভাব-রসে উজ্জ্বল একটি কবিতা। কবিতায় বলা হইতেছে, আনন্দই স্বর্গ-সুখ। আত্মগ্লানিই নরক-দুঃখ। স্বর্গ-নরক নামে কল্পিত স্থূল স্থান দুইটা কায়াহীন ভাবরূপে কবির কল্পনায় উপস্থিত হইয়াছে।

সৈয়দ এমদাদ আলী—কবির বাসস্থান ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত খিলগাঁও। ইনি পুলিশ বিভাগের ইন্স্পেক্টরের গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও সাহিত্য-সাধনায় আজীবন নিরত আছেন ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। একদা তিনি 'নবনূর' নামক একখানি অধুনা লুপ্ত মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার 'ডালি' কাব্যগ্রন্থ সুধী-সমাজে আদৃত হইয়াছে।

খোদেজা বিবির প্রতি [১৩৫]—হজরত-জায়া খোদেজা বিবি মুস্লিম নারীর সমস্ত কামনার আদর্শ।

ঈদ [১৩৬]—ভাব দুর্ব্বোধ নয়। কবি বিগত-বৈভব মুস্লিম জাতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার স্বপ্নে বিভোর হইয়াছেন। কত নিদ্রিত জাতি আবার

জাগিয়াছে। কিন্তু মুস্‌লিম জাতি! "সে কি জাগিবে না, সে কি হাসিবে না?" মনীষী Carlyle বলিয়াছেন "Man is a glorious possibility" যাহা ব্যক্তি সম্বন্ধে সত্য তাহা ব্যক্তি সমষ্টি জাতি সম্বন্ধেও সত্য হইতে পারে।

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার গোপীনাথপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়। ইনি একদা প্রসিদ্ধ প্রবাসী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতার বঙ্গবাসী কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার কাব্য গ্রন্থের নাম (১) অরুণিমা (২) কোজাগরী 'মেঘদূত' কাব্যের একখানা উপাদেয় অনুবাদ গ্রন্থও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

চণ্ডীদাস [১৩৭]—বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের আদি গীতি-কবি চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একটি প্রীতি বিহ্বল স্তুতি।

উমাদেবী—প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেনের কন্যা। বিবাহের পর অতি অল্পবয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। রচিত কাব্যগ্রন্থ 'বাতায়ন'। গ্রন্থখানি—রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, কামিনী রায় প্রভৃতি কবিগণকর্ত্তৃক উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। কবি যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তাহা চোক দিয়া না দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দিয়া দেখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার কবিতা এত প্রাণস্পর্শী হইয়াছে।

গৃহবধূ [১৩৮] ও **মেনি** [১৩৯]—এই চতুর্দ্দশপদী কবিতা দুইটিতে একটি শান্ত-সমাহিত শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোথাও অস্পষ্টতা নাই। ছোট গল্পের মত এই কবিতা পড়িয়াও মনে হয় "শেষ হয়ে হইল না শেষ।" এই শ্রেণীর কবিতায় কবির "দেখিবার প্রাণ-শক্তি ও দেখাইবার রচনাশক্তি" আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

হুমায়ুন কবির—জন্ম ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে, বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তাহার কবিতা প্রকাশিত হয়। কবি স্বয়ং চতুরঙ্গ নামে একখানা সাহিত্য-পত্রিকায় সম্পাদক। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া তিনি বি, এ, উপাধি লাভ করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন যশস্বী অধ্যাপক। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী। তাঁহার জ্ঞান-গবেষণা, চিন্তা ও ভাবুকতা বর্ত্তমান সময়ে

বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজে তাঁহাকে একটী বিশিষ্ট সম্মানিত স্থান দিয়াছে। জাতীয় মহামিলনের শুভ-দিনেরও তিনি স্বপ্ন দেখেন; সেই স্বপ্নকে সার্থক করিতে তাঁহার চিন্তায় ও কর্ম্মে তৎপরতার অভাব নাই। তাঁহার রচিতগ্রন্থ পদ্মা, স্বপ্নসাধ ও সাথী।

আকবর [১৪০]—সেকেন্দ্রায় মহিমান্বিত সম্রাট্ আকবরের সমাধি-মন্দির আছে। কবিচিত্ত সেই সমাধিস্তম্ভের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয় নাই। সম্রাটের এই স্মৃতিচিহ্ন কবির কাছে বহু শতাব্দীর অস্পষ্টতা ভেদ করিয়া মহিমাময় আকবরের উদার প্রাণের আলেখ্য বহিয়া আনিয়াছে। এই কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী' কবিতাটী নানাভাবে তুলনীয়। শিবাজী কবিতার কল্পনা হইতে এই কবির কল্পনা অধিকতর উদার। সম্রাট্ আকবর সকল জাতি-ধর্ম্মের মহামিলনের মধ্যে যে সাম্যমৈত্রী প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা আজিকার দিনের খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত-ভারতের একজন মিলন-ব্রতী কবির পক্ষে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবা খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে।

একধর্ম্ম……(১৯) ইহাই ছিল আকবরের স্বপ্ন। জাতি-ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা বিলুপ্ত করিয়া তিনি অখণ্ডভারতে একজাতি গড়িতে চাহিয়াছিলেন এবং এক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন।

হায় স্বপ্ন……(২৫) কবির ধ্যানসমাহিত অবস্থা আর নাই। তিনি স্বপ্নলোক হইতে সত্যলোকে আসিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে ভারতবর্ষের বাস্তব রূপ দেখিতেছেন—যেখানে ধর্ম্মে-ধর্ম্মে সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে কলহের বিরাম নাই।

সাথী [১৪১]—কল্পনার কল্পলোকের স্বপ্নময় সুষমা বাস্তবজীবনের রূঢ়-স্পর্শে টুটিয়া গিয়াছে; এখানে Ideal ও Real-এর চিরন্তন দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকারের মিত্রাক্ষর ছন্দে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা থাকায় একটা বিশেষ শ্রুতি-মাধুর্য্যের সৃষ্টি হয়।

রামেন্দু দত্ত—বর্দ্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ গ্রামে কবির জন্ম হয়। জন্মকাল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। দীর্ঘদিন হইল প্রবাসী-ভারতবর্ষপ্রমুখ মাসিক পত্রিকাগুলিতে কবি তাঁহার কবিতা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। কবির যে সব কাব্য-রচনা এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের নাম—'দুলাল', 'মঞ্জুলা' ও 'নবমঞ্জরী'। আধুনিক কালের কবি হইলেও তাঁহার কবিতার ভাব ও ভাষায় কুত্রাপি অতি-আধুনিকতার লক্ষণ নাই। তাঁহার কবিতা অস্পষ্টতা-দোষ হইতে সর্ব্বদা মুক্ত। ভাষায় একটা সাবলীল পরিচ্ছন্নতা আছে।

তাজের স্বপ্ন [১৪২]—একজন ইংরেজ লেখক তাজমহলের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন "It is a dream in marble." যাহা আজ পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্যের স্বপ্নলোক হইয়া আছে, তাহার পরিকল্পনার মূলেও একটা 'স্বপ্ন' ছিল। ইহাই কবিতাটীর নামের সার্থকতা। এই স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যের যিনি নির্ম্মাতা সেই সম্রাটের মনের মধ্যেই ইহার প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই মানস-সৃষ্টির পরে হইল স্থূলসৃষ্টি, 'ভুধিয়া পাথরের সৃষ্টি।' কবিতাটীতে সেই মানস-সৃষ্টির ইতিহাস আছে।

শীতের শেষে [১৪৩]—ইহা একটি উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা। ইহাতে আধুনিক কবিতার চমৎকার একটি লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের উপর একটি নব আলোকপাত করা হইয়াছে। বসন্তের সমস্ত সৌন্দর্য্যের মূলে আছে এক শক্তি। যে শক্তি বাসন্তী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-মূলে, সেই একই শক্তি কবির প্রেরণামূলে রহিয়াছে। সুতরাং তাহা যেমন একদিকে কুঞ্জবনে ফুল ফুটাইতেছে, তেমনই আর একদিকে তাহারই স্পর্শে অন্তরের ফুল-কলিদের দল বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

বন্দে আলী মিঞা—বর্ত্তমান যুগের একজন শক্তিশালী মুসলিম কবি। কবির ছন্দোনৈপুণ্যে ভাব অত্যন্ত আবেশ-মধুর হইয়া উঠে। তাঁহার রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাব সুস্পষ্ট।

কবির বীণা [১৪৪]—কবির অন্তরে বসিয়া যিনি ভাব উৎসারিত করেন সেই প্রেরণারূপিণী যিনি, তিনিই বীণাপাণি। তাঁহারই হাতের বীণা

কবি প্রসাদ-রূপে প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেই বীণায় কবির অন্তর-প্রেরণার অনুরূপ সুর-ঝঙ্কার তো সর্ব্বদা হইতে পারে না। প্রকাশের অক্ষমতায়, যে দীনতা প্রকটিত হয় কবির কাছে তাহাই 'সরম-লাগা ত্রুটী।' "যা নিজের আছে তাও পরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেন নি।"

—ছিন্নপত্র—রবীন্দ্রনাথ

। [১৪]—কবিতাটীতে শারদ-প্রকৃতিকে মূর্ত্ত করিয়া তোলা হইয়াছে। চমৎকার কল্পনা! কিন্তু কবির প্রকৃতি-নিরীক্ষণ নির্দ্দোষ নহে। কবিতায় চম্পক-বকুলের বর্ণনা মূল বিষয়-বস্তুর সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারে নাই।

শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ—জন্মস্থান ও কর্ম্মস্থান ঢাকা নগরী। ইনি আইন-ব্যবসায়ী। প্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় রায় সত্যপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর ইঁহার পিতা এবং পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও সাহিত্যিক, বান্ধবসম্পাদক, মনীষী কালীপ্রসন্ন ঘোষ ইঁহার পিতামহ। সুতরাং সাহিত্যসাধনায় ইঁহার জন্মগত অধিকার আছে, ইহা তাঁহার কাছে কৌলধর্ম্ম। কিন্তু তাঁহার চরিত্র কিছু অদ্ভুত। একদা কোন অকবি-যশঃপ্রার্থী কবি তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার ফল, তাঁহার হস্তলিখিত পুস্তকখানাকে পূর্ণ অমানিশার দিগন্তব্যাপী কালো অন্ধকারে, সীমাহীন কালো আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া, ভূ-মধ্যসাগরের কালো জলে সমাহিত করিয়া বিস্মৃতির অন্ধকারকে উপহার দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার অযত্ন-রচিত বহু সুন্দর কবিতা, মাত্র একবার পড়িয়াই, হাসিতে হাসিতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, বাতাসে উড়াইয়া দিতেন। এই বিচিত্র চরিত্র দুইটীর কিছু কিছু দিয়াই বোধ হয় ভগবান্ শ্রীপতিপ্রসন্নের চরিত্র গড়িয়াছেন। নিজের কবিতাগুলির প্রতি তাঁহার কোন মমতা নাই। কবিতাগুলি লইয়া কোন প্রকার প্রকাশ-ব্যাকুলতা নাই। যে রচনাগুলি বাঙ্গালার রসজ্ঞ পাঠকের প্রশংসা লাভ করিয়াছে তাহারা গৃহের এক অজ্ঞাত কোণে ধূলি-মলিন হইয়া পড়িয়া আছে। Shelleyর ভাষায় যাহা harmonious madness কবি তাহার অধিকারী; কিন্তু কবি-যশঃ-প্রার্থী নন; শুধু—আনন্দ ভিখারী।

অন্ধের ব্যথা [১৪৬]—কবিতাটী আদ্যন্ত করুণরসসিক্ত বলিয়া অতি সহজে মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান্ যাহাকে দৃষ্টিশক্তিতে বঞ্চিত করিয়াছেন তাহাকে একটু বেশী করিয়া হৃদয়ের অনুভব-শক্তির অধিকারী করিয়া দিয়াছেন।

কাদের নওয়াজ—কবির নিবাস বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামে। তাঁহার জন্ম হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। ইনি একজন উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত (এম্. এ. বি. টি.) তরুণ মুসলিম কবি। কবির রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম মরাল। ইঁহার ভাব ও ভাবুকতায় নূতনত্ব আছে; সেইজন্য ইনি সহৃদয় পাঠক-সমাজের একজন জনপ্রিয় কবি।

প্রতিশোধ [১৪৭ [—প্রতিশোধ গ্রহণের এক নব-রূপ। ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'noble revenge' এ তাহাই।

আবুল হাশেম—তরুণ মুসলিম কবি মৌলবী আবুল হাশেমের কবিতা ইতিমধ্যে সাহিত্যিক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার রচনার প্রসাদ গুণ অতি সহজেই পাঠকের হৃদয় মুগ্ধ করে। কবির প্রকাশিত 'কথিকা' কাব্যখানা আখ্যান-মূলক কবিতার সংগ্রহ-পুস্তক। প্রত্যেকটী আখ্যান কবিতার মধ্যে একটা দুর্নিবার গতি-স্রোত আছে। সেই গতি-স্রোত পাঠককে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়, কোথাও থামিয়া থাকিতে দেয় না। ইহাই তাঁহার এই শ্রেণীর কবিতাগুলির বিশেষত্ব।

বিধাতার ভিক্ষা [১৪৮]—মানুষকে ঘৃণা করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা অর্থহীন। ইহাই কবিতাটীর ভাবার্থ। মানুষের পাপপুণ্যের বিচার শেষ বিচার-দিনে ঈশ্বরের দরবারে হইবে। রোজ কেয়ামতশেষে সেই বিচার অত্যন্ত ভয়াবহ ও মমতাহীন বিচার। এই কথা কয়টী মনে রাখিলেই কবিতার অর্থ স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়—কিরণধনের জন্ম হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসরের অধিক হইল, ১৯৩১ সনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। হুগলী জেলার উত্তরপাড়ায় কবির বাসস্থান ছিল। উচ্চশিক্ষিত এই কবির হৃদয় মমতায় পরিপূর্ণ ছিল। ইহা শুধু তাঁহার ব্যক্তিজীবনের পরিচয় নহে, তাঁহার কবি-জীবনেরও ইহাই সত্যকারের পরিচয়। তাঁহার একখানা মাত্র কাব্যগ্রন্থ "নতুন-খাতা" প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার স্বল্পসৃষ্টি তাঁহাকে বৃহৎ কবি-খ্যাতিতে মণ্ডিত করিয়াছে। মমতা-কাতর হৃদয়ের একটা সহজ সরল-ভাবাবেগ এবং তাহাকে প্রকাশ করিবার একপ্রকার অনায়াস-ভঙ্গিমা তাঁহার কবিতাগুলির বিশেষত্ব।

পিতা স্বর্গ [১৪৯]—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।"

এই মন্ত্র-রচয়িতা প্রকৃতই সত্যদ্রষ্টা। কোন এক আবেগ-বিহ্বল-ক্ষণে তাঁহার এই সত্য-দর্শন হইয়াছিল। তারপর গতানুগতিকভাবে এই মন্ত্রেই পিতৃপ্রণাম চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আবেগের সে-স্পন্দন কাহারো কণ্ঠে শোনা যায় না। বোধ হয়, আমরা মন্ত্রের অর্থ বিস্মৃত হইয়াছি। কবির কবিতা পড়িয়া মনে হয় তিনি প্রকৃতই মার্ম্মিক ও মন্ত্রার্থ-বেত্তা।

পরিমলকুমার ঘোষ—ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার ঘোলঘর গ্রামে কবির নিবাস। সরকারী কলেজের অধ্যাপক বলিয়া তাঁহার নানা স্থানকেই কর্ম্মস্থলরূপে গ্রহণ করিতে হইতেছে। অধুনা লুপ্ত "ঢাকা রিভিউ" পত্রিকার তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার "নারীমঙ্গল" কাব্যখানা সুধী-সমাজে আদৃত হইয়াছে।

চাষী [১৫০]—একটি আধুনিক যুগ-লক্ষণ এই কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবিরকল্পনার বিষয়-বস্তু হইতেছে চাষীর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা। প্রকৃতির লীলাভূমিতে স্বাস্থ্য ও প্রাণপূর্ণ যে জীবন-ছবি রহিয়াছে কবি মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাহাই দেখিতেছেন। ইহা বলিলেও ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা। কবিতাটী শুধু ভাবময় বা কল্পনা-সার নহে। উৎকৃষ্ট ভাব-কল্পনার ফাঁকে ফাঁকে অত্যন্ত স্পষ্ট বাস্তব ছবিগুলি কবি যোজনা করিয়াছেন এবং তাহাতে ideal ও real মিলিয়া এক অপূর্ব্ব রস-সৃষ্টি করিয়াছে।

সুশীলকুমার দে—ডক্টর দে এই সংক্ষিপ্ত নামেই তিনি বেশী পরিচিত। বর্ত্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের কর্ণধার হইয়া আছেন। তাঁহার জ্ঞান-গবেষণ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পণ্ডিত-সমাজে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এক শ্রেণীর সর্ব্বশাস্ত্র-নিষ্ণাত অধ্যাপকের অধ্যাপনা-কথা আমাদের সমাজে জন-প্রবাদ হইয়া আছে। সুশীলকুমার সেই সার্ব্বভৌম অধ্যাপক-বৃন্দের প্রতিভার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের উপাধিধারী (এম্-এ), সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ; আবার বাঙ্গালাসাহিত্যে তাঁহার আশ্চর্য্য রস-বোধ ও প্রগাঢ়-পাণ্ডিত্য। এই ভাষায় তিনি গবেষণা-পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই ভাষার তিনি একজন চারুশিল্পী কবি। এ পর্য্যন্ত এই কবির যে কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের নাম—প্রাক্তনী, দীপালী, অন্তুতনী ও লীলায়িত।

কবির কামনা [১৫১]—একাকিত্বে বেদনাহত কবির হৃদয়ের দুয়ার কোন শুভ মুহূর্তে খুলিয়া গেল। তখন প্রচুর প্রাণের ঐশ্বর্য্য লইয়া নিজেকে বিশ্ব-সত্তায় ডুবাইয়া দিতে কোন বেগ পাইতে হইল না। এমনই করিয়া জন-সিন্ধুতে ব্যক্তি-বিন্দু হারাইয়া ফেলার মধ্যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে। কবির কাছে সেই আনন্দ অনাস্বাদিতপূর্ব্ব।

পূর্ব্বে যে সমস্ত চতুর্দ্দশপদী কবিতার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে তাহাদের সহিত তুলনায় এই কবিতার বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। এখানেও একটা বিশেষ মিলের রীতি রহিয়াছে। এই বিশেষ ছন্দোবন্ধনের মধ্যে একটিমাত্র আবেগ-গভীর অনুভূতি প্রথমাংশে (octave) প্রকাশিত হইয়া দ্বিতীয় অংশে (Sestet) একপ্রকার ভাব-বিভঙ্গদ্বারা নূতনরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই কবিতাটী একটি উৎকৃষ্ট 'Sonnet'—"A moment's monument."

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)—ভাগলপুরের ডাক্তার বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় বনফুল নামেই পাঠক সমাজে পরিচিত। বাঙ্গালার কথা সাহিত্যের বিপুল সম্ভাবনাকে যে সমস্ত লেখক অনুভব করাইয়া দিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে বনফুল [illegible] একজন। তাঁহার বুদ্ধির দীপ্তি অসাধারণ, এবং চক্ষে তাঁহার একপ্রকার [illegible] দৃষ্টি, যাহা মানুষের অন্তরের তল পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া দেয়। আধুনিক যুগের [illegible] অতি আধুনিক ভাবকে হৃদয়ের সমগ্র শক্তি দিয়া ঘৃণা করেন। আবার প্রাচীনপন্থী নিশ্চেষ্ট জড়তাকে নির্ম্মমভাবে আঘাত করেন। তাঁহার মন স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও আনন্দপূর্ণ এক মহনীয় জীবনের ধ্যান করে। কথা সাহিত্যিক বনফুলের এই পরিচয়েই বুঝা যাইবে যে, তিনি আবেগ বিহ্বল কবি নন। অত্যন্ত সুস্থ, স্থির ও বলিষ্ঠ হৃদয় লইয়া তিনি কবিতা লেখেন। "বনফুলের কবিতা" নামে তাঁহার এক কাব্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

আজার ব্যাপারী [১৫২]—বনফুলের ব্যঙ্গ-রচনার তীব্রতা আমাদের হৃদয় বিদ্ধ করে। অথচ তাহাতে একটা রসিকতা আছে। এই কবিতাটিতে তাহার পরিচয় মিলিবে। লক্ষ্য করিতে হইবে যুক্তির [illegible] জন্য কেমন করিয়া আবেগ চাপা পড়িয়া গিয়াছে। দেশবাসীর [illegible] মনোভাবের বিরুদ্ধে ছন্দোবন্ধনে ইহা একপ্রকার অভিযান।

সমাপ্ত